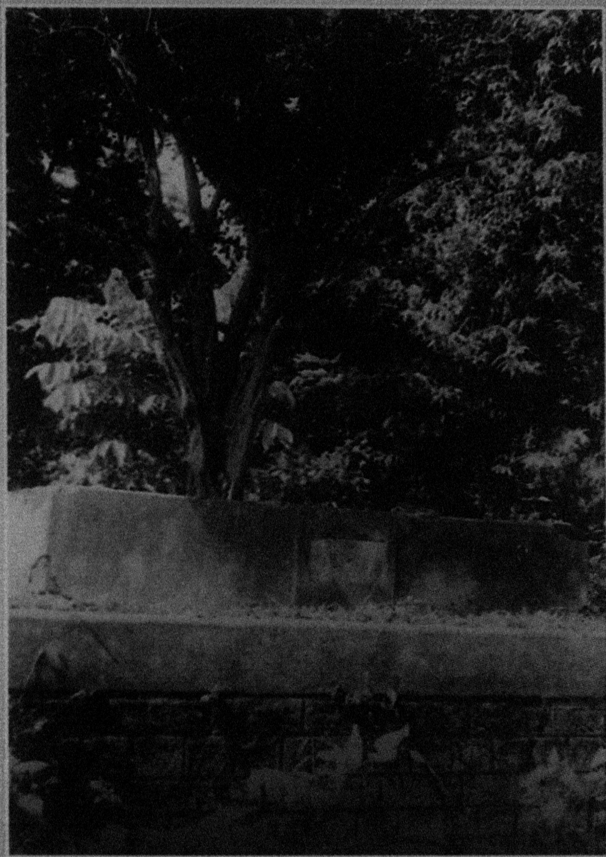
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

প্রচ্ছদ বিন্যাস
ক্যাপস মাইক্রোগ্রাফিকস

প্রকাশক
দেবানন্দ দাম
জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড
আগরতলা - ৭৯৯০০১

মুদ্রণ
জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড
আগরতলা - ৭৯৯০০১, ত্রিপুরা

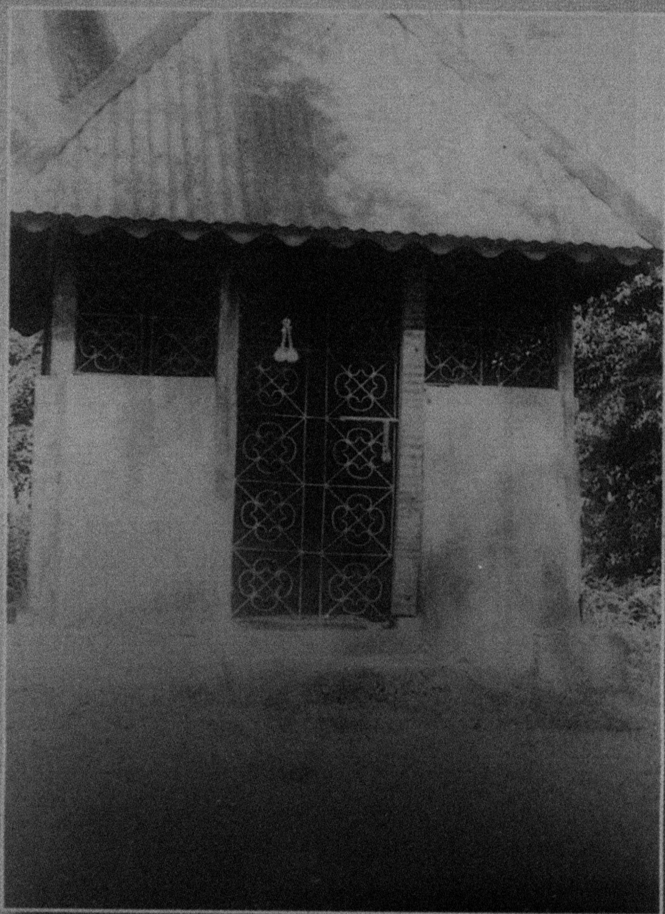
কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র
জ্ঞান বিচিত্রা
১৬ ডঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন : (০৩৩) ২৩৬০৪৯৮১



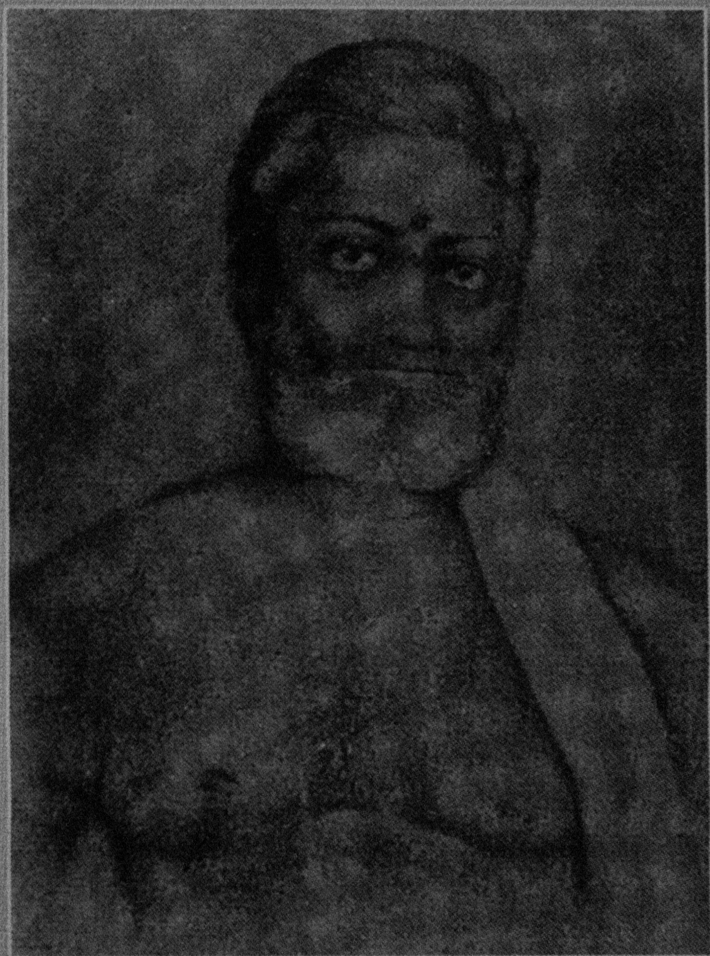
লালজীর প্রিয়তম হাতি প্রতাপ সিং এখানেই শায়িত। মাটিয়াবাগ বাড়ির সামনে এই স্মৃতিস্তম্ভ

সতিরুং রিয়াং

পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাক্ষর ও সক্ষম করতে চেয়েছিলে
এই্ অপরাধে (!) তুমি শহীদ হলে



মাটিয়াবাগের বাড়ির ডান পাশে শিব মন্দির। মন্দিরের সামনে শিল্পীর অনাড়ম্বর বিয়ের অনুষ্ঠান হয়



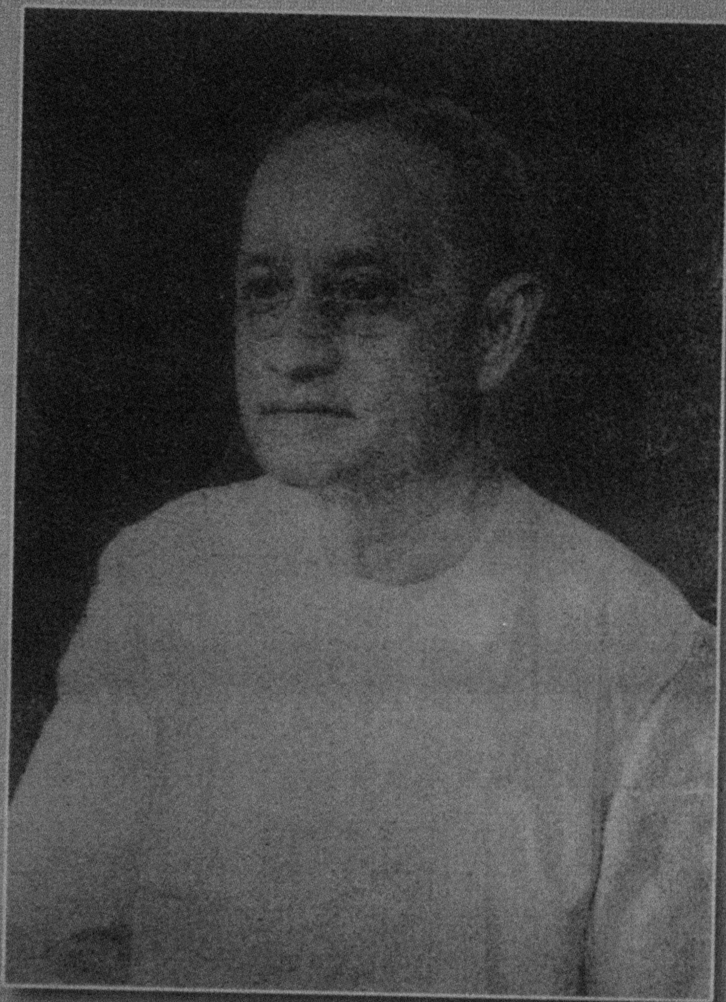
প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া। শিল্পীর প্রপিতামহ

সবিনয় নিবেদন

কোনো বড়মাপের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার কথা ঘোষণা করতে চাইলে আমাদের মত 'বাউদিয়া'দের নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে হয়। সারা পৃথিবীর গ্রাম গঞ্জ পাহাড় বন জঙ্গল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে লোকগান আর লোকনৃত্য। পৃথিবীর সকল সাহিত্য আর সঙ্গীতের উৎস লোকগান, বলেছিলেন মহান কথাশিল্পী গ্যয়টে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ভূতপূর্ব মহাপরিচালক মোবারক হোসেন খান বাংলা লোকগানের এক বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, 'জার্মান দেশে প্রবাদ আছে— একটি দেশের লোকসংগীত জানলে সেদেশে না গিয়েও অনেক কিছু জানা হয়।'

লোকগানের অন্তহীন রত্নরাজি লুকিয়ে রয়েছে এই বাংলাদেশেও। লোকসংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় সীমান্তকে তুচ্ছতার হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়। এপার ওপারের আত্মীয়তা রচনা করে। মানচিত্রের হাত ধরে যখন আমরা উত্তর বাংলায় ঢুকে যাই, দিনাজপুর আর রংপুরের আলোচনায় মেতে উঠি, এপারের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, অসমের গোয়ালপাড়াকেও তার সঙ্গে জুড়ে নিতে হয়। দক্ষিণ বাংলার বিষয় খানিকটা আলাদা। লোকগানের ভাষা বুঝতে সাক্ষর ও নাগরিক সমাজকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়না। উত্তর বাংলার লোকগান শহুরে শ্রোতার কাছে খানিকটা পরিশ্রম প্রত্যাশা করে। নানা প্রচলিত শব্দ আয়ত্ত কবার শ্রমে অভ্যস্ত হতে পরামর্শ দেয়। লোকগানের রাজা, ভাওয়াইয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট, আব্বাসউদ্দীন আহমেদ কলকাতার রেকর্ড কোম্পানিকে বলেছিলেন, প্রচলিত শব্দ বদল করতে হলে তিনি গান কববেননা। রেকর্ড কোম্পানি এমন আবদারে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেনি। সময় তারপর অনেকটা পেরিয়েছে। লোকগানের আরও অনভিপ্রেত রূপান্তর ঘটেছে। নাগরিক জীবনে সন্তমান শিল্পীরা এখন বড় অঙ্কের বিনিময়ে কথা বদলে নেন, সুর বদলে নেন। গানের যন্ত্রানুসঙ্গ বদলে নেন।

জন্মসূত্রে আমি উত্তরবাংলা লোকসংস্কৃতির আবহে বড় হবার সুযোগ পাইনি। শৈশব কৈশোর ও তারুণ্যের একটা বড় সময়, নানা বোধ নির্মিতির সময়, আমি ত্রিপুরায় কাটিয়েছি। উত্তর-পূর্ব ভারতের সপ্তকন্যার অন্যতমা দুই কন্যা ত্রিপুরা ও অসম। এই দুই রাজ্য ভৌগোলিক নৈকট্যে গাঁথা। মাটি আর জল জঙ্গলের চরিত্র্য সাযুজ্যে গাঁথা। অসম বাংলার প্রান্তে এসে যেখানে তার সীমানা শেষ করেছে, শুরু হয়েছে উত্তরবাংলা, তার ভূখণ্ডও নৈকট্য, মাটি আর জল জঙ্গলের তুলনীয় চরিত্রে গাঁথা। রাজনীতির লোকজনেরা দেশ ভাগ করেন, রাজ্য ভাগ করেন, জেলা ভাগ করেন। ভালোর জন্য ভাগ করেন। মাঝে মাঝে অন্ধস্বার্থেও ভাগ করেন। এমন ভাগাভাগিতে লোকসংস্কৃতির ভাগাভাগি হয়না। ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালি ভাগাভাগি হয়না। এইসব গান ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব যাঁদের, আব্বাসউদ্দীন আহমেদ আর সুরেন রায় বসুনীয়ার নাম বলতে হয়। তারপর আমাদের মন প্রাণ জুড়ে বিরাজ করে যাঁর লোকগান, যাঁর আর্তি আব উদাত্ত কণ্ঠ, তিনি প্রতিমা বড়ুয়া। লোকগানের রাজকন্যা।



প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া। শিল্পীর পিতামহ

গৌরীপুরের রাজবাড়ির ইতিহাস আর সব রাজবাড়ির সঙ্গে মেলে না। মানুষগুলো সব নানা সৃজন ও দক্ষতায় উদ্ভাসিত। প্রায় সবাই হাতি বিশেষজ্ঞ। বনজঙ্গলের সম্পদকে লুণ্ঠনের উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেখানে রাজা উজিরদের স্বভাবধর্ম, গৌরীপুরের ওই বাড়ির পুরুষ ও নারীদের অধিকাংশই জল আর জঙ্গলের ধারে ঘর করা গরীব মানুষগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুলেছেন। তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়েছেন। প্রতিমা যাঁর তনয়া, সেই কুমার প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার (লালজী) হাতি বিশেষজ্ঞ ও হাতিশিকারি হিসেবে আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি ছিল। প্রকৃতীশচন্দ্রের অগ্রজ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া খানিকটা যেন ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলেন। চলচ্চিত্র জগতের ইতিহাসে প্রমথেশচন্দ্র এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। অগ্রজা নীহার বড়ুয়া লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষিকা, গোয়ালপাড়িয়া লোকনৃত্য ও লোকগানের দিশারী চরিত্র। তাঁর লেখার সংকলন, 'গোয়ালপাড়ার লোকজীবন ও গান : প্রান্তবাসীর ঝুলি' পড়লে আমরা এমন কথার নিশ্চিত সমর্থন সংগ্রহ করতে পারি। প্রকৃতীশচন্দ্রের সবচেয়ে ছোট বোন নীলিমা কলাভবনে এসে নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রাঙ্কন শিখেছিলেন। রাজারাজড়ার ইতিহাসের সব কাহিনি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। শোষণ আর শাসনের বাইরে স্বস্তির আখ্যান খুব বেশি কোথায়? বলতে আপত্তি নেই, গৌরীপুরের ওই জমিদার বাড়ি আমাদের কাছে অস্বস্তির চেয়ে স্বস্তির কাহিনিই বেশি উপহার দিয়েছে।

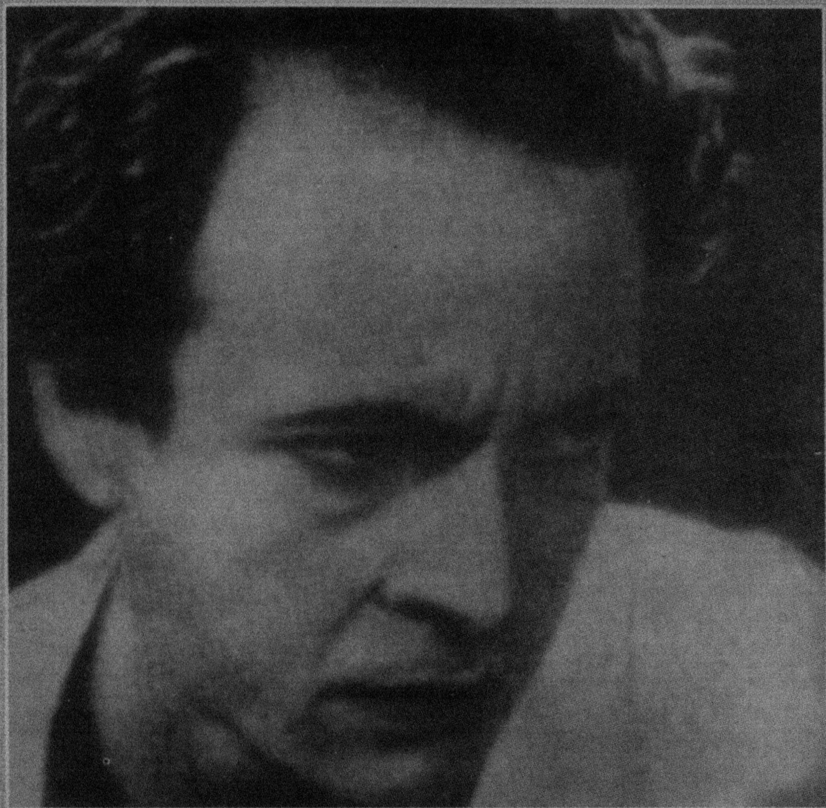
গৌরীপুরের রাজবংশ তালিকা দেখুন। মেধা ও দীপ্তির কোন দারিদ্র্য নেই। কেউ চাইলে এক বিশালকায় জীবনকথার ইতিহাস লিখতে পারেন। মানুষ সেই ইতিহাস সাদরে গ্রহণ করবেন। এই বইয়ে আমরা কুমারী প্রতিমা বড়ুয়ার জীবন ও গান বিষয়ে কথা বলেছি। বলা হল সামান্য। অনেক কথা অকথিত থেকে গেল। আগামী দিনে কেউ পূরণ করবেন।

গৌরীপুরে গিয়ে শিল্পীর বাড়িতে থেকেছি বেশ কদিন। তখন শিল্পী বেঁচে নেই। তাঁর স্বামী ও কন্যাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আরও বহু আত্মীয়স্বজন রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। যাঁরা তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল সংগত করছেন, সেই সহশিল্পীদের সঙ্গেও কথা বলেছি। সাধ্যমত আলোকচিত্র সংগ্রহ করে পাঠকের দরবারে পৌঁছে দিয়েছি। সারা গৌরীপুরের সাধারণ মানুষ রাজবাড়ির মানুষদের কতটা অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন, নিজের চোখে দেখে এসেছি।

এই কাজে নানা সময়ে আমায় প্রচুর সহায়তা করেছেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। সাহায্য করেছেন প্রমথেশ বড়ুয়ার পুত্র দেবকুমার বড়ুয়া, প্রতিমা বড়ুয়ার ছোটোবোন হাতি বিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া। ভাই প্রবীর বড়ুয়া। প্রবীর মাটিয়াবাগের বাড়িতে রাজপরিবারের পুস্তকসংগ্রহ আগলে রেখেছেন। 'আজকাল'-এর সাংবাদিক-লেখক তুষার প্রধান ও বন্ধু চিত্রভানু সরকার বেশ কিছু লেখালিখির খোঁজখবর দিয়েছেন।

কার্পণ্য বিসর্জন দিয়ে প্রকাশক দেবানন্দ দাম প্রতিটি লেখকের পাশে দাঁড়ান। বইটির সকল অঙ্গে লালিত্য সংযোজনে তিনি তার একশোভাগ প্রমাণ রেখেছেন।

৩১ জানুয়ারি ২০০৫ শ্যামল চক্রবর্তী



প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, যাঁকে বাদ দিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস আলোচনা করা যায় না

সূচিপত্র



নীহারবালা বড়ুয়া (মাঝখানে)। শিল্পীর বড় পিসীমা। বাঘ শিকার করে অন্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন



মায়ের ছবি। মালতীলতা বড়ুয়া

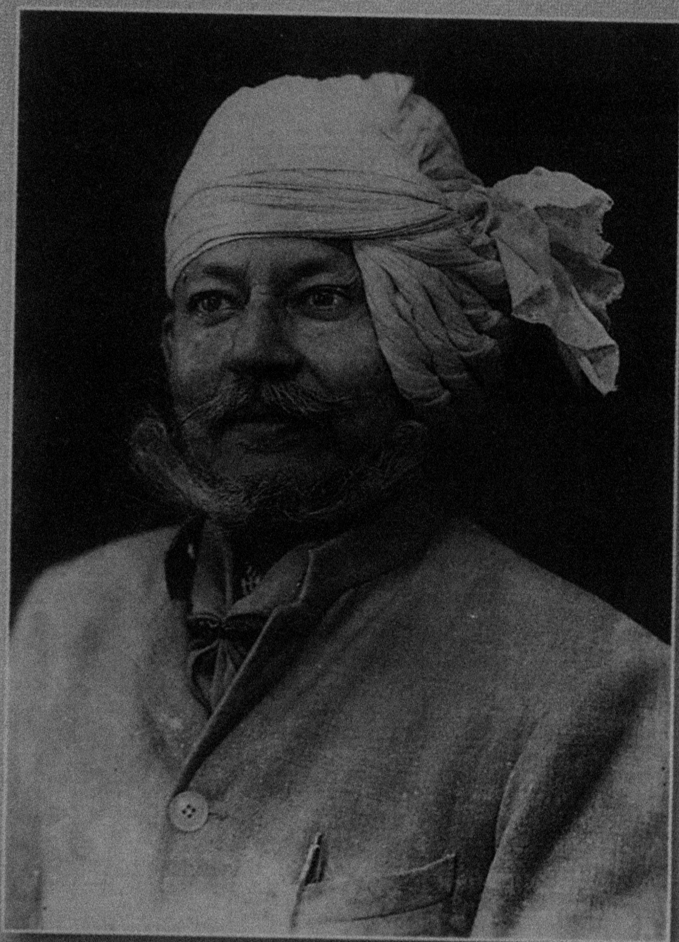


যাঁকে এই বই উৎসর্গ করেছি

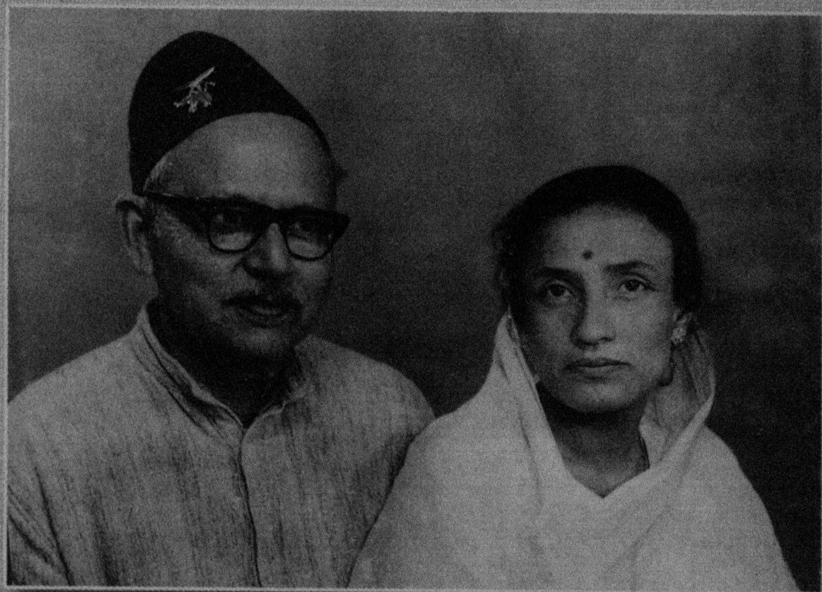
সতিরুং রিয়াংকে আমরা অনেকেই চিনিনা। ত্রিপুরা রাজ্যের ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায় সতিরুং থাকতেন। স্বামী কার্যরাম রিয়াং আর তিন সন্তানকে নিয়ে ঘর করতেন। শুধুই কি ঘর সামলাতেন নিজের? আর কিছু নয়? যদি না-ই হবেতো তাঁর কথা বারবার মনে পড়ে যায় কেন? যে গাঁয়ে থাকেন সতিরুং, সেখানে অনেক রিয়াং মানুষের বাস। প্রায় কেউই তাঁরা লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। সাক্ষরতার আলো যখন একটু একটু করে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে যাচ্ছে, সতিরুং গভীরভাবে সাড়া দেন। শুধু তিনি নিজে যে একটু একটু করে সাক্ষর হয়েছেন তাই নয়, হাত ধরে পরম মমতায় আরও অনেককে সাক্ষরতা কেন্দ্রে টেনে এনেছেন। এমনকী স্বামী কার্যরাম রিয়াং যখন বার্ধক্যের 'অজুহাত' দেখিয়ে লেখাপড়া শিখতে নারাজ, তিনি জোর করেই তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলেন সতিরুং, শুধু সাক্ষর হলেই তো হলনা, সক্ষমতাও চাই। তাই একটু একটু করে তাঁরও পদচারণার গন্ডি বাড়ছিল। স্বনির্ভরতা প্রকল্প কিংবা সার্বিক স্বাস্থ্যবিধি অভিযানেও পা মিলিয়েছেন। যারা তাঁকে দেখেছেন তারা জানেন, অনগ্রসর ও অবহেলিত উপজাতি সমাজের তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক অসামান্য আলোকবর্তিকা। ২০০৩ সালের ৭ই এপ্রিল গভীর রাতে একদল হিংস্র জঙ্গি তাঁর শরীরটাকে বুলেট চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়। দলে দলে মানুষ দেখতে এসেছিলেন তাঁর শেষযাত্রা। আর চোখের জল ফেলেছেন। রাগে ক্ষোভে স্বতোৎচ্চারিত হয়েছে মানুষের কণ্ঠস্বর, সতিরুং হত্যাকান্ড কী আত্মহননের সামিল নয়? যারা অন্ধকার জীবন ভালোবাসে, তারা ভিন্ন এমন 'মা' কে পৃথিবী থেকে চিরকালের মত ছিনিয়ে নিতে আর কে চায়?

শহরের মানুষ তাঁর কথা জেনেছে কেমন করে? একবার সাক্ষরতার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি আগরতলা টাউন হলে এসেছিলেন। প্রায় জোর করেই তাঁকে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। একটু একটু করে বললেন তিনি, কেমন করে নিজে সাক্ষর হয়েছেন, স্বামীকে সাক্ষর করেছেন, চারপাশের অনেককে সাক্ষর করছেন। আমি তাঁর ওই বক্তৃতা শুনতে পাইনি। আগরতলায় যাঁরা শুনতে পেয়েছেন তাঁরা পরে বলেছেন, এমন লড়াইয়ের কাহিনি (রূপকথা মনে হয়) না শুনলে জীবনের অনেকটা অভিজ্ঞতাই অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

কেউ কি তাঁর জীবন-আখ্যান রচনায় এগিয়ে আসবেন?



বাবা প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া (লালজী)



প্রকৃতীশচন্দ্র ও পত্নী বীণা বড়ুয়া

ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার

পৃথিবীতে এক একটি পরিবার থাকে যার সদস্যদের নিয়ে মহাভারত কাহিনি রচনা করা যায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, কলকাতায় বড় হওয়া উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীদের পরিবার, ফরাসিদেশের কুরি পরিবার সেই তালিকাতেই পড়ে। এমন পরিবারের মানুষজনদের নিয়ে আমাদের বিস্ময়ের কোনো অন্ত থাকে না। আমাদের দেশেই অসম রাজ্যে রয়েছে তেমন এক পরিবার। বড়ুয়া পরিবার। রাজপরিবার। কয়েক প্রজন্ম ধরে সেই পরিবারের কয়েকজন মানুষের সৃষ্টি ও দক্ষতার কাহিনি শুধু যে আমাদের দেশের মানুষ জেনেছেন তাই নয়, পৃথিবীর নানাদেশের মানুষেরাও জেনেছেন। পরিবারের গোটা কয় মানুষের নাম উচ্চারিত হলে সাবই চিনবেন। প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া, নীহারবালা বড়ুয়া, প্রতিমা বড়ুয়া, পার্বতী বড়ুয়া। এই তালিকায় রয়েছেন নীলিমা বড়ুয়া, তাঁর খ্যাতিও কম নয়।

রাজ্যশাসন করতে গেলে রাজাদের সুশৃঙ্খল প্রশাসন চালাতে হয়। প্রজাদের ভালো মন্দ দেখতে হয় যেমন, অন্যায়ের যথাযথ বিচারের ভারও তাঁদের উপরেই থাকে। বড়ুয়া পরিবারের পূর্বাপর ইতিহাস খুবই দীর্ঘ। আমরা অল্পকথায় এখানে পেশ করব। যে কথা সবার আগে বলতে হয়, রাজরক্ত প্রবাহিত হওয়া মানুষগুলো তাঁদের প্রতিভা ও ভালোবাসা দিয়ে অসংখ্য সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পরিতোষ দত্ত মশাই আমাকে কথাচ্ছলে বলেছিলেন, 'অনেকের মুখে শুনতে পেতাম, এই রাজপরিবারের লোকজনদের আশপাশের সাধারণ মানুষ নাকি প্রাণাধিক ভালোবাসে। সত্যি বলতে কি, আমি যখন সেখানে গিয়েছি, দেখে বিশ্বাস করতে পারিনি। রাজপরিবারের লোকজনদের জন্যে সাধারণ মানুষ এমন নিখাদ প্রাণের টান অনুভব করে কেমন করে?'

উত্তর তো রয়েছেই। প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া পঞ্চাশ বছরও বেঁচে ছিলেন না। বাংলা চলচ্চিত্র আজ যে সক্ষমতা অর্জন করেছে, সেখানে তাঁর অবদান বিন্দুমাত্র কম নয়। আর শুধু বাংলা চলচ্চিত্রই বা বলব কেন, আমাদের দেশে তিনি একাধিক ভাষায় ছায়াছবি নির্মাণ করেছেন। অসামান্য অভিনয় করেছেন। চলচ্চিত্রের কলাকুশলগত ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক অবদান রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাণভরা ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা পেয়েছেন। চলচ্চিত্রে প্রথম রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগ করে ইতিহাস তৈরি করে গিয়েছেন। তাঁর 'দেবদাস' চলচ্চিত্রটিকে পরবর্তীকালের কোনো 'দেবদাস'ই অর্থ বিনিয়োগে ছাড়িয়ে গেলেও মহিমা ও মাধুর্যে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। প্রমথেশ বড়ুয়াকে নিয়ে আমরা আকারে ছোটো হলেও কয়েকটি বই দেখেছি। তাঁর জীবন ও কাজ নিয়ে আমি নিজে একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেছি। প্রকাশের অপেক্ষায় সেই বই।

দ্বিতীয় মানুষ প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া (লালজী) এশিয়ার সবসেরা হাতি বিশেষজ্ঞ



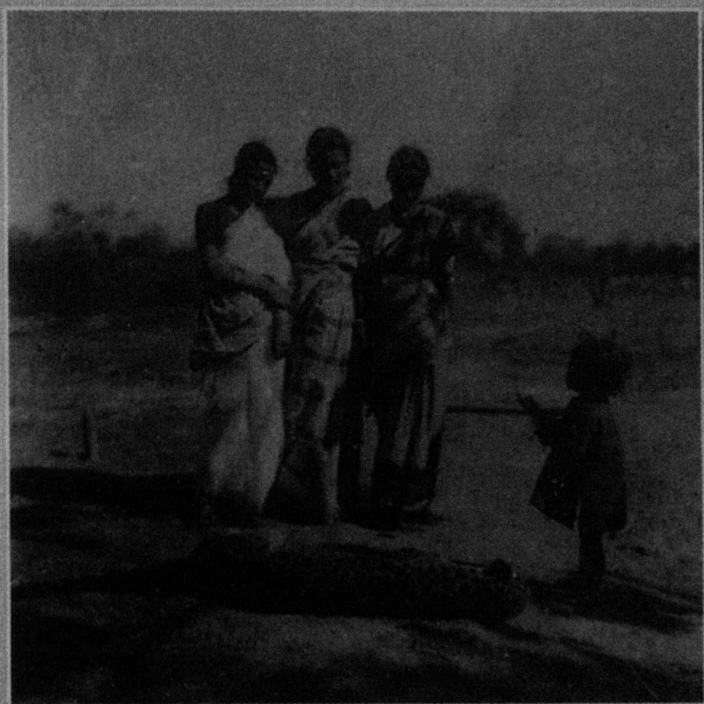
শৈশবে শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া

ছিলেন। অবিশ্বাস্য বৈচিত্রময় ছিল তাঁর জীবন। তাঁকে নিয়েও বই গোটাকয় লেখা হয়েছে। বিদেশে তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র হয়েছে। গোয়ালপাড়িয়া লোকগানের প্রবাদপ্রতিম গায়িকা প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডে তাঁর কন্যা। লালজী এখন বেঁচে নেই। তাঁর বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন অপর কন্যা পার্বতী। পার্বতী বড়ুয়া। পার্বতীকে নিয়ে লেখালেখি আমরা পড়েছি অনেক। নিশ্চয়ই একদিন তাঁকে নিয়েও পরিপূর্ণ জীবন কাহিনি রচিত হবে। নীহারবালা বা নীলিমা বড়ুয়ার কথা আমরা এখানে আলোচনা করছিনা। শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়ার পারিবারিক আবহমণ্ডলের পরিচয় রাখব যখন, তখন আকারে ছোট হলেও এঁদের জীবন কথা দু'চার লাইনে বলব।

লোকগান ও লোকসংস্কৃতি সভ্যতার এমন এক সম্পদ যার সঙ্গে মাটির গভীর যোগসূত্র রক্ষিত হয়। লোকসংস্কৃতি ও লোকগানের ভেতর যেমন মানবিক নানা মূল্যবোধের সর্বজনীন আবেদন থাকে, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের নানা পরিচয়ও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। জলজঙ্গল আর নদী পরিবেষ্টিত ভূখন্ডে যেমন লোকগান রচিত ও গীত হয়, রুক্ষ পাথর আর মরুভূমির এলাকায় নিশ্চয়ই তেমন লোকগান রচিত হয় না। উত্তরবাংলার কুচবিহার বা আসামের গোয়ালপাড়ায় যে লোকগান, বাঁকুড়া পুরুলিয়ার লোকগান কিছু বিষয়ে ও কথায় নিশ্চয়ই আলাদা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রাখে। মানুষের শ্রমের ভিন্নতা ও ভূখণ্ডের জলবায়ুর প্রকৃতি এই বিভাজন তৈরি করে। কোচবিহার ও গোয়ালপাড়ার লোকসংগীত গবেষিকা জলি বাগ্‌চী (গুপ্ত) লিখেছেন।'

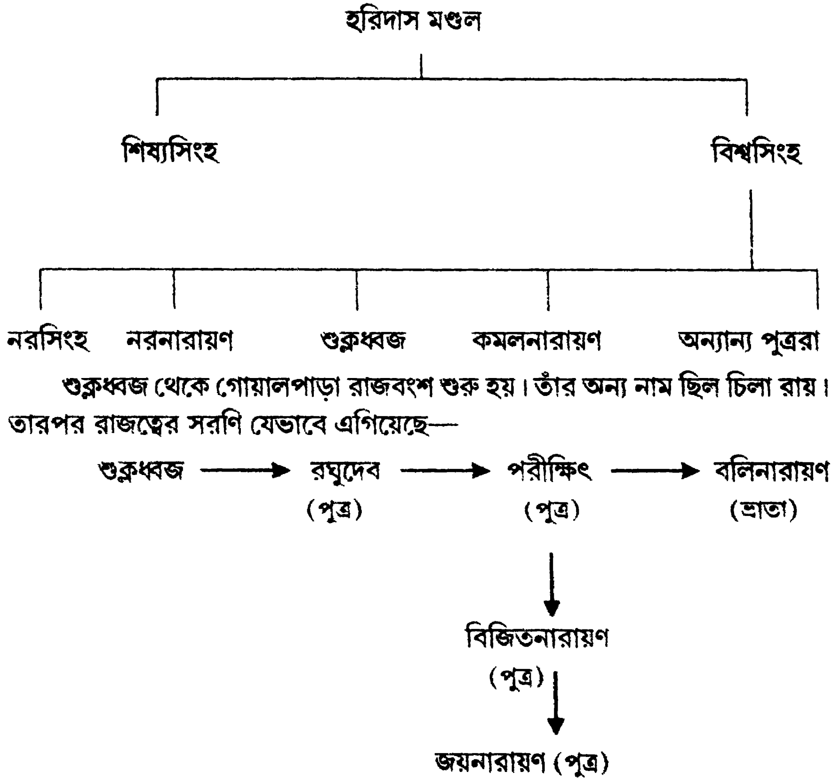
'কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন, জীবিকা, চারিত্রিক গঠনের ওপর প্রভাব ফেলে। কোচবিহার ও গোয়ালপাড়ার সাধারণ মানুষ সরল প্রকৃতির, সহনশীল এবং জীবনের চাহিদা খুব কম। এরা মূলত কৃষিজীবী। এই দুটো অঞ্চলেই উল্লেখ করার মতো কোনো কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। চা-শিল্প ও কাঠের ব্যবসা রয়েছে। তবে অন্যান্য ধরনের ব্যবসা বাণিজ্যও আছে। কোচবিহার ও গোয়ালপাড়ার লোকসংগীতের ওপর এই দুই অঞ্চলের কৃষিজীবন, অঞ্চলের জীবজন্তুর মধ্যে হাতি, বন্যমোষ এবং নদী গভীর প্রভাব ফেলেছে—যা থেকে আমরা পাই মাহুত, মইষাল, সাদু ও নাইয়ার গান।'

গৌরীপুর রাজপরিবার বা বড়ুয়া পরিবারের একটা বংশতালিকা নিশ্চয়ই আমার পেশ করব। তার আগে গোয়ালপাড়ার রাজাদের কথা খানিকটা বলে নেওয়া যাক। উপেন্দ্রনাথ বর্মন লিখেছেন, রাজা নরনারায়ণের আমলে কামরূপ, দরং ও গোয়ালপাড়া শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেবের অধীনে এসেছিল। ১৬১৪ সালে রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিৎ মুঘলদের কাছে হেরে যান। গোয়ালপাড়ার খানিকটা এলাকা সেসময় রংপুর জেলার অংশ ছিল। ১৮২২ সালে রংপুর জেলার রাঙামাটি এলাকা কেটে আনা হয় ও গোয়ালপাড়া জেলার জন্ম দেওয়া হয়। ১৮৩৪ সালে দেখা যায়, কোম্পানির সাহেবরা গোয়ালপাড়াতে থেকেই কাজ দেখাশোনা করতেন। গৌহাটি, প্রতাপগঞ্জ, ধুবড়ি, গৌরীপুর, তুফানগঞ্জ, বলরামপুর এই সব এলাকায় ওই সাহেব সুবোরা নদীপথে ঘুরে



শিল্পী তখন কিশোরী। বাঘ শিকার করে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন

বেড়াতেন। ১৮৬৭ সালে গোয়ালপাড়া আবার কোচবিহারে এল। পরের বছরই কাজের সুবিধের কথা ভেবে আসাম প্রদেশের প্রশাসনে নিয়ে আসা হয়। ১৮৭৪ সালে গোয়ালপাড়াকে আসামের অন্যতম জেলা বলে ঘোষণা করা হয়। কোচ রাজবংশ বহু পুরোনো। তার থেকে একটা সময়ে গোয়ালপাড়ার রাজবংশ এসেছে। ছবিটা আমরা নীচের মত করে দেখাতে পারি।



শুক্লধ্বজ থেকে গোয়ালপাড়া রাজবংশ শুরু হয়। তাঁর অন্য নাম ছিল চিলা রায়। তারপর রাজত্বের সরণি যেভাবে এগিয়েছে—

যাই হোক, গোয়ালপাড়া রাজবংশ বা কোচ রাজবংশের বিস্তৃত কাহিনিতে আমাদের এখানে আগ্রহ নেই। আমরা যেহেতু শিল্পী প্রতিমার জীবনাখ্যান রচনা করব, সোজাসুজি গৌরীপুর রাজপরিবারের কথায় চলে যেতে চাইছি। সাহেবরা যতই ঘন-ঘন নতুন-নতুন প্রদেশ-জিলা বদলাক না কেন, সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকা, 'নদী-নদী করে তাদের রোজকার খাওয়া জোটানো, ফরেস্ট-ফরেস্ট করে তাদের চলাচল, পাহাড়-পাহড় করে তাদের ওঠানামা?...যতটা বদলাবার, ঠিক ততটা বদলায় নি।...নদী বদলায় নি, ফরেস্ট বদলায় নি, পাহাড় বদলায় নি, জীবজন্তু বদলায় নি, বৃষ্টি বদলায় নি, শীত



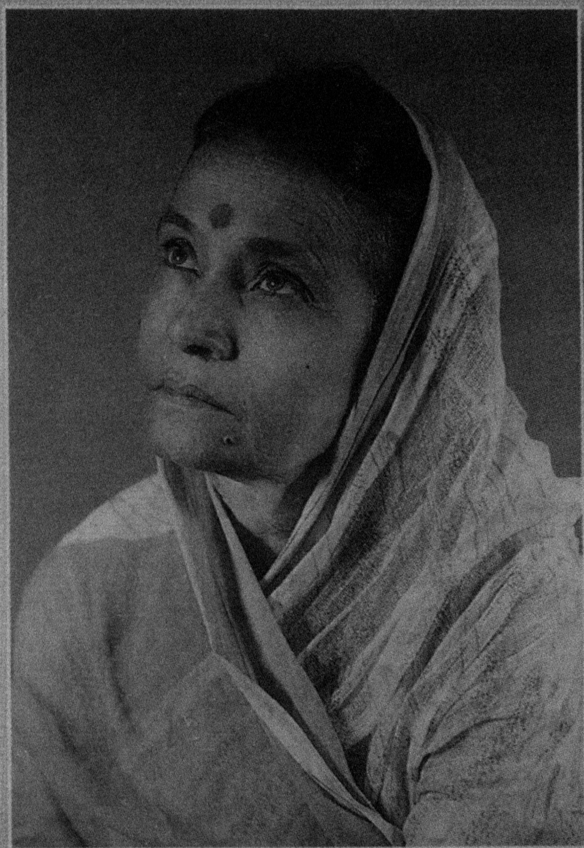
দুই কন্যা পূর্ণিমা (বামে) ও প্রতিভার (ডানে) সঙ্গে
মা বীনা বড়ুয়া (মাঝে)

বদলায় নি, তাই মানুষজনও যতটা বদলে যেতে পারত, ততটা বদলায় নি।'

গৌরীপুর রাজপরিবারের আদিপুরুষ হিসেবে মঞ্জুদাসের নাম বলা হয়। তিনি অষ্টম শতাব্দীর মানুষ। মঞ্জুদাস থেকে শুরু করে পরের রাজাদের একটা বংশতালিকা রাজপরিবারেই রয়েছে। ইতিহাস খুঁজতে গেলে মঞ্জুদাসের আগের কারও কথা জানা যায়না। তাঁর পুত্র টঙ্কপাণি ও টঙ্কপাণির পুত্র চক্রপাণি দাস জ্ঞানে গুণে শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পিতা-পুত্র দুজনেই গৌড়রাজা ধর্মপালের সভাসদ ছিলেন। রাঢ়দেশের অধিবাসী ছিলেন মঞ্জুদাস। চক্রান্তের কারণে পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষা করতে পারেন নি টঙ্কপাণি। তখন তিনি ধর্মপালের দেশে চলে এলেন। ধর্মপাল তাঁকে পরম আদরে প্রধান সচিব পদে বসিয়েছিলেন। নিজের কর্মকুশলতা দেখিয়ে তিনি রাজা ধর্মপালের খুব প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলেন। টঙ্কপাণি বেশকিছু প্রাচীন গ্রন্থের টিকা টিপ্পনি ও ভাষ্য রচনা করেন। প্রবীণ বয়সে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। তখন পুত্র চক্রপাণি বাবার পদেই আসীন হন। চক্রপাণি একজন উঁচুমানের কবি ছিলেন। তিনিও বাবার মতই প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

চক্রপাণির দুই পুত্র ছিল। শূরপাণি ও ধীরপাণি। এঁরা দুজন গৌড়দেশ ছেড়ে বরেন্দ্র প্রদেশে চলে এলেন। শূরপাণির বংশধরেরা কুচবিহারে চলে যান। শূরপাণির পুত্র শ্রীধর কামরূপরাজার দরবারে কাজ করতেন। বংশতালিকায় আমরা দেখতে পাব, তিন প্রজন্ম পরেও শূলপাণি নামে একজন ছিলেন। তাঁর ছিল দুই পুত্র। পিনাকপাণি ও চক্রপাণি। পিণাকপাণির পুত্র টঙ্কপাণি (দ্বিতীয়) খুব দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি পরম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে গৌড়রাজাকে সহায়তা করেছেন। গৌড়মন্ত্রী নিজকন্যাকে বিয়ে দিয়ে মিত্রতা স্থাপন করেন। উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে এক সম্পর্ক তৈরি হল। টঙ্কপাণি (দ্বিতীয়)-র পুত্র রত্নপাণি। তাঁর পুত্র নরসিংহ 'ঠাকুর' উপাধি গ্রহণ করে। অগাধ সম্পত্তির মালিকানা পেয়েছিলেন ঠাকুর নরসিংহ। আমরা একটা বিস্ময়ের ঘটনা দেখতে পেলাম! সেন ও পাল রাজাদের বিরোধিতার সময় নরসিংহ পালরাজাকে সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁর তিনপুত্র বটুদাস, পটুদাস ও ভুবনদাসের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র বটুদাস বল্লাল সেনকে সমর্থন করেছিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে নরসিংহ বটুদাসকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। বল্লাল সেন বটুদাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে পূর্ববাংলা শাসনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

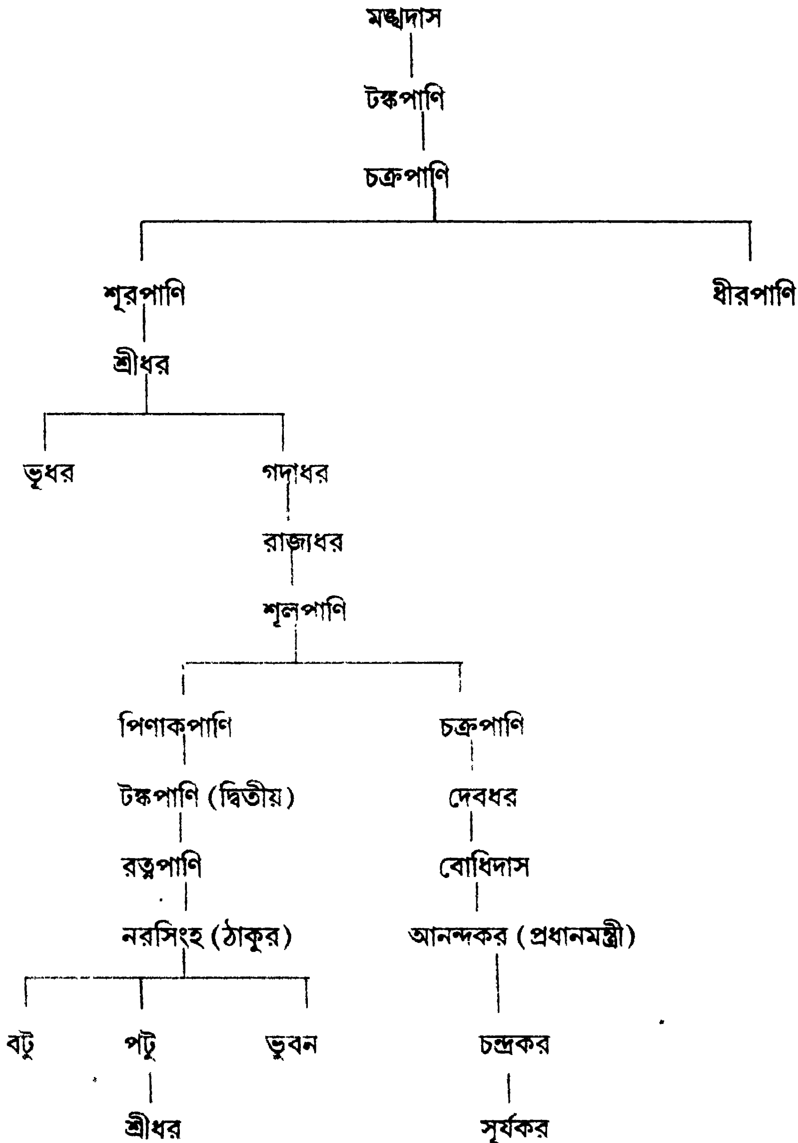
বেশ কয়েক প্রজন্ম পরে আমরা দেখতে পাই, নরহরি রায় বলে একজন কুচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহের মন্ত্রীসভায় যোগদান করেছিলেন। তিনি 'রায়' উপাধি বর্জন করে 'বড়ুয়া' উপাধি গ্রহণ করেন। অষ্টম শতাব্দী থেকে যেই বংশ পরিচিতির ইতিহাস রয়েছে তার দৈর্ঘ্য যে খুব ছোট হবে না, সে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

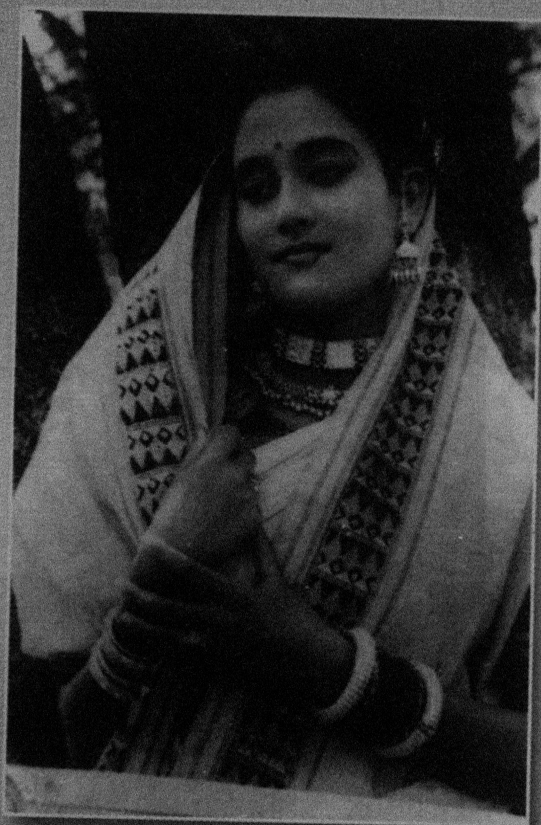


শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া

গৌরীপুরের রাজপরিবার

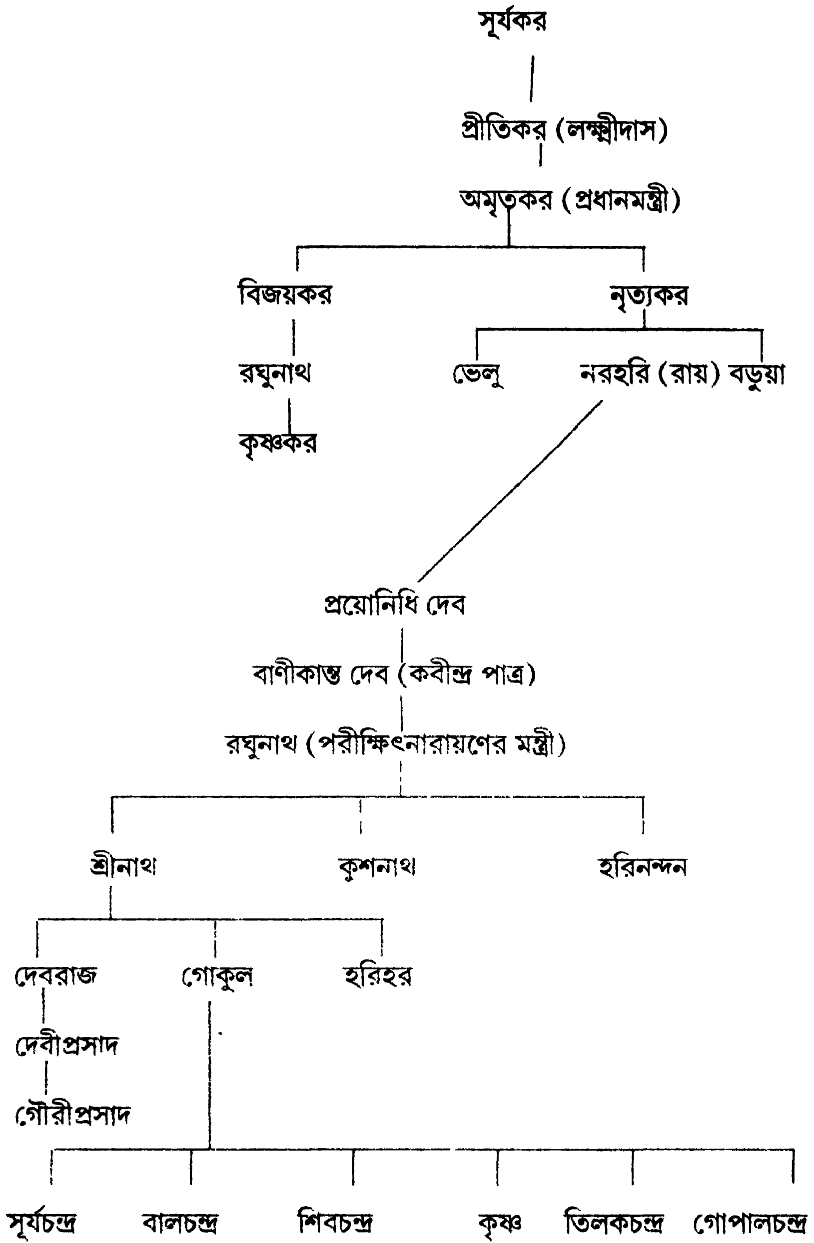
বংশতালিকা



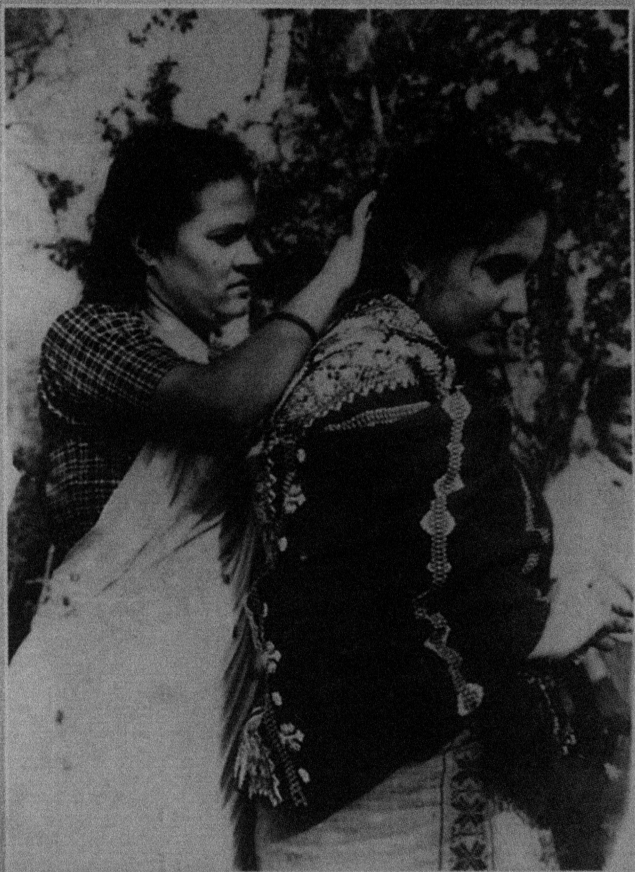


ভগ্নী প্রতিভা বড়ুয়া

মাহুত বন্ধু রে



সূর্যকর
প্রীতিকর (লক্ষ্মীদাস)
অমৃতকর (প্রধানমন্ত্রী)
বিজয়কর
নৃত্যকর
রঘুনাথ
কৃষ্ণকর
ভেলু
নরহরি (রায়) বড়ুয়া
প্রয়োনিধি দেব
বাণীকান্ত দেব (কবীন্দ্র পাত্র)
রঘুনাথ (পরীক্ষিৎনারায়ণের মন্ত্রী)
শ্রীনাথ
কুশনাথ
হরিনন্দন
দেবরাজ
গোকুল
হরিহর
দেবীপ্রসাদ
গৌরীপ্রসাদ
সূর্যচন্দ্র
বালচন্দ্র
শিবচন্দ্র
কৃষ্ণ
তিলকচন্দ্র
গোপালচন্দ্র



'মাহুত বন্ধুরে' ছবির নায়িকা মানসী সোম (সামনে)
ও শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া

বালচন্দ্র
পত্নী : ধ্বনিকা দেবী
: সর্বেশ্বরী দেবী

উমাকান্ত বা বুলচন্দ্র
পত্নী : দময়ন্তী দেবী
: ললিতা দেবী

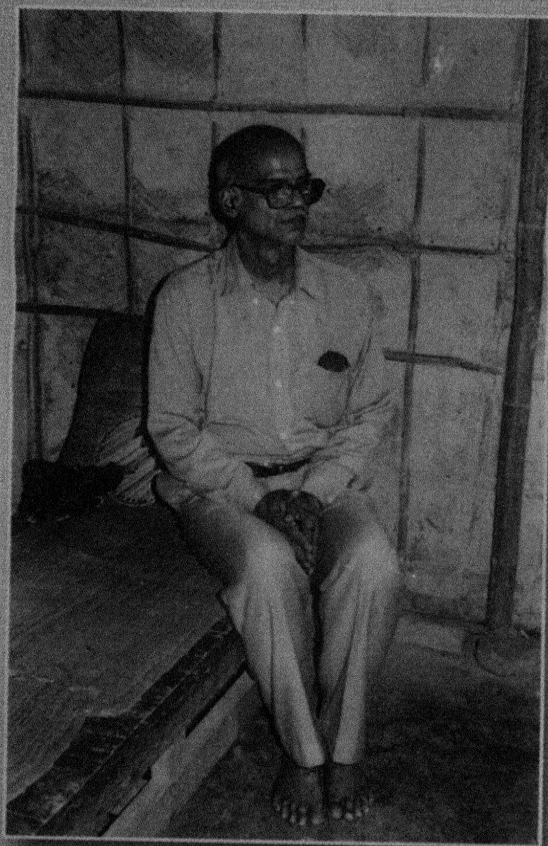
হরকান্ত বা বীরচন্দ্র
পত্নী : পূর্ণিমা দেবী
: যোগেশ্বরী দেবী (জয়দুর্গা)

ধরকান্ত (পোষ্যপুত্র)
পত্নী : লক্ষ্মী দেবী
: তারিণীপ্রিয়া

প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া (ডম্বরুকান্ত)
পত্নী : ভবানীপ্রিয়া
: আনন্দময়ী
: সূর্যেশ্বরী
: কাঞ্চনপ্রিয়া

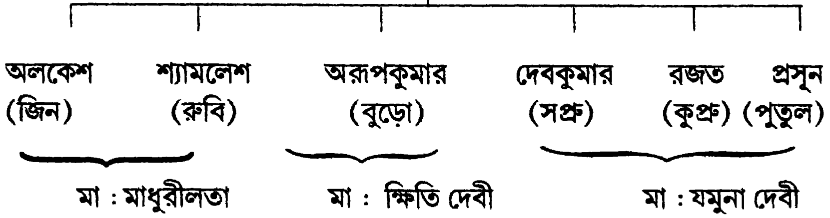
প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া (বুদ্ধিকান্ত) : পোষ্যপুত্র
পত্নী : সরোজবালা দেবী

প্রমথেশচন্দ্র | নীহারবালা | নীলিমাবালা | প্রকৃতীশচন্দ্র | প্রণবেশ

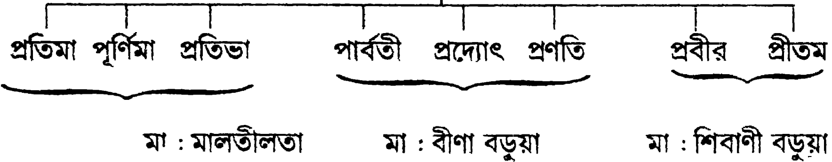


শিল্পীর স্বামী অধ্যাপক গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডে

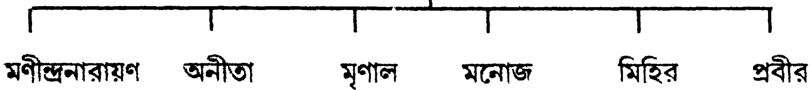
প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া (১৯০৩—১৯৫১)
পত্নী : মাধুরীলতা দেবী
: অমলা দেবী (ক্ষিতি)
: যমুনা দেবী



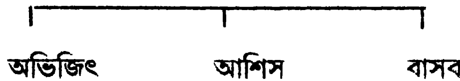
প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া (১৯১৪—১৯৮৮)
পত্নী : মালতীলতা বড়ুয়া
: বীণা বড়ুয়া
: শিবাণী বড়ুয়া



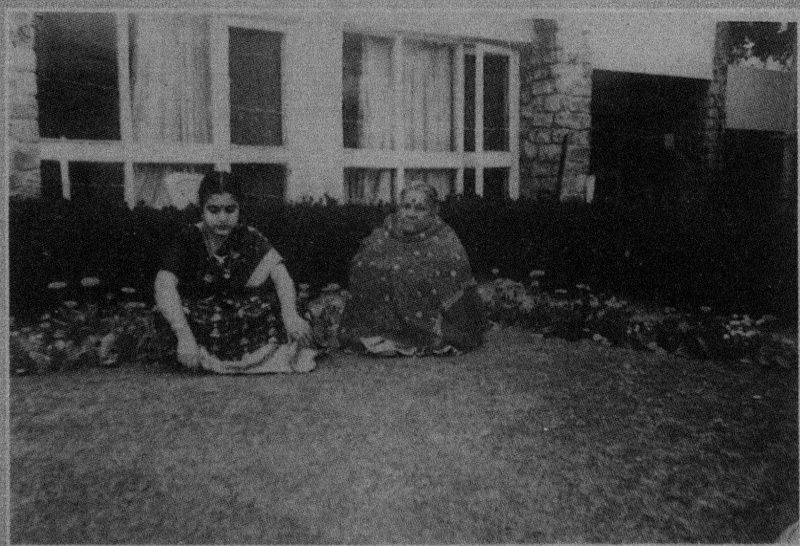
নীহারবালা বড়ুয়া (১৯০৫—২০০৪)
স্বামী : মুকুন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া



নীলিমা বড়ুয়া (১৯১০—১৯৭৪)
স্বামী : সন্তোষ বড়ুয়া



বংশতালিকায় যাঁদের কথা রয়েছে সবার কথা বলতে চাইলে ভিন্ন চরিত্রের বই লিখতে হয়। আমরা একটু একটু করে ছুঁয়ে যাব শুধু।



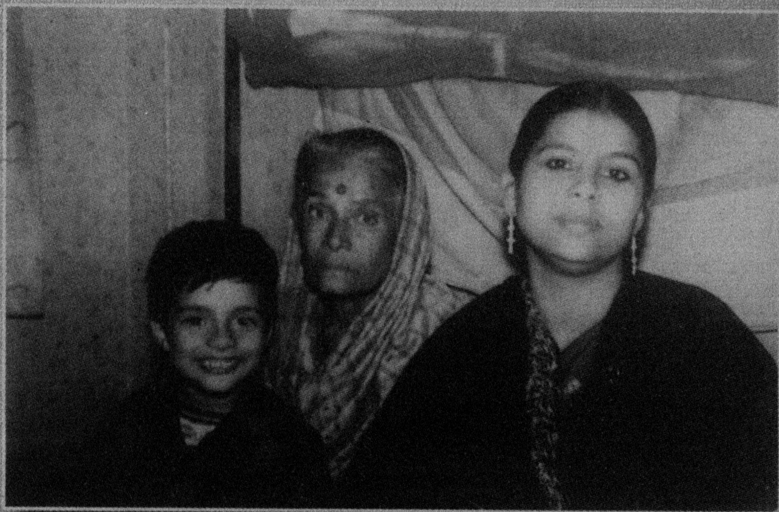
কন্যা অমৃতার সঙ্গে শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া

চক্রপাণির পুত্র ছিলেন দেবধর। তাঁর পুত্র বোধিদাস। মিথিলার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর পুত্র আনন্দকর বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি রাজার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আনন্দকরের পৌত্র সূর্যকর হরিসিংহদেবের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ধর্মপ্রাণ প্রীতিকর বা লক্ষ্মীদাসের পুত্র অমৃতকর মিথিলার রাজা শিবসিংহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর অন্যতম পুত্র নৃত্যকরের দুই সন্তান। ভেলু আর নরহরি। নরহরি শাক্ত ছিলেন। প্রায়ই কামাখ্যা মন্দিরে যেতেন। তখন কুচরাজ ছিলেন বিশ্বসিংহ। বিশ্বসিংহ তাঁর রাজত্বে অনেক ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। নরহরি রাজপুরোহিত হিসেবে কাজ করতেন। প্রধানমন্ত্রীর পদ দিতে চাইলে ফিরিয়ে দেন প্রথমে। পরে গ্রহণ করেন। পুজো আর্চার ক্ষতি হচ্ছে মনে করে আবার সেই পদ ছেড়ে দেন।

নরহরি (রায়) বড়ুয়ার পুত্র প্রয়োনিধি মিথিলারাজের দরবারে কাজ করতেন। তিনি কামরূপে এলে সেখানে পুত্র বাণীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। কবিত্বের শীর্ষে আরোহণ করে তিনি কবীন্দ্র পাত্র নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। ১৫৪৪ সালে রাজা নরনারায়ণের মন্ত্রীসভায় যোগ দেন।

একসময় বিশাল কোচরাজ্য দুভাগে ভাগ হয়। সঙ্কোশ নদীকে মাঝে সীমানা রেখে এই ভাগ করা হয়েছে। পূর্বদিকে রাজা হলেন রঘুদেব। পশ্চিমদিকের রাজা নরনারায়ণ। ১৫৮৭ সালে নরনারায়ণ প্রয়াত হন। তাঁর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহাসনে বসেন। ভুল ধারণার শিকার হন তিনি। কবীন্দ্র পাত্রকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারিত করা হয়। তখন চিলা রায়ের পুত্র রঘুদেব তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়ে যান। গোঁসা হয় লক্ষ্মীনারায়ণের। আক্রমণ করে ও ব্যর্থ হয়। রঘুদেবের পরে পরীক্ষিৎনারায়ণ রাজা হয়েছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তখন আবার আক্রমণ করেন। মুঘল রাজের কাছে খবর যায়। তিনি সুরাহা করেন। বসন্তরোগে অল্পসময়ের মধ্যেই পরীক্ষিতনারায়ণ মারা যান। কবীন্দ্র পাত্র পরীক্ষিৎনারায়ণের সারাক্ষণের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে কবীন্দ্র পাত্র শাসনের দায়ভার হাতে নেন। রংপুর থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত তাঁর শাসন বিস্তৃত ছিল। রাঙামাটিতে প্রধান কেন্দ্র তৈরি করে তিনি কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। কবীন্দ্র পাত্রের ছয়পুত্র ছিল। রঘুনাথ, কবিবল্লভ, বিষ্ণুদেব, মহাদেব, নিরঞ্জন ও নিত্যানন্দ। কবিত্বগুণের জন্য রঘুনাথ কবিশেখর উপাধি পেয়েছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের ছেলে বীরনারায়ণের রাজত্বকালে সবাই রঘুনাথকে 'কবিশেখর' বলেই জানতেন। ১৬১৯ সালে কবীন্দ্র পাত্র প্রয়াত হন। কবিশেখর রঘুনাথ বাবার দায়িত্ব কাঁধে নেন। মুঘলরাজ জাহাঙ্গীর খুশি হয়ে তাঁকে আরও দায়িত্ব দিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি রাজা প্রাণনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রঘুনাথের পুত্র তিনজন। শ্রীনাথ, কুশনাথ ও হরিনন্দন। শ্রীনাথ 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেব তাঁর হাতেই শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। 'রাজা' উপাধিও পেয়েছিলেন তিনি।

কবিরত্ন শ্রীনাথেরও তিন ছেলে ছিল। দেবরাজ, গোকুল ও হরিহর। দেবরাজ ও



কন্যা অলকা ও অলকার পুত্রের সঙ্গে শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া

গোকুল 'কানুনগো' উপাধি পেয়েছিলেন। দেবরাজ পুত্র দেবীপ্রসাদ পরে পিতার উত্তরাধিকারী হন। দেবীপ্রসাদের পুত্র গৌরীপ্রসাদ। গৌরীপ্রসাদ নিঃসন্তান ছিলেন। ফলে কর্তব্য প্রতিপালনের দায়িত্ব গোকুল-পুত্র সূর্যচন্দ্রের উপরে ন্যস্ত হয়েছিল। ১৭৪৪ সালে সূর্যচন্দ্রের ভ্রাতা বালচন্দ্রের পুত্র উমাকান্ত দায়িত্বলাভ করেন। উমাকান্তপুত্র বীরচন্দ্রের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন পরিচালনার বিষয়ে দশ বছরের চুক্তি হয়েছিল। মুঘল আমলের কাগজপত্রে কবীন্দ্র পাত্র 'রাঙামাটির রাজা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কোম্পানির আমলে রাজাকে রংপুরের রাজস্ব বাবত একুশটি হাতি দিতে হত প্রতি বছর। কোম্পানি দেখল, হাতি পুষতেই সব টাকা খরচ হয়ে যায়। তখন নিয়ম বদলাল। ১৭৮৪ সাল থেকে ৩১০১ টাকা করে প্রতিবছর কোম্পানিকে দিতে হত। পরে সেই পরিমাণ বেড়ে ৪২২১ টাকা হয়।

বীরচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি প্রয়াত হওয়ার পর যোগেশ্বরী দেবী ধরকান্তকে (ধীরচন্দ্র) পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ধীরচন্দ্র প্রথমে লক্ষ্মীদেবী ও পরে তারিণীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। তারিণীপ্রিয়ার কথা খানিকটা বললে ভাল হয়। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ধীরচন্দ্র 'কবিশেখর' ভ্রাতা 'কবিবল্লভ'-এর সপ্তমপুরুষ গুণানন্দর পুত্র ছিলেন। ধীরচন্দ্র ও তারিণীপ্রিয়ার সন্তান ছিলেন প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া। তাঁর কথা আমরা একটু পরেই বলব।

গৌরীপুরে যখন ২০০৩ সালে যাই তখন 'তারিণীপ্রিয়া চতুষ্পাঠী' আমার চোখে পড়ে। সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। মায়ের নামে প্রতাপচন্দ্র এই বিদ্যাচর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, মীমাংসা, স্মৃতি, সাংখ্য, বেদান্ত, অলঙ্কার সব বিষয়ের চর্চা হতো সেখানে। খ্যাতনামা পন্ডিত ও বিদ্বানেরা সেখানে পড়াতেন। অসম অধিবাসীদের অনেকেই একে 'অসমের নালন্দা' বলে চিহ্নিত করেন।

১৮৫৬ সালে রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রাঙামাটি থেকে গৌরীপুরে রাজবাড়ি স্থানান্তরিত করেন। এই নিয়ে একটা গল্পকথা লোকমুখে প্রচারিত রয়েছে।

প্রতাপচন্দ্র খুবই উঁচুদের শিকারি ছিলেন। তিনি কুলদেবীর নির্দেশে গৌরীপুরে মহামায়ার মন্দির স্থাপন করেন। মহামায়ার অন্য নাম গৌরী। ফলে বলতে পারি আমরা, গৌরীপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া। শুরুতে এসেই তিনি একটা মাইনর স্কুল ও একটা দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করেন। ১৮৬৯ সালে ধুবড়ি শহরে গোয়ালপাড়া জেলার রাজধানী উঠে আসে। এখনতো গোয়ালপাড়া নিজেই দুটো জেলায় ভাগ হয়েছে। একটি ভাগের নাম গোয়ালপাড়া। অন্যভাগের নাম ধুবড়ি। গৌরীপুর ধুবড়ি জেলায় এখন। ধুবড়ির উন্নয়নে তিনি অন্যতম প্রধান স্থপতি ছিলেন।

'যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ' প্রকাশের একশোভাগ ব্যয়ভার তিনি বহন করেন। অসম, উত্তরবঙ্গ, রংপুর (বাংলাদেশ) থেকে বহু গরিব ছাত্র এসে গৌরীপুরে প্রতাপচন্দ্রের



মাটিয়াবাগের বাড়ির এই সিঁড়িতে দুজনের মধ্যে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতেন শিল্পী।
ছবিতে মূর্চ্ছনা বড়ুয়া ও অনুভা বড়ুয়া

কাছে সহায়তা নিয়ে চতুষ্পাঠীতে পড়াশুনো করেছে। ১৮৬৫ সালে ভূটান যুদ্ধে ব্রিটিশদের সহায়তা করায় 'রায়বাহাদুর' খেতাব ঘোষণা করে। প্রতাপচন্দ্র সরাসরি জানিয়ে দেন, তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে এই উপাধি খাপ খায়না। তিনি দিল্লি গিয়ে এই উপাধি গ্রহণ করেননি। পিতামহের কথা নিজের ডায়েরিতে লিখে গিয়েছেন প্রকৃতীশচন্দ্র।

'আজ ১৯শে ভাদ্র ১৩৯২ (ইং ৫-৯-৮৫) আমার আজ ৭১ বছর ৪ মাস মানে ৭২ চলছে। লোকে বলে বাহত্তরে ধরেছে মানে এই বয়সে মাথা ঠিক থাকে না—তাই বোধহয় পাগলা-পাগলামী বিষয় লিখতে আরম্ভ করলাম।

ঠাকুরদা—রায়বাহাদুর ঁপ্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া।

কর্তাবাহাদুর ছিলেন এক পাগল—তিনি নিজেকে বড় মনে করতেন—খুবই বড় কেউকেটা গোড়া হিন্দু, তাই গুলি করে মারা হরিণ খেতেন না কারণ গুলিতে আগুন থাকে (বারুদ) তাই পুড়ে যায় এবং তা নানা জাতের লোকে ছোঁয় বলে অশুদ্ধ — হিন্দুয়ানীর উপর আঘাত।

সে সময় বৃটিশ সিংহ প্রবল প্রতাপে ভারত শাসন ও শোষণ করছিল। ধুবড়ির ডেপুটি কমিশনার মেজর হাওয়েল। ভূটান যুদ্ধে ঠাকুরদা—বৃটিশ সৈন্যকে রসদ ও ঘোড়া ও খচ্চরের ঘাস দিয়া সাহায্য করেছিলেন। 'রায়বাহাদুর' খেতাব দেবার জন্য দরবারে ডেকে তাঁকে খেতাবের সনদ দেওয়া হবে। ঠাকুরদা গেলেন না—বললেন, 'মোক দ্যাশের মানসি রাজা বুলি জানে—মুই কেনে যাং রায়বাহাদুরের কাগজ আনির'।

সাহেব খৃস্টান....ম্লেচ্ছ। মেজর হাওয়েল—ঠাকুরদা দরবারে না যাওয়ায় নিজে এসে সনদ দেওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন ও বৈঠকখানার হাতীর দাঁতের চেয়ারে বসলেন। ঠাকুরদা দেখা ত করলেনই না—যে হাতীর দাঁতের চেয়ারে সাহেব বসেছিল সে চেয়ারও ভেঙ্গে দেওয়ার হুকুম দিলেন সঙ্গে আর একটি হাতীর দাঁতের চেয়ার ছিল যা সাহেব ছুঁয়েছিলেন তাও ভাঙ্গা হল। যার ভাঙ্গা টুকুরা আমি দেখেছি ও অন্যকাজে লাগিয়েছি।

মাটিয়াবাগ পাহাড়ে ঠাকুরদার হাওয়া খাওয়া ও গাঁজা খাওয়ার জন্য মাঝারি সাইজের একটা পাকা মেঝে ও খড়ের ছাউনী বাঁধা ছিল। একদিন হঠাৎ ঝড় হওয়ায় হাওয়েল সাহেব বাংলার বারান্দায় আশ্রয় নেন। কর্তা একথা জানতে পেরে ঘর (বাংলা) পুড়িয়ে দেন। কর্তার একটা 'স্টিম বোট' ছিল। ঐ সাহেব 'টুর' করার জন্য চায়। প্রথমবার খারাপ হয়েছে বলে জানান হয় পরে আরো চায়—তখন দেওয়া হয়। পরে 'স্টিম বোট'টি ফেরত আসার পর সেটা আর কেউ স্পর্শ করেনা—এমনি পচে নষ্ট হয়ে যায়।

এরূপ গোঁড়ামি—হিন্দুয়ানী কি পাগলামী নয়?'

'কিন্তু ঐ মেজর হাওয়েল, লেংড়া ডি. সি. যখন ঠাকুরদার মৃত্যু সংবাদ পায় তখনই ইংরাজি বাদ্য (পুলিশ ব্যান্ড) নিয়ে শ্মশানে হাজির হয় ও যতক্ষণ চিতা জ্বলছিল



মাটিয়াবাগ বাড়ির একপাশে তিনি শেষ পিকনিকে যোগ দিয়েছিলেন

ততক্ষণ টুপি খুলে দাঁড়িয়ে থেকে সম্মান দেখান। তারপর উপরে লেখালেখি করে বদলি নেন—যাওয়ার সময় বলে যায়—'হামি মিলিটারী ম্যান—লড়াই করতে ভালবাসে। একটা সিংহ ছিল তার সঙ্গে লড়াই করতে ভাল লাগে—সে মরিয়া গেল এখন হামি কার সঙ্গে লড়াই করিবে—আর সব শিয়াল।'

১৮৮০ সালে প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া প্রয়াত হন। পত্নী ভবানীপ্রিয়া দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন। সন্তানলাভের আশায় তিনি একাধিক পত্নী গ্রহণ করেছিলেন। ভবানীপ্রিয়াই ঘড়িয়ালডাঙার সম্ভ্রান্ত বসু পরিবার থেকে প্রভাতচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন।

১৮৯৯ সালে প্রভাতচন্দ্র পিতা প্রতাপচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করেন। ১৯৯৯ সালে সমারোহ করে স্কুলটির শতবর্ষ পালিত হয়েছে। সেই উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বৃহদায়তন স্মরণিকা গৌরীপুর থেকে আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। ১৯০৯ সালে সাতাত্তর বছর বয়সে ভবানীপ্রিয়ার প্রয়াণ ঘটে। মায়ের নামে প্রভাতচন্দ্র গৌরীপুর চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সে আমলে ঘড়িয়াল ডাঙার বসু পরিবার খুবই সুপরিচিত পরিবার ছিল। দশরথ বসুর খুবই নামডাক ছিল। তাঁর বংশধর কুঞ্জোকিশোর বসু। পঁচিশ প্রজন্ম পরের সন্তান রাজকিশোর বসু। রাজকিশোরের ছয় পুত্র ছিল। গিরিশ, হরিশ, বুদ্ধিকান্ত, যোগেশ, বলদেব আর রামকিশোর। বুদ্ধিকান্তকেই ভবানীপ্রিয়া পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। নাম বদল করে রাখা হয় প্রভাতচন্দ্র। ১৮৯৬ সালে প্রভাতচন্দ্র সাবালক হন। আরও পাঁচবছর পর ১৯০১ সালে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। প্রভাতচন্দ্র সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর লেখা সঙ্গীতের বই ও সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থের একটা সমৃদ্ধ সংগ্রহ মাটিয়াবাগের বাড়িতে এখনও রক্ষিত আছে। গৌরীপুরে প্রভাতচন্দ্রের নামে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয়ও রয়েছে।

১৮৯৬ সালে সাবালক হওয়ার পর ভবানীপ্রিয়া তাঁকে সরোজবালার সঙ্গে বিবাহ দেন। সরোজবালা ছিলেন অসামান্য ধর্মপ্রাণা মহিলা। বৈষ্ণবধর্ম মেনে চলতেন। নিরামিষ খেতেন। জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাধারণ। রত্নগর্ভা ছিলেন সরোজবালা। প্রমথেশচন্দ্র, প্রকৃতীশচন্দ্র, নীহারবালা, নীলিমা—সবাই তাঁর সন্তান। প্রমথেশচন্দ্র মায়ের মৃত্যুর পর খুবই আঘাত পেয়েছিলেন।

প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া চলচ্চিত্র জগতে 'বড়ুয়া সাহেব' নামে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর জীবনকাহিনি অসম্ভব ঘটনাবহুল। যা আমরা ভিন্ন বইয়ে পেশ করব। নীহারবালা বড়ুয়া শতবর্ষের দ্বারে এসে প্রয়াত হন। মৃত্যুর মাস কয় আগে গৌরীপুরে তাঁকে আমার দেখার সুযোগ ঘটেছে। তাঁর সন্তান মনোজ বড়ুয়া, যিনি ইন্ডিয়ান অটোমোবাইলস্-এ কাজ করতেন, আমাকে নানা অসুবিধে সত্ত্বেও 'মা'-এর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর স্মৃতি বেশ কবছর ধরেই কাজ করছিল না। একটা আলোকচিত্র গ্রহণের সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি।



শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া ও সহশিল্পী সীতানন্দ রায়

বড়পিসি নীহারবালা বড়ুয়া

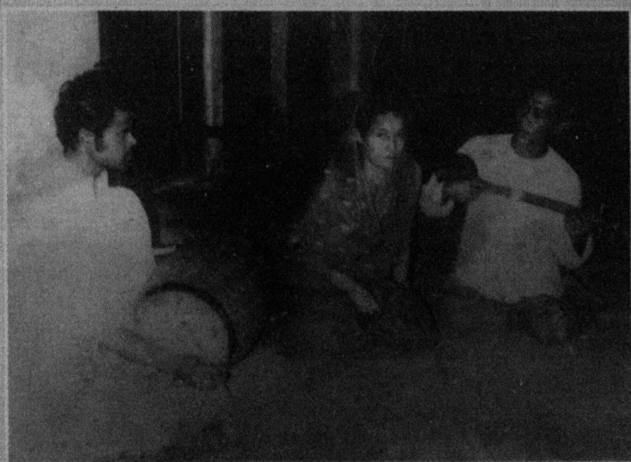
১৯০৫ সালে নীহারবালার জন্ম হয়। রাজপরিবারের কন্যা। আর এই বাড়িতে ছোটোবেলা থেকেই সবাই শিকারে বেড়িয়ে পড়ে। নীহারবালাও বাবার সঙ্গে বনজঙ্গলের গভীরে শিকারে যেতেন। নাচ আর গানের কথা উঠলেই নীহারবালা তাঁর ছোটোবেলার একটা গল্প বলতেন। অক্রুর (অক্কুর) পাগলি নামের এক বুড়ি রাজবাড়িতে প্রায়ই এসে খেয়ে যেত। গরীব মানুষ বেশ ক'জন করে রোজ দুপুরেই রাজবাড়ীতে খাবার পেত। অক্কুর বলত, সে এক জমিদারের মেয়ে। ছোট্ট নীহার বুঝতে পারতনা অতো কথা। সে নিজেকে জমিদারের মেয়ে বলত। বলতে বলতে দুজনে ঝগড়া। অক্কুর তখন রেগে গিয়ে নাচতে থাকত আর গান গাইতে থাকত। খুশির মেজাজ থাকলেও অক্কুর গাইত আর নচত। খুশি হলে বা রাগ হলে এসব চলত। চোখ বড় বড় করে এসব দেখতেন দু ভাই বোন। প্রমথেশ আর নীহার। শুনতে শুনতে ছোট্ট নীহারের নাচ ও গান মুখস্থ হয়ে যায়।

'পাগেলা গেইচে আলিপুর/কিনিয়া আইনচে নাকের ফুল/সেই না নাকের ফুল/মোর নাকোতে মিশাইল রে পাগেলা' চমৎকার গান। মন ভরে যেত। নাচটাও শিখে ফেলেছিলেন আট বছরের জমিদার তনয়া নীহারবালা। ছি ছি ছি—জমিদারের মেয়ে নাচবে! ওসব ছোটলোকের নাচ! নীহারবালাকে তাই বলে থামানো যায়নি। সংস্কৃতির উৎস কোথায়, কোন গভীরে, তিনি পলে পলে শিখেছেন। চাতকের মত লোকগান সংগ্রহের পিপাসায় ঘুরেছেন। বাড়ির পরিচারিকাদের কাছ থেকে লুকিয়ে গান শিখেছেন।

১১ বছর বয়সে ঘুরলা জেলার ঝাপসাবাড়ি গ্রামে মুকুন্দনারায়ণ বড়ুয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়। কিছুদিন পর সপরিবারে গৌরীপুরে চলে আসেন। একটু একটু করে নীহার বড় হলেন। নিষেধের বেড়া হালকা হতে থাকল। গোপনে গান শিখতেন। গান সংগ্রহ করতেন। সাহায্য করতেন পিসিমা মৃন্ময়ী বড়ুয়া ও বড় ননদ শরৎসুন্দরী। বাবা এগিয়ে এলেন। স্বামীও চাইতেন নীহার গান করুক। মাহুত আর মৈষালদের জীবন পরম আগ্রহ আর শ্রদ্ধার সঙ্গে বুঝতে চাইলেন নীহার।

১৯২৫/২৬ সাল। কখনো যাচ্ছেন ঘুরলা, কখনো আগমণি বা বগড়ীবাড়ি, কখনো নৌকোয় নদীতে, নৌকো নিয়ে গেছেন মহিষের বাথানে বাথানে। এই সময়েই নাগরিক জীবন সমৃদ্ধ লোকগানের দিকে নজর ফেরায়। ভদ্রবাড়ির ড্রয়িংরুমে লোকগানের কথা আলোচিত হয়।

লেখাপড়া? স্কুলে কলেজে? তা আর হল কই? দেশের মাটি আর মানুষ তাঁর সব



(বামদিক থেকে) সহশিল্পী বিমল মিস্ত্রী, শিল্পী প্রতিমা ও
সহশিল্পী সুধীর রায়

অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে তুলল। রাজনন্দিনী নীহার মিশে যেতেন রাজবংশী, মাঝি, ভুঁইমালি, কেওই বা ডোম মানুষদের সঙ্গে।

ছেলেমেয়েদের কথা, 'সংসার চালানোর কাজটা পিসিমা আর বাবা দেখতেন। মায়ের চেয়ে বাবাকে আমরা বেশি কাছে পেয়েছি।' পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ের মা ছিলেন নীহারবালা।

মেয়েদের নানা অনুষ্ঠানে মিশে যেতেন নীহার। হুকুমপূজা নিজে থেকে দেখেছেন। বুঝতে চেয়েছেন তার দর্শন। মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে মিশে তাদের নাচ গান নিজের করে নিয়েছেন। এখন সেই নাচ গান দেখা যায়না। নীহারের স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বাবা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া মেয়ের এমন আগ্রহে প্রশ্রয় দিতেন। একদিন করিতুল্লা শেখ নামের একজনকে বাড়িতে ডেকে আনেন। তাঁর গান শুনেন। মুগ্ধ হলেন প্রভাতচন্দ্র। নীহারের আনন্দ আর ধরে না তখন। বাবা বললেন, তাঁর কাছে গান শিখতে পারো। এমনইতো চাইছিলেন। গান শেখা শুরু হল। রাজা ও জমিদারেরা রাজসভায় বা নিজের জমিদারীতে বড় বড় সঙ্গীতশিল্পীদের রাখতেন, এমন উদাহরণ অনেক রয়েছে। একজন অখ্যাত লোকগানের মানুষ জমিদার বাড়ির 'শিক্ষক' হয়েছেন, ইতিহাসে এমন ঘটনার মূল্যমান ভদ্রজনেরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবেন। একা গান শিখবেন কি নীহার? না। নীহারপুত্র মৃণাল বড়ুয়া দোতরা শিখতে শুরু করেন। জমিদার বাড়ির বহু ছেলেমেয়ে জড়িয়ে পড়ল এমন আনন্দ ভাবনায়। গান শেখান দুজন। করিতুল্লা শেখ, বয়ান শেখ। মেয়েলি গান শেখান শরৎসুন্দরী। রাজবংশী এক মহিলা চিত্রমালা। বাড়ির পরিচারিকারা গানের সঙ্গে নাচ শেখাতেন। সেই নাচ নীহারবালা পরে নিজেও শেখাতেন। আমেনা নামের এক মাহুতকন্যা (১২/১৩ বছর) মুসলমানি গান নাচ শেখাতেন। শুধুমাত্র লোকগান আর লোকনৃত্যের সর্বাঙ্গীন চর্চার এমন আয়োজন অতকাল আগে আর কোনো রাজ/জমিদার বাড়িতে হয়েছে বলে জানা নেই আমাদের। এই 'স্কুল' এর অন্যতমা পড়ুয়া ছিলেন 'বুচু'। প্রতিমা বড়ুয়া। পরে যিনি লোকগানের সম্রাজ্ঞী হলেন। এই অঘোষিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পরে নানা জায়গায় অনুষ্ঠানও করেছে। খাতায় কলমে লোকসংস্কৃতির চর্চা নয় শুধু, নিজের জীবনধারায় তাকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন জমিদার বাড়ির একগুচ্ছ সন্তানসন্ততি। এই বাড়ির সবাই লোকগানের কোনো না কোনো আঙ্গিক জানতেন। মৃণাল বড়ুয়া পরে কলকাতায় এসে মনোচিকিৎসক হয়েছিলেন। কেউ চাইলে আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে নিখুঁত দোতরা বাজানো শিখিয়ে দিতেন। কলকাতায় এলেন নীহার বড়ুয়া। শান্তিনিকেতনে গেলেন। কলকাতায় সুকুমার সেন তাঁকে লিখতে বললেন। কথা রাখলেন। 'দেশ' 'পরিচয়', 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় লেখা বেরোল। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, খালেদ চৌধুরী ও তিনি Folk Music and Folklore Research Institute গড়ে তোলেন। শ্রদ্ধেয় খালেদ চৌধুরী তাঁর 'লোকসংগীতের



(বামদিক থেকে) ঢোল বাদক বসন্ত মিস্ত্রী, দোতারা বাদক সুধীর রায় ও শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া

প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, 'নজরে পড়ল শহরে লোকসংগীতের বিকৃতি, কিন্তু কোনোদিন ভাবিনি লোকসংগীত নিয়ে আলাদাভাবে ভাবব অথবা গবেষণা করব। এমনি সময় শ্রীমতি নীহার বড়ুয়া, হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং আমি এই নিয়ে আলোচনা করতে বসে সাব্যস্ত করলাম একটা সংস্থা তৈরি করব, যার কাজ হবে লোকসংগীত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও লোকসংগীতের বিকৃতি রোধ করা। এই মর্মে উপরিউক্ত তিনজন ছাড়াও আরো কয়েকজন সমমনস্ক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সংস্থা তৈরি হল, যার নাম দেওয়া হল, 'ফোক মিউজিক অ্যান্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।' আজীবন লোক সংস্কৃতির প্রচারক তিনি। গান করে, নেচে লিখে, আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে তিনি তার প্রসার চেয়েছেন।

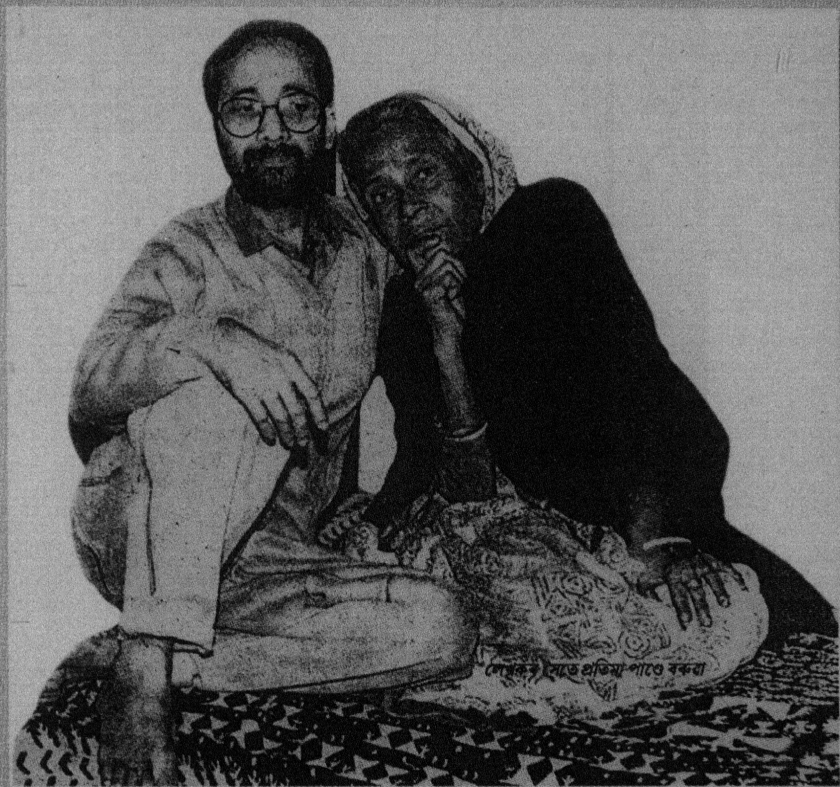
জঙ্গলের কন্যা জন্মসূত্রে না হয়েও তিনি ছিলেন জঙ্গলকন্যা। গাছগাছালি চিনতেন। নানা পশুপাখি বিষয়ে অনেক কথা জানতেন। হাতির শুঁড় বেয়ে চটপট তার পিঠে উঠে যেতে পারতেন। পাথর আর পাখির ডিমের এক ঈর্ষণীয় সংগ্রহ ছিল সংগ্রহশালায়।

তিরিশের দশকে একা একা ইউরোপে যান। ফিরে এসে 'কো-এডুকেশন' চালু করেন। বাধা ছিল। মানেন নি। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি কলকাতা থেকে গৌরীপুর ফিরে যান।

আগেই বলেছি, মা সরোজবালা জমিদার বাড়ির বধূ হয়েও সাদামাটা জীবন কাটাতেন। দামি শাড়ি গহনা পরতেন না। ছেলেমেয়েদের সবরকম কাজ শেখাবার পক্ষপাতী ছিলেন। মায়ের মত নীহারও সব কাজ নিজের হাতে করতে ভালবাসতেন। ধানভানা, চিঁড়েকোটা, নারকেলের চিঁড়ে তৈরি—সব কাজে যোগ দিতেন। মা খুব কম বয়সে চলে যান। এমন গুণান্বিতা মহিলা কেন চলে যাবেন? ঈশ্বর ভাবনা মন থেকে বিসর্জন দিয়ে দেন। নাস্তিক হয়ে যান নীহারবালা।

গৌরীপুরে নীহারবালার বাড়িতে গিয়ে একটা বিষয় দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। ড্রয়িং রুমে ফর্মালিন দ্রবণে প্রচুর সাপ সাজানো রয়েছে। হ্যাঁ সাপ, ছোটোবেলায় ওবাড়ির মেয়েরা কিছু জীবন্ত সাপকে নাকি গয়না করে পরতেন! কোনো সংগ্রহশালায় যে দৃশ্য দেখা যায়, নীহারবালার গৌরীপুরের বাড়ির ড্রয়িংরুমে সে দৃশ্য দেখেছি। বাঘ, হরিণ ও হাতির দেহের নানা অংশের কথা আলাদা করে বলা বাহুল্যমাত্র।

গোয়ালপাড়ার গান ও নাচ বিষয়ে তিনি তত্ত্বগতভাবেও কতটা পরিণত ছিলেন তাঁর লেখা প্রবন্ধ সংকলন 'প্রান্তবাসীর ঝুলি' পড়লেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি।



শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়ার সঙ্গে রণধীর দেব অধিকারী যিনি শিল্পীর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ক্রাই অফ দি হুইল' প্রকাশে উদ্যোগ নিয়েছিলেন

ছোটপিসি নীলিমা বড়ুয়া

প্রভাতচন্দ্র ও সরোজবালা বড়ুয়ার তৃতীয় সন্তান নীলিমা বড়ুয়া ১৯১০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর গৌরীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র তের বছর বয়সে সন্তোষ কুমার বড়ুয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সন্তোষকুমার গৌরীপুরের বিধায়ক হয়েছিলেন একসময়। শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়ার তিনি ছোটো পিসি ছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই লোকশিল্পের প্রতি তাঁর নিবিড় আগ্রহ জন্মায়। তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষের শিল্পবোধ যেমন তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে, তিনিও তাদের একসাথে এনে নানা শিল্পভাবনা সঞ্চারিত করেছেন। বাঁশ, বেত, ধাতু, কাঠ, বস্ত্র প্রভৃতি নানা জিনিসের তৈরি লোকসামগ্রীর এক ঈর্ষণীয় সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন নীলিমা। একসময়ে তিনি বিশ্বভারতীতে গিয়ে 'কলাভবন' এ ভর্তি হন। শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর ছাত্রী ছিলেন তিনি। 'কলাভবন' এর সংগ্রহ ঘেঁটে দেখেছি। মাস্টার মশাইয়ের জন্মদিনে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা ছবি এঁকে একটা অ্যালবাম উপহার দিয়েছিলেন। সেখানে নীলিমা বড়ুয়ার আঁকা একটা ছবিও রয়েছে। সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে নীলিমা কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, লন্ডন, প্যারিস ও পৃথিবীর আরও নানা দেশে শিল্পসামগ্রীর প্রদর্শন করেন। চলতি হাওয়ার বাইরে চলতেই যেন ভালোবাসতেন বড়ুয়া পরিবারের লোকজন। তিন ছেলেকে শান্তিনিকেতনের স্কুলে ভর্তি করিয়ে নিজে নীলিমা কলাভবনে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ক্যান্সারে তিনি মারা যান। তাঁর তিন ছেলের নাম ছিল অভিজিৎ, আশিস ও বাসব। অভিজিৎ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ছিলেন। বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। জলি বড়ুয়া নামে পরিচিত ছিলেন। অপরিণত বয়সে তিনি চিরকালের মত চলে যান। তাঁর স্ত্রী চিত্রা বড়ুয়া খ্যাতনাম্নী সুচেতা কৃপালনীর ছোট বোন। আশিসকুমার বড়ুয়া লন্ডন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে কিছুদিন মুম্বাই ও পরে বাইশ বছর একটানা দিল্লিতে কাজ করেছেন। ১৯৮৯ সাল থেকে তিনি গৌরীপুরেই রয়েছেন। তৃতীয় সন্তান বাসবও বেঁচে নেই। প্যারিসে গিয়েছিলেন। সেখানে ফরাসি কন্যা নিকোলেকে বিয়ে করেন। খুব ভাল মৃৎশিল্পী ছিলেন বাসব।



শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া। বিষণ্ণতার ভার বইছেন কি তিনি?

বাবা প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া

এবার আমাদের লালজী বা প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার কথায় যেতে হয়। তাঁকে নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম সেরা হস্তীবিশারদ ছিলেন তিনি। দেশের ভেতরে যেমন চর্চা হয়েছে কমবেশি তাঁকে নিয়ে, বিদেশেও হয়েছে। লোকশিল্পী প্রতিমার পিতা তিনি। তাঁর জীবনকথা আমরা একটু পরিসরে বলব। কেননা, তাঁর চিন্তা ভাবনা ও কাজের প্রভাব সবচেয়ে বড় মেয়েটির মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। কলকাতা থেকে পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্যের লেখনীতে ১৯৮২ সালের এপ্রিলে 'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। বইয়ের মূল শিরোনামের নীচে লেখা ছিল 'রাজকুমার প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার হাতি সম্পর্কে আজীবন অভিজ্ঞতার সংক্ষেপিত আলেখ্য'। বইটিতে ভূমিকা লিখেছেন আরও একজন হাতি বিশেষজ্ঞ ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী। লিখছেন ধৃতিকান্ত, 'পাঁচবছর বয়স থেকে লালজীর কথা শুনে আসছি। আশৈশব আমার কাছে তিনি এক অবাক পুরুষ। হাতি সম্বন্ধে, বিশেষত হাতির শ্রেণী বিচার ও হাতি ধরার ব্যবহারিক দিকগুলি সম্বন্ধে যা জেনেছি তার অধিকাংশই তাঁর কাছ থেকে।....১৯৪২ সালে লালজীর পিতাকে প্রথম দেখি। খাকি হাফপ্যান্ট ও সাদা হাফশার্ট পরা ছোটখাট প্রাণবন্ত মানুষটির চেহারা এখনো চোখের সামনে ভাসে। যতীন দাসের রোডের বাড়ির বৈঠকখানায় বড়দের শিকারের গল্প বলছেন; ....লালজীর মত প্রকৃত 'বনুয়া'র দেখা আর মেলেনি। লালজী 'মহলাদার' অর্থাৎ 'হাতি মহল' ইজারা নিয়ে হাতি ধরে থাকেন। এরকম মহলাদার আসামে অনেকেই; কিন্তু এঁদের কেউ হাতির সঙ্গে জঙ্গলে-মহালে—মাসের পর মাস থাকেন না। হাতি ধরা এদের পেশা, নেশা নয়।' ধৃতিকান্ত আরও বলেছেন, 'কোনো দিনই বিনা যুক্তিতে কিছু গ্রহণ করতে তাঁকে দেখিনি।.....'

হাতির বাজারে তিনি 'বাবা' নামে পরিচিত ছিলেন। সবাই তাঁর কাছে আসতেন। স্মৃতি থেকে লিখেছেন ধৃতিকান্ত, একবার ত্রিপুরা থেকে 'ব্রিজকুমার' ও 'কুমুদপ্রসাদ' নামে দুটো খুব ভাল হাতি এসেছিল। শোনপুরের ইতিহাসে এমন সুন্দর হাতি নাকি আর বিশেষ আসেনি। একটা ভাল দাঁতাল হাতির দাম যেখানে ছিল দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা 'ব্রিজকুমার'কে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর কথায় '....লালজী এক পূর্ণ মানুষ, এক অদ্ভুত মানুষ। এঁকে বলব এক রকমের পাগল? অবশ্যই। যেমন পাগল ছিলেন ভ্যান গ', গোগ্যাঁ, মেরুবিজয়ীরা বা এভারেস্ট অভিযাত্রীরা। এজন্যই বোধ হয় গৌরীপুর শহরে একটি মাত্র সমৃদ্ধ ঘরেই বিজলীবাতি জ্বলে না; সেটা মাটিয়াবাগ রাজপ্রাসাদ।



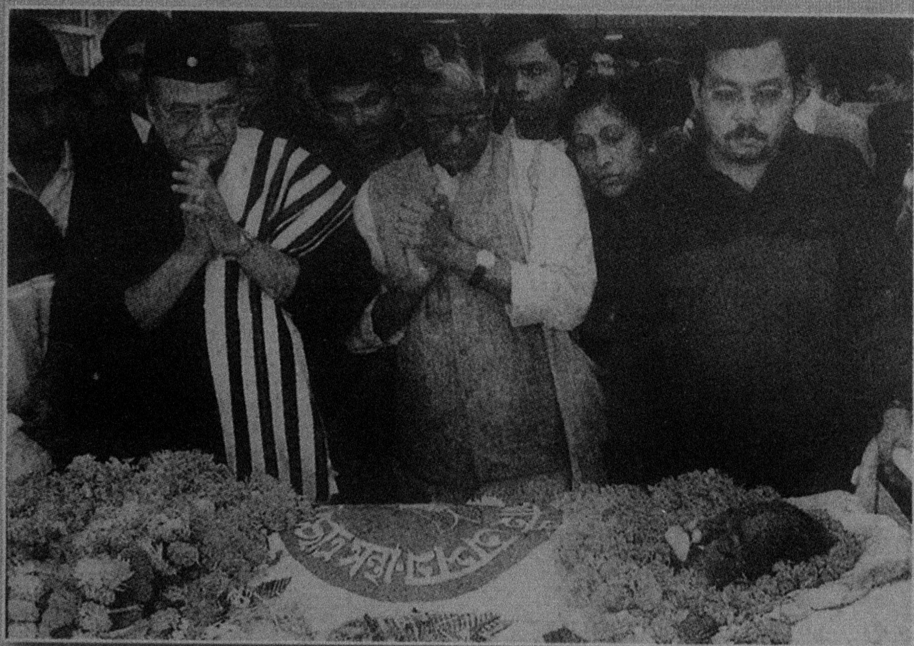
গৌহাটির নার্সিংহোমে শিল্পী ও ভূপেন হাজারিকা

লালজীর প্রিয়তম হাতির নাম ছিল প্রতাপ সিং। এই হাতির নামে হাসপাতাল হয়েছে। সরকার বাহাদুর আপত্তি করেছিলেন। লালজী ছাড়বার মানুষ নন। বললেন দাদুর নামে, দাদার (ঁ প্রমথেশ বড়ুয়া) নামে স্কুল কলেজ হতে পারলে কেন তাঁর হাতির নামে হাসপাতাল হবেনা? সরকার শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন। মাটিয়াবাগের বাড়ির এক তলায় প্রতাপসিং-এর বিশাল তেল রঙ ছবি আজও দেখা যায়। প্রতাপের একবার অসুখ করলে 'লালজী' নিজের বুক চিরে রক্ত দিয়ে মানত করেন। প্রতাপ তড়কা রোগে (অ্যানথ্রাক্স) মারা যায়। এরপর তিনি গয়ায় গিয়ে প্রতাপের নামে পিন্ড দিয়ে আসেন। 'মুক্তি' ছবিতে যে বড় হাতিটি দেখা গিয়েছিল তার নাম ছিল 'জং বাহাদুর'। দাদা প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রিয় হাতি। না, লালজী তাকে 'সেরা' বলতেন না। প্রতাপের চেয়ে সে এক ফুট উঁচু ছিল। তবু সেরা নয়। দুঃখ করেছেন ধৃতিকান্ত, 'যে যুগে, যে পরিবারে যেভাবে লালজী তৈরি হয়েছিলেন, সেই যুগ, সেই পরিবেশ, সেই পরিবার, সেই জীবনযাত্রা এবং সর্বোপরি সেই জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী আজ শেষ হয়ে গেছে'।

ফরাসিদেশে লালজীর হাতি ধরা নিয়ে একটি বই বেরিয়েছে। ছবির বই। A la Recherche des Éléphants Sauvages, Hachette, u. d. ; লেখক Gabrielle Bertrand ;

লালজীর কন্যা হস্তী বিশেষজ্ঞা পার্বতী বড়ুয়া তাঁর বাবার বিষয়ে প্রতাপচন্দ্র উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ স্মরণিকায় একটি স্মৃতিকথা রচনা করেছেন। খুবই আন্তরিক সেই স্মৃতিচিত্রণ। বলেছেন তিনি, দেশে লালজীর মত কি আর হাতি বিশেষজ্ঞ ছিলনা? ছিল। তবে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বিশ্লেষণের ক্ষমতা কারো ছিলনা। সত্যিই লালজীর মত বনজঙ্গলের প্রেমিক পৃথিবীতে খুব বেশি দেখা যায়না। দেশবিদেশে যাঁরা বন্যপ্রাণী নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁদের অনেকেই লালজীর কাছে নিয়মিত পরামর্শ নিতেন। জন্ম থেকে হাতির সঙ্গে ঘর করেছেন তিনি। সাত বছর বয়সে হাতির পিঠে চড়েছেন। একটা হাতির নাম ছিল 'তারারানী'। 'তারারানী'র কাছেই তাঁর হাতিশিক্ষার হাতে খড়ি হয়। হাতিখানায় দিনের পর দিন কাটাতেন লালজী। হাতিখানায় থেকে মাহুত আর বরফান্দিদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। লেখাপড়া বাদ দিলে চলবেনা। কলকাতায় পড়াশুনো করতেন বলে নিয়মিত শিক্ষার কাজে ব্যাঘ্যাত হত তাঁর। পড়াশুনো ছেড়ে দিলেন। গৌরীপুরে পাকাপাকি চলে এলেন। পার্বতী বলেছেন, 'ওই সময় আমাদের বংশে লেখাপড়া করাটা প্রধান বলে মনে করতেন না কেউই, শিকারে কে কতোটা পারদর্শী হয়েছেন, সেটাই শিক্ষার মাপকাঠি বলে গণ্য হত। লেখাপড়া না করলে নিন্দেমন্দ হতনা। শিকার করতে না জানলে একঘরে হয়ে যেতে হত। ঘরের ছেলেমেয়ে সবাই বন্দুক চালনা, শিকার করা, হাতির পিঠে চড়া এমনকি দিনের পর দিন জঙ্গলে থাকতে ওস্তাদ হয়ে উঠছিল।'

কমবেশি পাঁচ দশক তিনি জঙ্গলে ঘুরেছেন, বহু বিপদের মুখে পড়েছেন। জীবনহানি



শেষ শয়ানে শিল্পী। শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন ভূপেন হাজারিকা ও
'অসম সাহিত্য সভা'র সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ঘটেনি যদিও, জীবনকে প্রতি মুহূর্তে বাজী রেখেই কাজ করতেন। হাতির সুখ দুঃখের সঙ্গে তিনি নিজের সুখ দুঃখ মিলিয়ে নিয়েছিলেন। লালজীকে নিয়ে ফরাসি ভাষায় লেখা বইয়ের কথা আমরা আগে বলেছি। আফ্রিকার হাতি বিশেষজ্ঞ ডগলাস হ্যামিলটন লিখেছিলেন, 'Living amongst animals one becomes more like them'.

পার্বতীর কথায়, 'হাতি ধরা, হাতিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, বশ করা, হাতির লক্ষণ বিচার করা, হাতির মন মেজাজ বোঝা, হাতির শরীরের গঠন বিচার করা, হাতির দাঁতের গঠন, হাতির প্রকারভেদ, হাতির সামাজিক জীবনযাত্রা, হাতি ধরার পদ্ধতি উদ্ভাবন, হাতি শিকার, হাতির চিকিৎসা, হাতির নিরাময়ে বনজ ওষুধের অনুসন্ধান ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল অটুট'।

হাতিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর হতে হয়। মারপিট করতে হয় নির্মমভাবে। তারপর ঘরে তৈরি নানা ওষুধ কেটে যাওয়া অংশে লাগিয়ে নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হয়। যখন বরফান্দিরা এই কাজ করতেন, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করতেন। নির্মমতা কি কমানো যায়না? হ্যাঁ, এই বিষয়েও লালজী সফলতা পেয়েছিলেন।

১৯৩৭ সাল থেকে লালজী নিয়মিতভাবে হাতি ধরার কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তাঁর তত্ত্বাবধানে এক হাজার পাঁচটি হাতি ধরা হয় ও তাদের পোষ মানানো হয়। অসম, মেঘালয় ও উত্তরবঙ্গের জঙ্গল লালজীর হাতি ধরার জায়গা ছিল। ওইসব জঙ্গলের পথঘাট, জনজীবন, অন্য প্রাণীদের আচার আচরণ তাঁর নখদর্পণে ছিল। বই পড়া অভিজ্ঞতা নয়, বাস্তব থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তিনি।

মাত্র দশ বছর বয়সে লালজী একটা চিতা (লিওপার্ড) মেরেছিলেন। ১৯২৪ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ১১১টি চিতা মেরেছিলেন তিনি। ১৯২৬ সালে ভালুকীগাঁওয়ের জঙ্গলে প্রথম লালজী বাঘ (টাইগার) মারেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তাঁর হাতে ৬৫টি বাঘ জীবন দেয়। অনেকের মনে হতেই পারে, এইভাবে যথেচ্ছ শিকার কি যথাযথ ছিল? না, বড়ুয়া পরিবারের কেউ যেন তেন উপায়ে যখন খুশি শিকার করতে বেরোতেন না। আজ বন্যপশুদের সংখ্যা নানা কারণে কমে গিয়েছে। শিকার বেআইনি ঘোষিত হয়েছে। তখন ছবিটা এমন ছিল না। প্রজারা নানা সময়ে এসে ক্ষয়ক্ষতির কথা বলতেন। তখন রাজপরিবারের কর্তব্য পালন করতেই হত। সেখানেও নিয়ম ছিল কঠোর। যেমন, কোনো পশুর যদি বাচ্চা থাকত বা পশু যদি সন্তানসম্ভবা হত তাকে কিছুতেই মারা হত না। প্রজনন ঋতুতেও শিকার পুরোপুরি বন্ধ থাকত। স্ত্রী পশুশিকার করা হত না। হিংস্র ভাবে আক্রমণ না করলে কোনো প্রাণীকেই অযথা মেরে ফেলা হতনা।



গৌরীপুরে শিল্পীর ঘরের সম্মুখে স্মৃতি আধার

বিখ্যাত হস্তীবিশারদ পি. ডি. স্ট্র্যাসি 'Elephant Gold' বইতে লালজী বিষয়ে লিখেছেন, 'Lalji......was a born elephant man, with a deep love for the animal and a most humane approach to the sometimes sordid business of elephant catching. He could always be relied upon to observe the rules scruplously and had great control over his men, with whom he lived in the jungle'.

প্রকৃতীশচন্দ্রের আরও একটি গুণের কথা সবাই জানেন না। স্কাউট হিসেবে তিনি খুবই সুনাম অর্জন করেন। দক্ষতা দেখিয়ে স্কাউটদলের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি হল্যান্ড গিয়েছিলেন। অসম থেকে ওইবছর দুজন মাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল।

মানুষ লালজীর একটা পরিচয় আমরা সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহের 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে' বই থেকে পেশ করব। সহজ ভঙ্গীতে শ্রীগুহ লালজী বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

'আমাদের এই হীনমন্য, মানুষে ভরা দেশে, দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরেও সাহেবরা সার্টিফিকেট না দিলে বা নেমন্তন্ন না করলে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই যেন সম্পূর্ণ স্বীকৃতি আসে না। সাহেবরা ভালো বললেই আর কথা নেই। তারা ডাকলেই কাছা খুলে দৌড়ে যাই আমরা। অথচ রবীন্দ্রনাথ এবং অন্য দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রকৃত গুণীদের ক্ষেত্রে দেশজ এবং স্বদেশীয় সম্মানই তাঁদের একমাত্র সম্মান। এবং সেই হয়তো আসল সম্মান। স্বদেশ, স্বভাষা-ভাষী যাকে বড় না বলেন বিদেশী সম্মান তাঁকে কোনোদিনও বড় করতে পারেনি। পারবেও না।

সাহেবে সম্মান দিয়েছে তবু দেশের লোক তাঁকে যোগ্য সমাদর করলো না এমন দৃষ্টান্ত বাংলা চলচ্চিত্র জগতের পথিকৃৎ প্রবাদ-প্রতিম প্রমথেশ বড়ুয়ার ছোট ভাই প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার মতো বেশি নেই। প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার ডাকনাম 'লালজী'। কিশোর বয়স থেকেই আমি তাঁকে ঐ নামেই জানি।

লালজীর মতো এত বড় হাতিবিশেষজ্ঞ এই মুহূর্তে পৃথিবীতেও খুব বেশি নেই। সাম্প্রতিক অতীতে ওড়িয়া ও ডগলাস হ্যামিলটন দম্পতি পূর্ব-আফ্রিকার ডালা (NDALA) উপত্যকায় হাতিদের সঙ্গে বছর কয়েক থেকে একটি বই লিখেছেন 'অ্যামঙ্গস্ট্ দ্যা এলিফ্যান্টস্'। ওঁরা অবশ্য ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির স্কলারশিপ নিয়েই গেছিলেন। ওসব দেশে কত সুযোগ-সুবিধা! যে কোন বিষয়ে কারো বিশেষ কোনো যোগ্যতা থাকলেই তাঁর উপরে সুযোগ যেন বর্ষিত হয়। অথচ এদেশীয় লালজীকে এখন শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যেই ব্যস্ত থাকতে হয়।

সম্মান?

সে তো অনেক বড় ব্যাপার। সভ্য এবং সৎ মানুষদের দেশেই যোগ্য জনে যোগ্য সম্মান প্রত্যাশা করতে পারেন। এদেশে সম্মান এবং যশও তো এখন 'কন্ট্রোলড্



শ্রীমতী প্রতিমা বড়ুয়াকে

উত্তরবঙ্গ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলের লোকায়তের লোকসংগীতের অনন্যা শিল্পী শ্রীমতী প্রতিমা বড়ুয়া, আপনাকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছি।

বাংলা ও আসামের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের আর্তি ও আনন্দ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা এবং গভীরতম স্বরবিস্তার নিয়ে আপনার কণ্ঠে মুখরিত হয়ে আছে। তার আস্বাদনে আমরা নিয়ত অভিভূত হয়েছি। আপনি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

গৌরীপুরের উচ্চ অভিজাতকুলের কন্যা আপনি, তুলে নিয়েছেন মাটির সুর, মাটির মানুষের ঘরে পাতা হয়েছে আপনার চিরস্থায়ী আসন। আপনাকে আমরা বিনম্র প্রণাম জানাই।

আরও বহু বহু বৎসর আপনার কণ্ঠের প্রাণ ও উজ্জ্বলতা অম্লান থাক, বাংলা-আসামের লোকগীতি আপনার কণ্ঠে পৃথিবীব্যাপী সংবর্ধনা লাভ করুক।

জোড়াসাঁকো
৩০ অক্টোবর ১৯৯০

উপাচার্য
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

শিল্পীকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রদত্ত সম্মান

কমোডিটি' হয়ে গেছে। কিছু ক্ষমতাবান ও কুচক্রী মানুষদের হাতে তার কলকাঠি।

হ্যামিলটনদের বইটিও ভালো তবে ওঁদের মাত্র কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা। আর লালজীর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। হাতিদের সঙ্গে, হাতি শিকার করে, হাতি ধরে সমস্তটা জীবন হাতির জঙ্গলেই কাটিয়ে দিলেন উনি। এক ফরাসী ভদ্রলোক, তাঁর নাম গাব্রিয়েল বেরত্র'আ 'লা হ্শের্শ্ দে জেলেফঁ সোভাতা' বলে একটি ছবির বই প্রকাশ করেছেন। লালজীর হাতি ধরার জীবন নিয়ে। আমি ফরাসী জানি না। জানি না বলে লজ্জিত নই। খুব কম ফরাসীই বাংলা জানেন। তবে জানলে, পড়তে পারতাম বইটি।

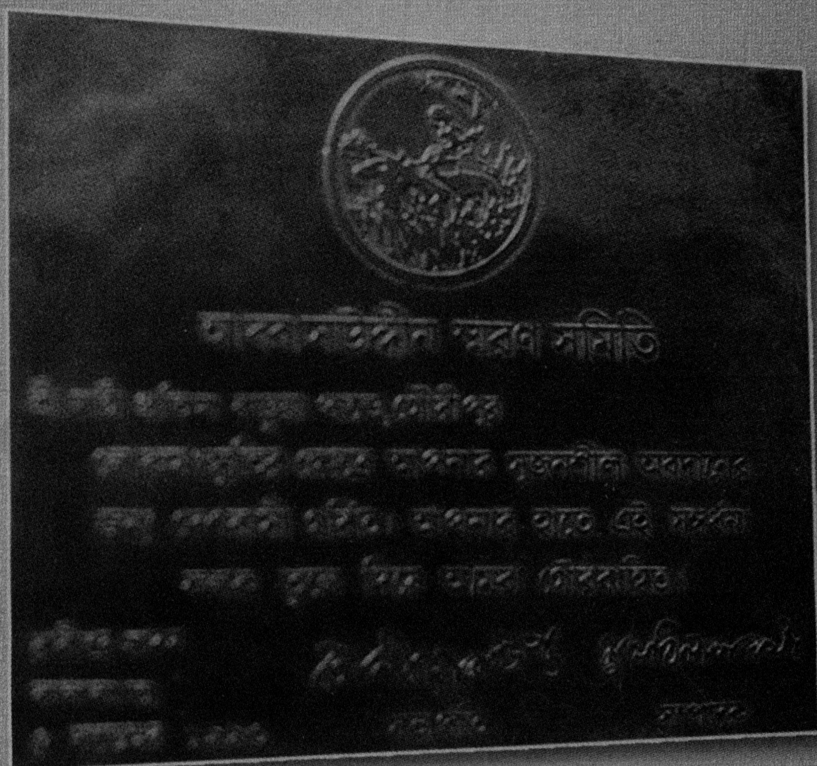
অহমিয়া ভাষায় লালজীর উপরে কোনো বই আছে কিনা জানি না। তবে বাংলাতে, পুলিশের প্রাক্তন ডি আই জি পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য লালজীর বামনপোখ্রির ডেরায় গিয়ে থেকে, তাঁর কথাবার্তা টেপ করে একটি বই লিখেছিলেন 'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর'। ওঁর সাক্ষাৎকার ছাড়াও পাঁচুগোপালবাবু অনেক পড়াশোনা করেছেন বইটি লেখার আগে। বই পড়েই তা বোঝা যায়। ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরির ভূমিকাও ঐ বইয়ের দাম আরও বাড়িয়েছে। চমৎকার বই। অসম্ভব না হলে আপনারা জোগাড় করে পড়বেন।

লালজীর, আমার উপর বহু বছর থেকেই এক তীব্র স্নেহমিশ্রিত অভিমান আছে। যা তিনি গত দশ বছরে একাধিকবার আমার অফিসে এসে, আমাকে অসংখ্য চিঠি লিখে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন। অভিমান এই কারণে যে, আমি কেন ওঁকে নিয়ে কিছু লিখিনি। বা লিখি না। আজই (১৭-১১-৮৬) আমার অফিসে লোক দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

প্রমথেশ বড়ুয়ার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের পেছনের বাড়ি এখন ভেঙে মালটিস্টোরিড বাড়ি হয়েছে। এবারে সেখানেই এসে উঠেছেন উনি। যমুনা দেবীর কাছেই। দু-একদিনের মধ্যেই বম্বে চলে যাবেন চিকিৎসার জন্যে। এর মধ্যেই দেখা করতে হবে ওঁর সঙ্গে।

ওঁকে নিয়ে যে লিখিনি এমনও নয়। আমি কারোরই জীবনী বা কোনো বিশেষ মানুষকে নিয়ে এ পর্যন্ত কোনো আলাদা লেখাই লিখিনি। তবু ওঁকে খুসি করার জন্যে ওঁরই উপরে একটি আলাদা বই লেখার ইচ্ছা রইলো কোনোদিন।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় আমার বাবা ওঁর এইট মি.মি. মুভি-ক্যামেরাতে লালজীর হাতিধরার ক্যাম্পের উপর দু-রীল কালার্ড ছবি তুলে নিয়ে এসেছিলেন। মনে আছে, আমরা ভাইবোনেরা মহোল্লাসে বসে দেখতাম হাতির খেদা, ফান্দা দিয়ে হাতি ধরা, হাতির চান, হাতিদের দৌড়াদৌড়ি করে একসারসাইজ্ করা, শীতের শুকিয়ে-যাওয়া নদীর সাদা পাথর-নুড়ি বুকে। আমি প্রথমবার ওঁকে চাক্ষুষ দেখি উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশে, বাইমানার জঙ্গলের ক্যাম্পে। সঙ্গে নীহার দেবীর (বড় রাজকুমারীর) ছেলে মণীন্দ্র বড়ুয়াও ছিলেন।



'আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি' প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র

'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর'-এর সমালোচনা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হওয়ার পর লালজী একটি চিঠি লেখেন। আরও অসংখ্য চিঠি উনি লিখেছেন আমাকে তার আগে ও পরে।

প্রকৃতি যথার্থই প্রকৃতীশকে প্রকৃতীশ করেছেন। প্রকৃত বড় শিকারি, বনদরদী বা গুণী যাঁরা তাঁদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এমন বিনয় চিরদিনই লক্ষ্য করেছি। বিনয়ের ভান নয়, 'পোজ' নয়, ভঙ্গি নয়। সত্যিকারেরই বিনয়। নইলে ওঁর অভিজ্ঞতা, ওঁর সমস্ত জীবনের সান্নিধ্য প্রকৃতির সঙ্গে, এসব আমার মতো শহুরে সখের বনচারীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। ওঁর পায়ের কাছে বসে সারাজীবন শিখলেও হয়তো সব শেখা হবে না। ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মশায়ও পাঁচুগোপালবাবুর বইয়ের ভূমিকাতে এই কথাই যথার্থ লিখেছেন।

শুধু হাতিই নয়, একজন মানুষের পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর গভীরতম অরণ্যবাসের অভিজ্ঞতাই কি কম? ইচ্ছে তো করে আমারও যে, ওঁরই মতো জীবন যাপন করি। এ জীবনে হলো না। পরজন্মে যদি এই পৃথিবীতে বনজঙ্গল একটুও বেঁচে থাকে, কয়েকজন নির্বুদ্ধি, দাম্ভিক, খুনী মানুষের হঠকারিতায় এবং কোটি কোটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের স্বার্থসর্বস্ব নিশ্চেষ্টতায় এই সুন্দর রূপ- রস-বর্ণ-গন্ধ-শব্দর পৃথিবী যদি ধ্বংস না হয়ে যায়, তবে ফিরে এসে তখন লালজীর মতোই জীবন যাপন করব। এ জীবনে কিছু হলো না, হায়!

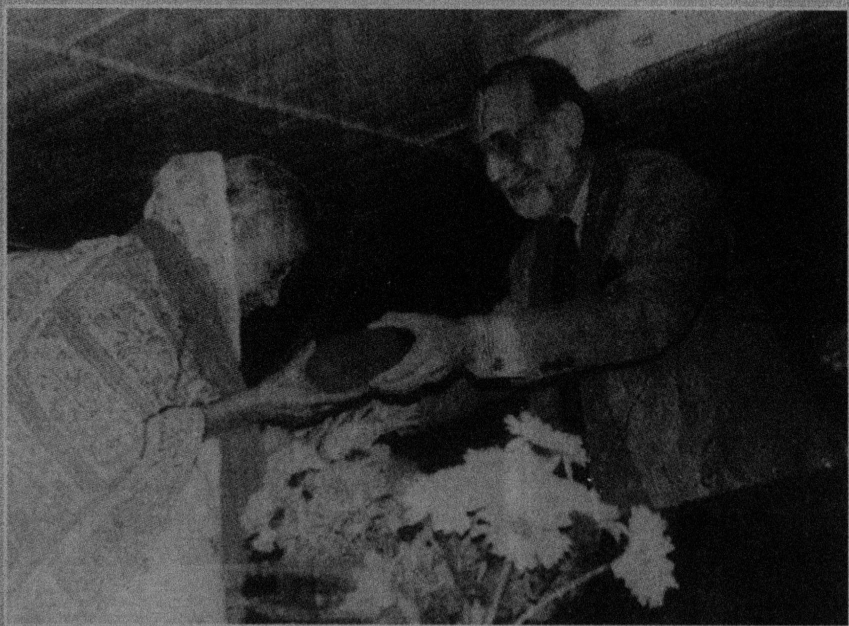
আহা! জীবনের মতো জীবন! এই ইঁট-কাঠ-কংক্রীট, ডিজেলের ধোঁয়া আর নয়। আর নয়। 'লালজীর মতো জীবন' কথাটা সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। পুরুষের যদি প্রকৃতির মধ্যে বাঁচতেই হয়, তার এমন করেই বাঁচা উচিত। লালজীর সঙ্গে আজই সন্ধেয় দেখা হবে বলেছি যমুনা দেবীর ফ্ল্যাটে। ছিয়াশির আঠারোই নভেম্বরে। কিন্তু জঙ্গলে ওঁর সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার বিবরণটা আপনাদের শুনিয়ে নিই।

ডুয়ার্সের বামনপোখ্রি থেকে চিঠি লেখার পর দুটি চিঠি ওঁকে লিখলাম এই কথা জানিয়ে যে আমার পেশার কাজে শিলিগুড়ি যাচ্ছি শিগগির। ওঁর সঙ্গে দেখা করব। জঙ্গলে ওঁর সঙ্গ পেয়েছিলাম প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে তাই এবারে জঙ্গলেই ধরতে চাই ওঁকে।

পৌঁছনো তো গেল বামনপোখ্রি, কিন্তু লালজীর দেখা পাওয়া গেলো না। বীট অফিসারও ছিলেন না। চৌকিদার তো 'লালজী' নাম বলতে, চিনতেই পারলো না। তারপর চেহারার বর্ণনা এবং গুণপনার বর্ণনা ভালো করে দেওয়ার পর বললো, ও ও ও 'রাজার' কথা বলছেন?

'রাজা' বলেই সকলে ডাকে তাঁকে। আসলেও রাজা। গৌরীপুরের রাজা। প্রভাত বড়ুয়ার ছেলে তিনি।

খোঁজ করে জানা গেল যে রাজা, মূর্তী বাগানে নেই, বাতাবাড়ি চা বাগানের কাছে



পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বীরেন জে শাহের হাত থেকে শিল্পী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধি গ্রহণ করছেন

যে মূর্তী নদী আছে, সেই নদীতে বা নদীয়ার কাছাকাছি কোথাও আছেন।

গাড়ি চলতে লাগলো। মূর্তী নদীর খোঁজে। পথ অজিতের তেমন জানা নেই। বিকাশেরও নয়।

দুদিকের গভীর জঙ্গল হাতির একেবারে 'প্যারাডাইস'। নইলে 'লালজী' এসে এখানে আস্তানা গাড়বেনই বা কেন?

একটু পরেই অজিত দৌড়ে এসে বলল, স্যার আপনার রাজা এখানেই আছেন। কোথায়?

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে শুধোলাম আমি।

ঐ তো স্যার। পাননি দেখতে?

কোথায়?

ঐ তো। ঐ যে।

বলেই, আঙুল দিয়ে দেখালো এবারে।

কত্তদিন দেখিনি লালজীকে! শেষবার দেখা হয়েছিলো বছর তিনেক আগে কি আরও বেশি হবে যখন অফিসে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

হাটের এক পাশে একটি ছোট্ট চালাঘরের মুদির দোকানে দাঁড়িয়ে কী যেন কিনছিলেন। আমরা ওঁকেই খুঁজছি শুনে একজন গিয়ে দৌড়ে খবর দিলো ওঁকে। উনি ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন গাড়ির দিকে। ওঁর দুটি হাত দিয়ে আমার দুটি হাতকে জড়িয়ে ধরলেন।

অলিভগ্রিন ট্রাউজার পরা, পায়ে সস্তাতম খয়েরি-রঙা একজোড়া কেডস্ জুতো। সবুজ-রঙা ফুলহাতা সোয়েটার। মাথাতে, হাতে-বোনা কালো উল দিয়ে বানানো নেপালি টুপি। টুপির ওপরে রূপোর একটি ছোট্ট হাতির এম্‌ব্লেম্।

লালজীর টুপি বড়ই গোলমাল করে দিলো দেখছি। ওঁর কথাতেই ফিরি আবার। লালজী হাত না ছেড়েই দাঁড়িয়ে রইলেন।

কাল বামন-পোখ্‌রিতে গেছিলাম আপনার খোঁজে।

আমি বললাম।

আর আজ এসেছি এখানে খুঁজতে। মাঝে-মাঝে পত্রাঘাত করে যে কোথায় মিলিয়ে যান। আপনাকে পাওয়ার চেয়ে মানুষখেকো বাঘের হদিশ করা সোজা।

ছোট্ট-ছোট্ট তামাটে-সোনা সাদা গোঁফের শীর্ণকায় বৃদ্ধ হেসে বললেন : গরু খোঁজাই বলুন। কী বলেন?

লজ্জিত হয়ে বললাম গরু খোঁজা?

হাসলেন।

বললেন, একটু দাঁড়ান। বাজারটা সেরে নিই। মানী-গুণী লোককে তো শুধু চা খাওয়ানো যাবে না। একটু বিস্কুট আর ডিম কিনে নিই। গরীবের ঘরে তো সবসময় খাতির করার মতো থাকে না জিনিস।



প্ৰতি

শ্ৰীমতী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা

শ্ৰদ্ধাভাজনেষু

কলা- সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা মহত্বপূৰ্ণ
অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে
কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ পুণ্য স্মৃতিত
আপোনাক সম্বৰ্ধনা তথা
"কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা বঁটা '৯৭"
প্ৰদান কৰি অসমৰ ৰাইজৰ হৈ অসম চৰকাৰে
পৰম গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে।

ৰাভাৰ আভাৰে আলোকিত
যাত্ৰা পথেৰে অগ্ৰসৰ হৈ
জীৱনজোৰা সাধনাৰে আপুনি
অসমৰ কলা- সংস্কৃতিক মহীয়ান কৰি তুলিছে।
আপোনাৰ এই নিৰলস সাংস্কৃতিক যাত্ৰা
বৰ্তমান আৰু উত্তৰ পুৰুষৰ বাবে
সুগভীৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস।

কলাৰ সেৱাত ব্ৰতী আপোনাৰ
সুন্দৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী কৰ্মময় জীৱন
আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ।

বিষ্ণু ৰাভা দিৱস
২০ জুন, ১৯৯৭
দিছপুৰ

(প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত)
মুখ্যমন্ত্ৰী, অসম

'কলাগুরু বিষ্ণু রাভা স্মৃতি পুরস্কার' এর মানপত্র

উনি আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আবারও হাটের ভিড়ে মিশে গেলেন।

লালজী বলছিলেন, পাঁচবছর গোয়ালপাড়া জেলার (আসামের) এম এল এ ছিলেন। বললেন, 'জীবনে ঐ একটাই পাপ কাজ কইর‍্যা ফ্যালাইছি।' আর কখনই অমন পাপ করব না।

দেবকান্ত বড়ুয়া একদিন ডেকে বললেন, রাজা আপনি মন্ত্রী হন।

আমি বললাম, রাজা বলেই যখন ডাকলেন তখন মন্ত্রী হতে বলেন কেন?

পশ্চিমবঙ্গর তিনজন এম. এল. এ. একদিন এসে আমাকে বললেন যে, হাতে মাত্র পনেরো মিনিট সময় আছে। আমাদের হাতি সম্বন্ধে কিছু বলুন। বাগডোগরাতে প্লেনে নেমে বন্যার অবস্থা দেখতে এসেছিলেন। ভাবলাম কি বলি? পনেরো মিনিটের মধ্যে হাতিকে আর জীবনের সব অভিজ্ঞতাকে আঁটাই কেমন করে?

গল্প শুনছিলাম যে, সীলেট থেকে আসা এক ভদ্রলোক হাতি দেখে বলেছিলেন, 'তিতা তি তাতি?' মানে, এটা কি হাতি? সামনেও ল্যাজ পেছনেও ল্যাজ তা খায় কোথা দিয়ে?

সীলেটের মানুষের উপর রাগ আছে এমন কোনো দুষ্টু লোকের বানানো গল্প নিশ্চয়। তা ঐ গল্পই শুনিয়ে দিলাম এম. এল. এ.-দের। কী মনে করলেন কে জানে? পনেরো মিনিটে 'তিতা তি তাতি' ছাড়া আর কীই-ই বা বলি?

ওঁদের বললাম, বন্যায় দেশের লোক মারা গেলো। না খেয়ে আছে সকলে। তা আপনারা প্লেনে চড়ে বেড়িয়ে বেড়ান কেমন? সরকারি টাকায়? হাতি ধরে আমি এ বছর যা রোজগার করেছি তার সবই চলে গেল গ্রামের লোকদের চাল আর ফ্যান দিয়ে। আর আপনাদের লজ্জা নেই?

আমাদের সময় খুবই দামী।

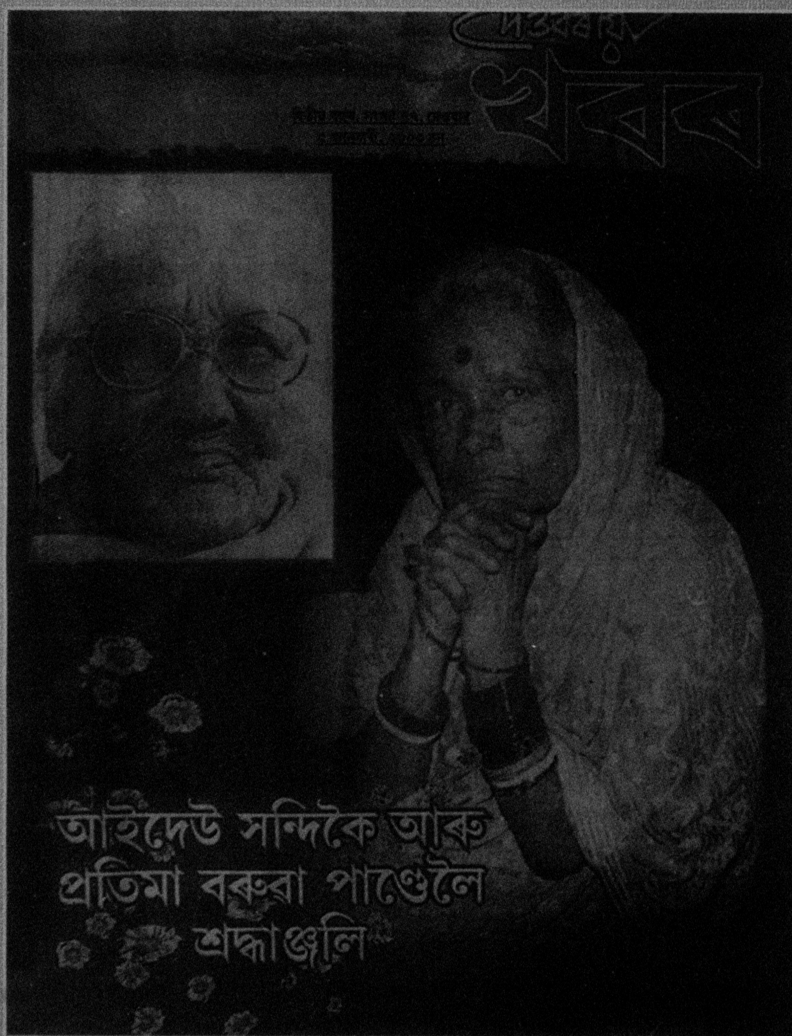
এম. এল. এ.-রা বললেন।

আমি ভাবলাম, বলি যে, যারা ভোট দিয়ে আপনাদের এম. এল. এ. বানালো তাদের জীবনের দামই শুধু সস্তা?

কিন্তু আমার প্রশ্নর কোনো উত্তর না দিয়ে 'তিতা কি তাতি' শুনে এম. এল. এ.-রা প্লেন ধরতে চলে গেলেন।

লালজী চোদ্দটি ভাষা জানেন। অসমিয়া, বাংলা, রাজবংশী, ইংরিজি, ('ভুলটুল নিয়ে', 'ওঁর ভাষায়) হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষা। যেমন খাসি, রাভা, মেচ, গারো, সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, নেপালি এবং ভুটানী। অন্য দেশ হলে লালজীকে নিয়ে অনেকদিন আগেই ডকুমেন্টারি ছবি হতো। ভিডিও ফিল্ম হতো। প্রামাণ্য সব বই বেরোতো।

তবু, লালজীকে নিয়ে অনেক কাজ হবে তা এখনও আশা করব। এবং ওঁর জীবদ্দশাতেই হবে। আমি একজন 'লে-ম্যান'। আমি কি আর পারব ওঁর গভীর জ্ঞানের সবটুকু তুলে আনতে!



নানা সাহিত্যপত্ৰে শিল্পীকে নিয়ে প্ৰচ্ছদ ৰচনা

বোন পার্বতী বড়ুয়া

বড়ুয়া পরিবারে যিনি লালজীর বিদ্যার যথার্থ উত্তরাধিকারী তিনি তাঁর কন্যা পার্বতী বড়ুয়া।   অক্টোবরে গুয়াহাটি রবীন্দ্র ভবনে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। বিশিষ্টদের মধ্যে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ উপস্থিত ছিলেন। প্রমথেশচন্দ্রের উপরে অলোচনার জন্য আমার ওই সময়ে গুয়াহাটিতে যাওয়ার সুযোগ ঘটে। সঙ্গে প্রমথেশচন্দ্র ও যমুনা দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র আমার অগ্রজবন্ধু দেবকুমার বড়ুয়া গিয়েছিলেন। যমুনা দেবীরও যাওযার কথা ছিল। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারেননি। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সংগঠক মঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় গিয়েছিলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন প্রকৃতীশপত্নী বীণা বড়ুয়া। কন্যা পার্বতী বড়ুয়া। গোয়ালপাড়িয়া নাচের বিশিষ্ট শিল্পী প্রকৃতীশকন্যা প্রণতি বড়ুয়া। প্রণতি এখন গুয়াহাটিতেই থাকেন। স্কুলে পড়ান। নাচটাকে ছেড়ে দেননি। গুয়াহাটি শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে দিলীপ হাজারিকা ছিলেন। অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ ছিলেন। 'অসম সাহিত্য সভা'র সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন। খুব ভাল গাইতে পারেন, নিখিলেশ বড়ুয়া ছিলেন।

সংবাদপত্রে ও দূরদর্শনে ছোট্টখাট্ট চেহারার পার্বতী বড়ুয়াকে আগে দেখেছিলাম। মুখোমুখি পরিচয়ের পর সত্যিই অবাক হয়ে যাই। এত্তটুকুন রোগা শরীরে হাতিদের কি করে শাসন করে এই মেয়ে? নানা কথা হয়। শুরু থেকেই বুঝতে পারছিলাম, অত্যন্ত স্পষ্ট কথার মানুষ। তথাকথিত ভদ্রতার মুখোশ নেই। যা বলতে চান, সোজাসুজি বলেন। হাতিশিকার বলুন আর গোয়ালপাড়িয়া গান ও নাচের কথা বলুন, আমার বিদ্যেতো অষ্টরম্ভা। ওদিকে সাহস করে পা বাড়াইনি। একতরফা শ্রোতার ভূমিকায় অভিনয় করে যাই। শুনেছিলাম, পার্বতীও গোয়ালপাড়িয়া গান খারাপ করেন না।

কথায় কথায় এখনকার লোকগানে সঙ্গতের কথা উঠল। বড্ড বেশি বাজনা। কানে বাজে। গানের কথা ছাড়িয়ে সিন্থেসাইজারের সুর বেজে উঠে। দিদি প্রতিমার কথা বললেন। দোতারা, সারিন্দা আর ঢোল। শুধু দোতারার সঙ্গেও অনেক গান করেছেন। বোধহয় সাহস ছিল। আত্মবিশ্বাস ছিল। সোজাসুজি আমায় বললেন, 'নইলে বলেন তো শ্যামলবাবু, দোতারা বাজিয়ে শুধু পল রোবসনের 'উই আর অন দ্য সেম বোট...' গাওয়া যায়? এখনকার গানে সঙ্গত দেখলে মনে হয়, 'বিরিয়ানির লগে বাইগুনভর্তা মিশাইতাছে।'

হস্তীকন্যা পার্বতীকে তাঁর থাকার হদিস জানতে চাইলাম। পরে যোগাযোগ করতে চাইলে কোথায় তাঁকে পাব। হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার থাকার জায়গা? ভগবান আমারে এক বিছানায় ঘুমানর লাইগ্যা বানায় নাই।'

University of North Bengal

This is to certify that the Degree of

Doctor of Literature (D. Litt.)

in this University

is conferred Honoris Causa on

Shrimati Pratima Barua

at the Thirty Second Annual Convocation

of the University

held on the Fifth day of April, 2000.

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধির অভিজ্ঞান পত্র

তারপর তাঁর মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলেন আমায়, 'যখন যেই সরকারের ডাক পাই, হাতি তাড়াতে যেতে হয়।' হাতিরা জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে মানুষের ঘর বাড়ি ভেঙ্গে ফেলছে? স্বগতোক্তি করেন পার্বতী। হাতিদের ঘর বাড়ি ভাঙ্গলে হাতিরাই বা কোথায় যায়? রাতের পর রাত ঘুম হয়না। দলবল নিয়ে মশাল জ্বালিয়ে জঙ্গলের পথে এগোতে হয়। কখনও এমন হয়, একাধিক রাত উঁচু গাছের ডালে বসেও কাটাতে হয়।

বিস্মিত হয়ে ভেবেছি, কি করে পারেন তিনি! এমন শরীরে...। পরে মনে হয়েছে, শরীরের গড়ন কি আসল কথা? বিশ্বসেরা কুস্তিগিরেরাও কি সামনাসামনি হাতির সঙ্গে পারবেন? আসলে চাই অনন্ত সাহস। সেই সাহসেরই অধিকারিনী তিনি। সংবাদপত্রে যখন দেখতে পাই দিল্লির এক রাজনীতির কন্যা নিজেকে অধিকতর পশুপ্রেমিক বলে দাবি করে পার্বতীর বিরুদ্ধাচরণ করছেন তখন কৃত্রিম আর অকৃত্রিম ভালোবাসার ফারাক বড় বেশি চোখে পড়ে। সংবাদপত্রের পাতা থেকেই তেমন একটি প্রতিবেদন আমরা পেশ করছি।

হাতি নির্যাতনের দায়ে খোদ 'হস্তীর কন্যা'

১৫ এপ্রিল : 'হস্তীর কন্যা' পার্বতী বড়ুয়া এখন হাতির উপর অত্যাচারের দায়ে অভিযুক্ত। ফলে, এশিয়ার অন্যতম হস্তী প্রশিক্ষককে এখন প্রমাণ করতে হচ্ছে, তিনি সত্যিই হাতিদের কতটা ভালবাসেন। আর তা প্রমাণ করতে হচ্ছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং নাম করা পশুপ্রেমী মানেকা গাঁধীর কাছে। পার্বতীর কথায়, 'যিনি সারা জীবনে ষাট মিনিটও হাতির সঙ্গে কাটাননি।'

অথচ উত্তর অসমের গৌরীপুরের রাজ পরিবারের মেয়ে পার্বতী বড় হয়ে উঠেছেন হাতির সঙ্গে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হস্তীবিদ পিতা 'লালজী' নামে সমধিক খ্যাত প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার সংস্পর্শে পার্বতী হাতিকে ভালবাসতে শিখেছেন, বুঝতে শিখেছেন সেই ছোট্ট বেলা থেকে। পরে তিনি নিজেই হাতি বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এতটাই যে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র করেছে 'জাম্বো জাম্বুরি' নামে। ডিসকভারি চ্যানেল বানিয়েছে 'কুইন অব এলিফ্যান্ট'। পার্বতীর নিজের কথায়, 'ছোট বেলা থেকে বাবার সঙ্গে আমি হাতির মধ্যেই বড় হয়েছি। বাবাই আমার গুরু।' তাঁদের ছিল 'হাতি মহল', অসম আর ডুয়ার্স জুড়ে। সরকারের কাছ থেকে লিজ নেওয়া সেই জঙ্গল থেকে হাতি ধরে তাদের পোষ মানিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজের উপযুক্ত করে তুলতেন তাঁরা। ১৯৭৮ সালে হাতি সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী হিসাবে ঘোষণা হওয়ার আগে পর্যন্ত পাঁচ-ছয় পুরুষ ধরে গৌরীপুরের বড়ুয়া পরিবার হাতি মহলের কারবার চালিয়েছে। পার্বতীর কথায়, 'অসম আর পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে চোদ্দোটা বুনো হাতি আমি নিজেই ধরেছি। পোষ মানিয়েছি শ'চারেক হাতিকে।'

ছত্তিশগড়ে প্রশিক্ষণকালীন একটি হাতির মৃত্যুর জন্য পার্বতী বড়ুয়াকে দায়ী করা

ভারতীয় যাদুঘর ও ভ্রমরা র যৌথ আয়োজনে

স্মরণে মননে প্রতিমা বড়ুয়া (পাণ্ডে)

বাংলার বিশিষ্ট লোকগানের শিল্পীদের
উপস্থিতিতে একটি লোকগানের সন্ধ্যা
২৫ জানুয়ারি ২০০৩, বিকেল পাঁচটা
ভারতীয় যাদুঘর প্রদর্শনী কক্ষ
সবাই আমন্ত্রিত

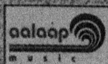
শিল্পীর প্রয়াণে কলকাতায় স্মরণ অনুষ্ঠান

হয়েছে। এই বছরের গোড়ার দিকে ছত্তিশগড়ে জশপুরের জঙ্গলের কয়েকটি হাতি বিভিন্ন গ্রামে চড়াও হয়ে ৩০ জনকে খুন করে। ছত্তিশগড় সরকার সেই ক্ষিপ্ত বুনো হাতিগুলো ধরার জন্য পার্বতী বড়ুয়াকে নিয়ে যান। পার্বতী হাতি ধরতে সাত জন মাহুত আর দু'টি 'কুনকি' হাতি নিয়ে সেখানে যান। 'বসন্ত বাহাদুর' নামে একটি হাতিকে তিনি ধরেন। ছত্তিশগড় বন দফতরের কিছু অফিসার এবং মানেকা গাঁধী-সহ কয়েকজন পশুপ্রেমী বলেছেন 'মেলা শিকার' পদ্ধতিতে হাতি ধরতে গিয়েই হাতিটি জখম হয়। এবং পরে তার মৃত্যু হয়।

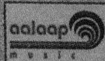
পার্বতী বড়ুয়ার বক্তব্য, তিনি 'মেলা শিকার' পদ্ধতি প্রয়োগই করেননি। অসমে হাতি ধরার একান্ত নিজস্ব যে পদ্ধতি চালু রয়েছে তার নামই 'মেলা শিকার'। পশ্চিমবঙ্গেও এই পদ্ধতিতে অনেক হাতি ধরা হয়েছে। দু'টি কুনকি হাতি এক পাল বুনো হাতিকে একটা ফাঁকা জায়গায় তাড়া করতে থাকে, তখন কুনকি হাতির পিঠে বসে মাহুত দড়ির 'ফান্দা' ছুঁড়ে বুনোহাতি ধরে। এটাই হাতি ধরার মেলা শিকার পদ্ধতি। আর আছে দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতি। একটি গর্তকে পাতা বা গাছের ডাল দিয়ে ঢেকে রেখে হাতিদের খেদিয়ে সেই দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়। হাতিকে খাদে ফেলে ধরা হয় ওই পদ্ধতিতে। হাতি ধরার এই পদ্ধতির সঙ্গে অহমিয়া পদ্ধতির অনেক দিনের বিরোধ। এই ঘটনায় পুরনো বিরোধটাও ফের সামনে এসে পড়েছে।

পার্বতীর বক্তব্য, 'সমস্ত বাজে কথা। মেলা শিকারের প্রশ্নই ওঠেনি। ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়ে হাতিটি ধরা হয়েছিল। সেই গুলিও ছুঁড়েছিল ছত্তিশগড়েরই এক বনকর্মী।' ঘুম পাড়ানি গুলি একটা বা দুটিতেই একটা পূর্ণ বয়স্ক হাতি কাবু হয়। হাতিটিকে ধরতে ছ'টি গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। নিয়ম ভেঙে তিনটি গুলি মারা হয়েছিল তার শুঁড়ে এবং পেটে। তাতে শুঁড়ে ক্ষত হয় এবং সেই ক্ষত বিষিয়ে গিয়ে হাতিটি মারা যায় বলে দাবি করেছেন পার্বতী বড়ুয়া। পার্বতী বেশ বিষণ্ণ ভাবেই বললেন, 'হাতিটি মারা যাওয়ায় আমার খুবই খারাপ লাগছে। কিছু করতে পারলাম না, সেটাও বরদাস্ত করতে পারছি না।' কিন্তু মানেকা গাঁধী যে বলেছেন, পার্বতী আসলে হাতিটি শিকার করেছে, তাতেই তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। গৌরীপুরের হস্তী কন্যার কথায়, 'আমি হাতি শিকার করতে যাব কেন? আর হাতি শিকার করতে আমি ছত্তিশগড়েই বা যাব কেন?' কারণ, হাতির সঙ্গে তাঁর ভালবাসার সম্পর্ক। হাতির সঙ্গে এই সম্পর্ক পার্বতী অর্জন করেছেন পারিবারিক পরম্পরার সূত্রে।

প্রতিবেদন : মিলন দত্ত (গুয়াহাটি) আনন্দবাজার



CASSETTES
AMC 1018
STEREO

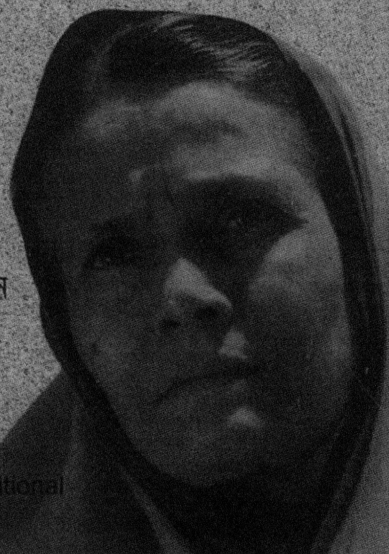


স্মরণে-বরণে

প্রয়াতা লোকসংগীত সম্রাজ্ঞী প্রতিমা বড়ুয়াকে
বিনম্র শ্রদ্ধায়—

স্মরণে-বরণে

উৎপলেন্দু চৌধুরী
সনজিৎ মণ্ডল
স্বপন বসু
গীতা চৌধুরী
শুভেন্দু মাইতি
সুখবিলাস বর্মা
তপন রায়
শিখা ভট্টাচার্য
গৌরসুন্দর গায়েন
কাজল বিশ্বাস
ও
বনশ্রী সেনগুপ্ত



1 Pre-recorded
Audio Cassette
M.R.P.
Rs. 35.00
Inclusive of
All Taxes

প্রচলিত লোক সংগীত
(Bengali Traditional
Folk Songs)

শিল্পীর প্রতি শিল্পীদের শ্রদ্ধাঞ্জলী

হাতির সাথী পার্বতী

অমিত মুখোপাধ্যায়

কখনও তীব্র ক্রোধে উত্তেজিত। কখনও ডুবে যাচ্ছেন গভীর বিষাদে। হাসিমারা আর মাদারিহাটের মাঝামাঝি তোর্সা পারের খামার বাড়িতে বসে কথা বলছেন তিনি। সামনের টেবিলে ছড়ানো একরাশ খবরের কাগজ। তার কিছু কিছু খবরে লাল কালির দাগ। কোনওটা জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসা হাতির গ্রামবাসীদের হাতে আহত হওয়ার খবর, কোনওটা ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর খবর। কোনওটা বা চোরা শিকারির হাতে কিংবা বন বিভাগের 'রেসকিউ সেন্টার'-এ হাতির বেঘোরে মারা পড়ার খবর। এক সময় প্রচুর হাতি ধরেছেন। দরকারে হাতি তাড়িয়েছেন। হাতিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। আজ হাতিই তাঁর একমাত্র 'অবসেশন'। তিনি, প্রখ্যাত হস্তীবিশারদ প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার মেয়ে পার্বতী। এই মুহূর্তে দারুণ চিন্তিত ভারতের জঙ্গলে হাতির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রথম জঙ্গলে যান বাবার সঙ্গে। মাত্র এক মাস বয়েসে। তার পর থেকে পার্বতীর জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই কেটেছে অসম-মেঘালয়-পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলে জঙ্গলে। আট বছর বয়েস থেকেই বাবাকে সাহায্য করতেন হাতি ধরতে। নিজের হাতে প্রথম ফাঁদ মারেন ষোলো বছর বয়েসে। কিন্তু তাতে মোটেও রোমাঞ্চ ছিল না। কারণ বাবার সঙ্গীরা বাকি কাজগুলো করে কেবল ফাঁদ মারতে দিয়েছিল তাঁকে, তাই হাতি ধরার কথা উঠলেই অসমের কচুগাঁও অরণ্যে প্রথম একা একা হাতি ধরার স্মৃতি মনে পড়ে যায়। গৌরীপুরের রাজকন্যা পার্বতী। কীভাবে ধরতেন হাতি, সেই গল্পে বুঁদ হয়ে যান তিনি।

প্রায় আড়াইশ বছর ধরে হাতি ধরার কাজ করে আসছে গৌরীপুরের রাজপরিবার। পার্বতীর বাবা প্রকৃতীশচন্দ্রকে 'লালজী' নামে এক ডাকে চেনে গোটা ভারত। বাবার কাছেই হাতি চিনেছেন পার্বতী। ভোরবেলায় শিকারি কুনকি হাতিকে স্নান করিয়ে তার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়তেন জঙ্গলের পথে। বেরবার সময় প্রথা অনুযায়ী সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হত। কারণ, জঙ্গল থেকে বেঁচে ফিরবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। জঙ্গলে ঢুকে প্রথম কাজ, হাতির পালকে খুঁজে বের করা। তারপর বাছতে হবে কোন হাতিটাকে নিজের শিকারি কুনকি ম্যানেজ করতে পারবে। সেই হাতিটাকে কোনওভাবে দল থেকে 'সাইড' করতে হবে। না হলে গোটা দলটা আক্রমণ করতে পারে। দল থেকে বের করে নিয়ে শিকারি কুনকি দিয়ে তাড়া করিয়ে ছোটাতে হবে হাতিটাকে।

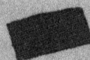
শিল্পী যখন কলেজের ছাত্রী। তাঁর খাতার একটি পাতা।

যেই হাঁপিয়ে যাবে, অমনি ফাঁদ মারতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, গলায় ফাঁস যাতে না লাগে। তবে ফাঁদ মারলেই যে হাতিকে ধরে রাখা যাবে এমন নয়। পার্বতী বললেন, 'মাঝে মধ্যেই দড়ি কেটে দিতে হয়েছে। কারণ গোটা দল আক্রমণ না করলেও, মা হাতি কখনও কখনও 'অ্যাটাক' করেছে।' ধরা পড়া হাতি বিক্রি হত খোলা বাজারে। শোনপুরের মেলায়। হাতি কেনার জন্য বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে লোক এসে তাঁবু গেড়ে বসে থাকত জঙ্গলের বাইরে। পার্বতী জানালেন, 'তখন হাতি ধরার জন্য টেন্ডার ডেকে জঙ্গল লিজ দিত সরকার। প্রতি বছর চারশ-সাড়ে চারশ হাতি ধরা হত। আটাত্তর সালের পর এ ভাবে হাতি ধরা বন্ধ হয়ে গেল। এখন প্রয়োজনে বনবিভাগ ধরে। আমি সাহায্য করি। গুমচির জঙ্গল থেকে ওদের জন্য একটা হাতি ধরে তাকে শিখিয়ে পড়িয়েও

গৌরীপুরের মাটিয়াবাগ প্যালেসে কেবল হাতি ধরা নয়, ছিল অন্য সংস্কৃতির চর্চাও। পার্বতীর জ্যাঠামশাই প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। দিদি প্রতিমা বড়ুয়া বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী। তবু দু'জনের কোনও প্রভাবই পড়েনি পার্বতীর জীবনে। জ্যাঠার একটাই মাত্র ছবি দেখেছেন। তাও 'মুক্তি' না 'দেবদাস' মনে করতে পারলেন না। আর দিদির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও পার্বতীর মন্তব্য, 'সব গোয়ালপাড়িয়া মেয়েরই গলায় গান, পায়ে নাচ। এমন কী ছেলেদেরও। দিদি কিন্তু মাঠেই গান শিখেছে। ব্রেক পেয়েছে, তাই উঠে গেছে। আমার মাহুতও গান গায়। দোতরা বাজায়। ব্রেক পায়নি, তাই কেউ চেনে না।' কেবল মাহুত নয়, পার্বতী নিজেও লোকগান গাইতে পারেন। তবে সংস্কৃতির এইসব ধারা তাঁকে টানে না। অরণ্যে, সবুজের মধ্যেই বেশি স্বস্তি বোধ করেন তিনি। চোখ বুজলেই ভেসে উঠে উত্তরবঙ্গের মেচি নদীর পার থেকে সঙ্কোশ পেরিয়ে অসমের মানস পর্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গলের প্রতিটি নদী-নালা-গাছপালা। আবাল্য জঙ্গলে কাটিয়ে পার্বতী শিখে গেছেন জঙ্গলের ভাষা। তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেন অরণ্যকে। বাতাস শুঁকে বলে দিতে পারেন কোথায় আছে হাতি, কোথায় আছে অন্য বন্যজন্তু। খালি হাতে একা একা হেঁটে বেড়াতে পারেন গভীর অরণ্যে।

পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মধ্যপ্রদেশ— যে রাজ্য থেকেই ডাক আসুক, হাতি বা অন্য বন্য জন্তু নিয়ে পরামর্শ দিতে এক পায়ে খাড়া পার্বতী। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'হাতি সম্পর্কে আমার যা জ্ঞান, তার সবটাই অভিজ্ঞতা নির্ভর। হাতি পেলেই আমি খুঁটিয়ে দেখি। সে বুনো হাতিই হোক বা বনবিভাগের পোষা'। পার্বতী জানালেন বুদ্ধিতে মানুষের পরেই ওরাং ওটাং এবং শিম্পাঞ্জি। তারপরেই হাতি। তাঁর মতে, হাতির স্মৃতিশক্তি প্রখর। হাতিকে গালাগালি দিলে বা তার সামনে চেঁচিয়ে কথা বললে সে কণ্ঠস্বর চিনে রাখে। দশ বছর পরেও যদি আবার সেই গলার আওয়াজ পায়, ঠিক চিনে ফেলবে। অভিজ্ঞতা থেকে হাতির মমত্ব বোধের দুটি কাহিনি শোনালেন পার্বতী।

Pratima Pande
14, Ballygunge Circular Road.
Calcutta-19.
27th June, 1971.
12 P.M.



প্রতিমা পাণ্ডে —
১৪, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৯।
২৭শে, জুন, ১৯৭১।
রাত ১২টা

प्रतिमा पांडे
१४, बालिगंज सार्कुलार रोड
कलकत्ता १९।
२७ जून, १९७१.
रात को १२ बजे।

আপন মনে শিল্পী তিন ভিন্ন ভাষায় নিজের নাম লিখেছিলেন

উত্তরবঙ্গের অরণ্য সংলগ্ন একটি গ্রামে মহুয়া কিংবা হাঁড়িয়ার সন্ধানে একবার হানা দেয় একপাল হাতি। নেশার জিনিস না পেয়ে ভাঙচুর করে ঘরবাড়ি। তার পর দিন রাত থেকেই ঘটতে লাগল এক আশ্চর্য ঘটনা। একটি সর্বস্বান্ত পরিবারের ভাঙাচোরা ঘরের সামনে জমতে লাগল খুঁটি করার উপযোগী জঙ্গলের কাঠ। বনবিভাগ কাঠ চুরির অপরাধে ধরে নিয়ে গেল বাড়ির মালিককে। অবশেষে পাহারা বসিয়ে দেখা গেল একটি হাতি এসে একটি করে 'লগ' রেখে যাচ্ছে প্রতি রাতে। যাতে গৃহস্থ ফের ঘর বানাতে পারে। অন্য কাহিনিটি আরও আশ্চর্যজনক। বাচ্চাকে পিঠে বেঁধে জঙ্গলে গাছ কাটতে গিয়েছিলেন এক মহিলা। গভীর জঙ্গলে হঠাৎ হাতীর সামনে পড়ে যান। দাঁতালের তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়তে থাকেন। ছোটার সময় পিঠ থেকে বাচ্চাটি পড়ে যায়। বাড়ি ফিরে সন্তানের শোকে কান্নায় ভেঙে পড়েন মহিলা। এমন সময় খবর আসে, গ্রামের এক প্রান্তে শুঁড়ে জড়িয়ে আহত বাচ্চাটিকে রেখে গেছে একপাল হাতি।

পার্বতী একেবারেই মানতে চান না, এমন একটি প্রাণী মানুষের ক্ষতি করতে পারে। হাতির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানুষকেই দায়ী করলেন তিনি। বললেন, 'আগে হাতি একটা বিশেষ ঋতুতে জঙ্গল ঘেঁষা গ্রামে ফসল খেতে আসত। মানুষ জানত, হাতি কিছু খাবেই। কিন্তু এখন ব্যাপারটা সারা বছরই ঘটছে। এর কারণ জঙ্গল কমে এসেছে, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। হাতিদের চলাফেরার রাস্তায় গ্রাম গজিয়ে গেছে। আগে হাতি তিস্তার পশ্চিম পারে কম যেত। এপারেই খাবার পেয়ে যেত। এখন সেই সব জায়গায় জনবসতি।' কেবল উত্তরবঙ্গ নয়, দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়খণ্ড সীমান্তেও একই ব্যাপার ঘটছে। ফলে দলমার হাতি বাংলার গ্রামে ঢুকছে। পার্বতীর দাবি, জঙ্গলে মানুষের নাক গলানো বন্ধ করতে হবে। এখন হাতি জঙ্গলেই এত মানুষ দেখছে যে মানুষ সম্পর্কে ভীতিটাই চলে গেছে। আগে মানুষকেও একটা জানোয়ার ভেবে হাতি এড়িয়ে চলত। এখন এগিয়ে আসে। তাঁর বক্তব্য, 'অসমের যে সব জঙ্গলে মানুষ কম ঢোকে, সেখানে এখনও একটু শব্দ পেলেই গভীর জঙ্গলে সরে যায় হাতির পাল।'

আজ হাতি নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার জন্য রাজ্যের বন বিভাগকেও কিছুটা দায়ী করলেন পার্বতী। বললেন, 'উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে হাতির খাবারের অভাব ঘটছে। এখানে টাকার জন্য সেগুন লাগানো হচ্ছে, অথচ এখানকার হাতিরা সেগুন খায় না। হাতির ওপর কিন্তু হরিণ-গণ্ডার-বাইসনের অস্তিত্বও নির্ভর করছে। হাতি একটা উঁচু গাছের বন ডাল ভেঙে খানিকটা খেল। বাকিটা কিন্তু গণ্ডার-বাইসন-হরিণরা খাবে। তাই যে জঙ্গলে হাতি থাকে, তাকে 'স্বাস্থ্যকর' জঙ্গল বলে। সেই হাতিকেই খাবারের অভাবে জঙ্গল ছাড়তে হচ্ছে। দলমার হাতিও খাবার খুঁজতেই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার গ্রামে ঢুকছে বলে দাবি পার্বতীর। এখানেও তারা বন বিভাগের অবহেলার শিকার। পার্বতী বললেন, 'আমি হাতি তাড়াতে গিয়ে দেখেছি হুলা পার্টির অত্যাচার। বর্শা নিয়ে তাড়া করে। হাতি বিশেষজ্ঞরা গেলেও, তাড়ায় গ্রামবাসীরাই। তাদের প্রশিক্ষণ নেই। ফলে উলটো পালটা তাড়া খেয়ে আহত হয় হাতি।' পার্বতীর

রাত - ১২ - ৩
২৭ শে, জুন ৭৩

সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিলো, মহানগরীর ব্যস্ত জীবনে [illegible]
বৃষ্টি হয়েছে, প্রায় পথে জল জমেছে; স্কুলেতো [illegible]
[illegible] ছেড়ে উঠেছে চারদিকে। তবুও প্রতিদিনের [illegible]
[illegible] তের না হলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। তবু হয়তো [illegible]
বেরিয়েছিলো, যারা অফিসের কর্মচারী। শহরের [illegible]
গড়ে তুলেছে তবুও তারা সংগ্রামে, [illegible] উঠে যেতে [illegible]
পেয়েছে, স্কুল কলেজের অনেক ছেলেমেয়েরাই হয়তো [illegible]
এতেই অনুভব পেয়েছে ফাঁকি দেওয়া, তবে যারা গৃহস্থ
ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে, তাদের কষ্ট ঠিকই চলে যাচ্ছে
শিশুরা সারাদিন ধরে ঘরের ভেতরেই খেলার মাঠ বানি-
নিয়েছে। —তবুও নীরব হয়ে থাকেনি ব্যস্ত মহানগরী—
কোলকাতা। —
—খোলা জানালার দিকে চেয়ে, চেয়ে, অনেক
কথা মনে পড়ছিলো, মনে পড়ছিলো এমনই অনেক আকাশ
[illegible] বর্ষার কথা, মনে পড়ছিলো শহরের কথা। এমন
করেই বর্ষা নেমেছে দক্ষিণ ভারতের আকাশে? হায়দ্রাবাদে?
সারাটা দিন ধরে বৃষ্টি বারবার কত কথা, কত প্রশ্ন [illegible]
মনোজোলা করে দিয়ে গেছে। —বাংলা, কলেজের পর আমার
ভাগ্যে জুটেছিলো ভদ্রলোকের, চাকরী এসে প্রথমবার চিঠি—
দিয়ে গেছে, শহরের চিঠি। —
গত বছর থেকে শুরু হয়েছে
এক নতুন প্রতিযোগিতা, চাতকের মত চেয়ে থাকি, কবে আমার
পেয়ালা মিটবে? চিঠি কবে আসবে। —শহরের গত ৭ বছর
ধরে হায়দ্রাবাদের সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অব ইংলিশের
পড়াশুনা শুরু করেছে, তার জানি? শুধুমাত্র [illegible]
[illegible] [illegible] অফিসের [illegible] বসে [illegible]
[illegible] ওর [illegible]। এ যেন আমারই পরীক্ষা, ঐ
দিনগুলিই [illegible] গৌরব। —শহরের যেদিন প্রতিষ্ঠিত
যেন আমারই ভবিষ্যতের [illegible] জীবনে প্রতিভার রাতশেষ
হবে, সেদিন হয়তো [illegible]

শিল্পীর ডায়েরি থেকে

·হাতির সাথী পার্বতী

প্রশ্ন, 'গত কয়েক বছরে দক্ষিণবঙ্গে গোটা ছয়েক হাতি ধরা হয়েছে। তার মধ্যে তিনটে মারা গেল কেন? বনবিভাগ কী করছিল?

পার্বতী বড়ুয়ার মতে, অসমের থেকে পশ্চিমবঙ্গের 'ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট' ভাল। কিন্তু কেরল-কর্ণাটক-তামিলনাড়ুর থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। দক্ষিণের রাজ্যগুলি জঙ্গল নিয়ে অনেক গবেষণা করে। পার্বতী জানালেন, 'জঙ্গল বাঁচানোর সঙ্গে পর্যটনের কোনও বিরোধ নেই। তবে কিছু বিধিনিষেধ থাকা দরকার। সারাদিন গাড়ি ঢুকলে জন্তুরা বিরক্ত হয়। সময় নির্দিষ্ট করা থাকলে ওরা অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এই যে সব 'ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার' হয়েছে, এসব দেখে কিছু শেখা যায় না। সামনাসামনি জঙ্গল দেখলে, বন্যপ্রাণী দেখলে তাদের প্রতি ভালবাসা বাড়বে।' উন্নয়নের নামে অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে বলে মনে করেন জঙ্গলেই জীবন কাটানো এই হাতি বিশেষজ্ঞ। তিনি বললেন, 'সঙ্কোশ ক্যানেল উত্তরবঙ্গের জঙ্গলের পক্ষে একটা বড় বিপদ। অক্টোবরের পর আর এদিককার নদীতে জল থাকে না। তখন জল নিলে আমাদের চাষই বা হবে কী করে, জন্তু জানোয়ারই বা বাঁচবে কী করে। তাছাড়া এই ক্যানেল তৈরি করতে গিয়ে কত জঙ্গল, কত অর্কিড নষ্ট হবে। যারা ক্যানেল কাটার কাজ করবে তারা জন্তু জানোয়ার মারবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?' বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনির জন্য জঙ্গল কাটা হয়েছে। হাসিমারা এয়ার বেস থেকে ওড়া বিমানের আওয়াজে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জলদাপাড়ার বন্য জীবন। এসব রুখতে জন সচেতনতা বাড়ানোর ওপর জোর দিলেন পার্বতী। তাঁর মতে, 'হাতি বা অন্য জন্তুদের বাঁচাতে, শুধু জঙ্গলের কোর এরিয়া থেকে জনবসতি তুলে দিলেই হবে না, সেখানে বন্যপ্রাণীর 'হ্যাবিট্যাট' তৈরি করতে হবে।'

বি বি সি এবং ডিসকভারি চ্যানেলের তথ্যচিত্রে অংশ নিয়েছেন পার্বতী। দূরদর্শন তাঁকে নিয়ে অনুষ্ঠান করেছে। পেয়েছেন রাষ্ট্রসংঙ্ঘের পুরস্কার। সাম্মানিক বন আধিকারিকের সম্মান দিয়েছে অসম সরকার।

বহুবার বিদেশ থেকে ডাক এসেছে। তাঁর মাহুত মনো বর্মন গেছে, তিনি যাননি। তবু সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এশীয় হাতি বিশেষজ্ঞ দলের। লিখেছেন বহু প্রবন্ধ। ছোট্ট খাট্ট চেহারার পার্বতীর এখন সময় কাটে পড়াশোনা করে, গ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সম্প্রতি হাত দিয়েছেন নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লেখায়। ব্যক্তিগত জীবনের কথা তুলতেই প্রৌঢ় পার্বতী বললেন, এ নিয়ে একটা প্রশ্নেরও উত্তর দেব না। কেবল হাতির কথা, জঙ্গলের কথা বলুন। হাতিকে ভগবান বলে মানেন পার্বতী। বললেন, 'এই একমাত্র দেবতা, যাকে চোখের সমানে দেখতে পাই'। তাঁর সহাস্য স্বীকারোক্তি, 'গোটা জীবনটাই হাতির সঙ্গে কাটল। অনেক কিছু শিখেছি, জেনেছি। তবু এখনও অনেক কিছু জানতে বাকি আছে'।

প্ৰশ্ন: তোমৰা গেইলে কি আসিবেন মোৰ মাহুত বন্ধু ৰে ।।

শ্ৰীমতী প্ৰতিমা পাণ্ডে (বৰুৱা)

প্ৰতিবিম্বিত [illegible] সমগ্ৰ [illegible] নিৰ্ভিনকৈ গোৱালপৰীয়া লোকগীতে
বহুকালৰ পৰা গোৱালপৰীয়া জনজীৱন তথা অসমীয়া জনজীৱনৰ
সুখ-দুখ, হাঁহি কান্দোন, আশা নিৰাশাৰ এমন সজীৱ জীয়া ছবি
প্ৰতিফলিত কৰি আহিছে। অন্যান্য, অজ্ঞাত গীতিকাৰৰ কণ্ঠত, নিজস্ব
গাঁৱলীয়া সহজ সৰল গাঁৱলীয়া জীৱনৰ পৰিৱেশত গঢ় লৈ উঠা আৰু
প্ৰচলিত হৈ অহা বাবে বহু ক্ষেত্ৰত হয়তো এই বিলাক গীতে অসমীয়া লোকৰ [illegible] কিন্তু
ফুলেচৰীত আকৰ্ষণীয় মধুৰ সুৰে [illegible] মনত গভীৰ
তৰংগিত এনে আকৰ্ষণীয় লোকৰ এনে বিলাক গীতৰ [illegible] তুলিছে আৱেলে
দূশ্যনৰ, যি জীৱন তিক্ততাৰ দ্বন্দ্ব প্ৰতিফলিত [illegible] আৰু
বিস্ময় মানিব লাগে। গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ [illegible] সাৰ [illegible]
উৎসুক — এই উৎসুক সোণোৱালী সময়ত [illegible] প্ৰবাহ। কেৱল
সুকুতা [illegible] নৱলে সুদক্ষ শিল্পীৰ অভাৱ [illegible] লোকগীত
মাত্ৰ অংশ, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ অভাৱত বহু মূল্যবান গীত জীৱনৰ
লুপ্ত হৈ গৈছে আৰু এতিয়াও হৈ আছে। আমাৰ ব্যক্তিগত [illegible] উদ্ধাৰ
প্ৰচণ্ড পৰিশ্ৰম কৰি এনে বিলাকৰ লুপ্ত হৈ যোৱা কিছু গীত মই উদ্ধাৰ
কৰিছো আৰু আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীৰ হতুৱাই গোৱাইছো — মই অভিজ্ঞতাৰে
আশাৰে [illegible] নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ
তাত আৰু উৎকৰ্ষ সাধন কৰাৰ উপায়ত লুপ্ত অমূল্য সম্পদৰ উদ্ধাৰ
কৰি অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰি তুলিব।

শিল্পীর লেখা অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপি

শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া

ছোটবেলার সেই দিনগুলি

মহালয়ার দিনে কলকাতার বালিগঞ্জ বাড়িতে সবার আনন্দ আর ধরেনা। এমন শুভদিনে যাঁর জন্ম, তাঁকে 'প্রতিমা' ছাড়া আর কী নামেই বা ডাকা যায়! ইংরেজি ১৯৩৪ সালের ১৩ই অক্টোবর। বাংলা ১৩৪১ সালের ২০ শে আশ্বিন। রাজকুমার প্রকৃতীশচন্দ্র ও রানী মালতীলতা বড়ুয়ার সংসারে জন্ম নিলেন প্রতিমা বড়ুয়া। বাবা মায়ের প্রথম সন্তান।

গৌরীপুর রাজপরিবার। রাজপ্রথা অনুযায়ী বড় রাজকুমার প্রমথেশচন্দ্রের রাজ্যভার সামলানোর কথা। তাঁর চোখে তখন ভিন্ন আলো। চলচ্চিত্রে অভিনয় ও চলচ্চিত্র নির্মাণের নেশায় রাতদিন ডুবে আছেন। তিনিই প্রকৃতীশচন্দ্রের হাতে রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। প্রকৃতীশচন্দ্রও কি দেখতেন? তাঁর সংসার ধর্মও তো বলতে গেলে ছিল জঙ্গলেই। হাতির সঙ্গে। নইলে তাঁর জীবনীগ্রন্থের নাম হয় 'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর'! যাক, আমরা সে আলোচনায় আর যাব না।

শৈশবে অর্থ ও সম্পদের কোনো অভাব ছিলনা। বাড়িতে কাজের লোকজন ছিল প্রচুর। আত্মীয় স্বজনও থাকতেন অনেক। লেখাপড়া করার জন্যে অনেকে এসে কলকাতার বড়ুয়া বাড়িতে থেকেছেন। ছোটবেলায় প্রতিমাকে যারা দেখাশোনা করতেন তাদের নাম ছিল ভরতবালা, শরৎবালা, সোনাইবালা। ছিল আরও অনেকেই। এই তিনজনের কথা প্রতিমা বেশি করে বলতেন। সোনাইবালার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, ছোটোবেলায় তাঁকে খুশি করার জন্যে সোনাইবালা প্রতিমার সামনে ঘুরে ঘুরে নাচতেন আর গাইতেন,

> আমার মাইয়ো ভাল, পিন্দে ফারা জাল।
> ঘরে ঘরে বিচ্রি বেরায়
> কোন বুঢ়াটা ভাল।।

অথবা গাইতেন

> কাইত কান্দে কাতিকা কান্দে
> হাতে লইয়া ধনু
> হৈবা কাতি ইয়ো চান্দে
> না হইল তোর বিয়া।।



- শুভেচ্ছা বাণী -

প্ৰতি,

প্ৰতাপচন্দ্ৰ বিদ্যালয়, (গৌৰীপুৰ, অসম)

মই আশা ৰাখোঁ এই বিদ্যালয় আৰু সমৃদ্ধশালী হওঁক। প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ পৰিয়ালটো আন্তৰিক ভাবে জড়িত। এই বিদ্যালয়ৰ বহু গুণী ছাত্ৰ শ্ৰী ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী, ডাঃ অমল বৰুৱা, ড. শিবেন বৰুৱা, আদিয়ে খ্যাতি লাভ কৰিছে। ইয়াৰ বাহিৰেও বহু গুণী ছাত্ৰ - ছাত্ৰী এই বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে শিক্ষা লাভ কৰি বিভিন্ন ঠাইত সুখ্যাতিৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ।

প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে
28/3/2000

(প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে)

প্রতাপচন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী স্মৃতিগ্রন্থে শিল্পীর শুভেচ্ছা বাণী

এ ছিল গোয়ালপাড়িয়া গান। ছোটোবেলা থেকেই এই গান প্রতিমার কানে পৌঁছেছে ও মনে অসম্ভব দোলা জাগিয়েছে।

বাবা প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার কথা আমরা আগে বলেছি। মায়ের কথা তেমন কিছু বলা হয়নি। মা মালতীলতা বড়ুয়া। একসময় গৌরীপুরে পাটের বড় আড়ত ছিল। যে কোম্পানির আড়ত, এদের নানা পণ্য দ্রব্য ও বিলাসসামগ্রীরও ব্যবসা ছিল। কোম্পানির বড়সাহেব ছিলেন স্কটিশ। ধর্মে খ্রিস্টান। নাম তাঁর রবার্ট ফ্রেডরিক মেলহাউজি। গৌরীপুরের এক অজানা ঘরে মালতীলতার জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন মেলহাউজি। মেয়ের নাম রাখা হয়েছিল মোনালিসা। সত্যিই তিনি অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। মোনালিসা বোনা শিখতেন। ছবি আঁকা শিখতেন। প্রকৃতীশচন্দ্র হেয়ার স্কুলে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝে গৌরীপুর যেতেন যখন, ফ্রেডরিক মেলহাউজির সঙ্গে দেখা হত। পরিচয় হয় দুজনের। কলকাতায় দমদম এলাকায় এক বাংলোতে মেলহাউজি থাকতেন। মাঝে মাঝে বাংলোতে যেতেন প্রকৃতীশচন্দ্র। অসুবিধে কোথায়? প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার সঙ্গেও সাহেবের খুব ভাব ছিল। যেতে যেতে অনুরাগ জন্মায়। ১৯১৬ সালে জন্ম মোনালিসার। বাবাকে প্রকৃতীশ তাঁর পছন্দের কথা বলেন। অত্যন্ত রেগে যান প্রভাতচন্দ্র । ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করার হুমকি দেন। হয় সংসারে থাকতে হবে নয়তো সংসার ছেড়ে বেরোতে হবে। মধ্যস্থতা করলেন পিসীমা নীহারবালা বড়ুয়া। মেয়ের কথা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। ১৯৩৩ সালে ধুমধাম করেই বিয়ে হল। রাজপুরোহিতেরা মোনালিসাকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেন। নামকরণ করেন মালতীলতা। শোনা যায়, ফ্রেডরিক মেলহাউজিও মেয়ের এই প্রণয় পছন্দ করেননি। প্রকৃতীশচন্দ্র নাকি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে মালতীলতাকে (মোনালিসা) নিয়ে এসেছিলেন। মেলহাউজি বেঁচে ছিলেন যতদিন, মেয়ের মুখ দেখেননি। তবে নাতনিদের প্যারামবুলেটরে করে রাজবাড়ির বাইরে নিয়ে গেলে মেলহাউজি গৌরীপুরে থাকলে দেখতেন। আদর করতেন। প্রতিমা ও তাঁর পরের বোন দাদু মেলহাউজির কাছে অল্পবিস্তর স্নেহ পেয়েছেন।

ছোটোবেলায় অল্প কিছুদিন প্রতিমা গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে পড়েন। পরীক্ষা দেননি। গৌরীপুরে চলে যান। ওখানকার বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেই স্কুলটি এখন অনেক বড় হয়েছে। গৌরীপুরে এখন স্কুল কলেজের কষ্ট নেই। হাসপাতালও রয়েছে। সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় রয়েছে। ধুবড়ি যাওয়ার যে হাইওয়ে তার একপাশে গৌরীপুর গ্রাম। না, শহর নয়। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অন্যপাশে গদাধর বইছে। মাটিয়াবাগ রাজবাড়ির দোতলা থেকে চারপাশে তাকালে সেই সৌন্দর্য মনে গেঁথে যায়।

প্রতিমা যখন গৌরীপুর স্কুলে পড়েছেন বাড়িতে তাঁর প্রাইভেট টিউটর ছিলেন দুজন। নিখিলচন্দ্র রায় আর ভুবনচন্দ্র রায়। এঁদের কথাও বলেছেন শিল্পী। বলেছেন, 'ছোটোবেলায় বাংলাসাহিত্য আমরা বাংলাভাষাতেই পড়েছি। মাস্টারমশায়েরা আমাদের বাংলাতেই পড়াতেন।' স্কুলে সঙ্গীতের ক্লাশ হত। 'মনোরমাদি' সঙ্গীতের ক্লাশ নিতেন।

সম্বৰ্দ্ধনা-পত্ৰ

অসমীয়া লোক-সংগীতৰ সুদক্ষ গায়িকা শ্ৰীমতী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে, অসম সাহিত্য সভাই সভাৰ চতুস্ত্ৰিংশ সন্মিলনত আপোনাক সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ পাই পৰম আনন্দ লাভ কৰিছে।

এটি ঐতিহ্যপূৰ্ণ, সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ সাংস্কৃতিক পৰিমণ্ডলৰ মাজত জন্ম গ্ৰহণ কৰি, নিজৰ প্ৰতিভাৰে আপুনি অসমীয়া গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতৰ চৰ্চা আৰু সাধনাৰে এই সংগীতক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাত যোগাই আহিছে মূল্যবান অৱদান। এই চৰ্চাই অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ এটা সমৃদ্ধিশালী অংগক কৰি তুলিছে উজ্জ্বল আৰু মহিমাময়। আপোনাৰ এই প্ৰতিভা আৰু অৱদানৰ কথা সুঁৱৰি অসম সাহিত্য সভাই আপোনাক জনাইছে আন্তৰিক সম্বৰ্দ্ধনা। আপুনি আমাৰ সম্বৰ্দ্ধনা গ্ৰহণ কৰক।

আপোনাৰ সুদীৰ্ঘ জীৱন, সুন্দৰ স্বাস্থ্য আৰু প্ৰতিভাৰ উত্তৰোত্তৰ বিকাশ কামনা কৰিলোঁ।

ইতি—

ভৱদীয়

হেমন্তকুমাৰ শৰ্মা,

প্ৰধান সম্পাদক

অসম সাহিত্য সভা

ঠাই : অভয়াপুৰী

ফেব্ৰুৱাৰী ৫, ১৯৭৭ ইং

[illegible]

[illegible]

গৌরীপুরের বাড়িতে 'অসম সাহিত্য সভা' প্রদত্ত সম্বর্ধনা পত্র

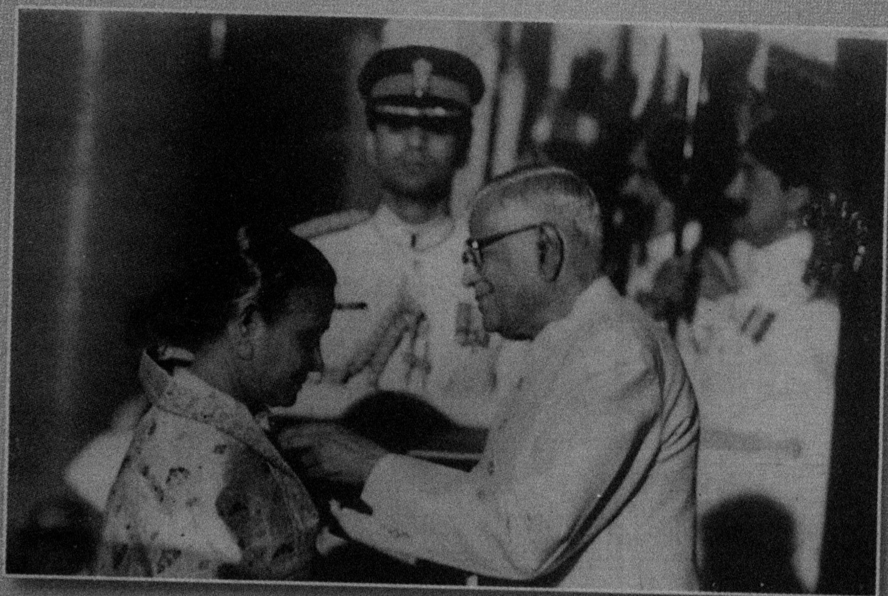
রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি শেখানো হত। সঙ্গীতের সকল পরীক্ষায় প্রতিমা প্রথম হতেন। এসব কথা প্রতিমার কিশোরী বয়সের।

মাটিয়াবাগের রাজবাড়ি যারা একবার দেখেছেন, তারা জীবনে কখনো ভুলতে পারেননি। ভুলতে পারার কথাও নয়। এই বাড়িতে একসময় প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার অতিথি নিবাস ছিল। ১৯০৪ সালে চীনা মিস্ত্রিরা এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন। খরচ পড়েছিল তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। একথা ঠিক, বর্তমানে বাড়িটি এক রকমের বিষণ্নতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে যথাযথ বাঁচিয়ে রাখার কাজ যে নিজেদের ঐতিহ্যরক্ষার জন্যেই জরুরি, দেশের কর্তাব্যক্তিরা আজও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি।

এগার বার বছর বয়সে প্রতিমা স্কুলের পড়া শেষ করেন। তখন তিনি আরও সকলের সঙ্গে মূল রাজবাড়িতে থাকতেন। ওই রাজবাড়িটিও দেখার সুযোগ হয়েছে। প্রমথেশ পুত্র শ্যামলেশ সস্ত্রীক সেখানে থাকেন। সেই বাড়িটির চেহারাতেও জীর্ণতার ছোপ পড়েছে। রাজবাড়িতে তখন প্রমথেশ বড়ুয়া থাকতেন না। কলকাতায় থাকতেন। প্রমথেশচন্দ্রের তিনপুত্র অলকেশ, শ্যামলেশ (এখনও থাকেন) ও অরূপ থাকতেন সেখানে। প্রণবেশ বড়ুয়া ও তাঁর স্ত্রী নমিতা বড়ুয়া থাকতেন। প্রণবেশ-নমিতার দুই কন্যা জয়শ্রী ও শুভশ্রী থাকতেন। আর থাকতেন বাবা প্রকৃতীশচন্দ্র, মা মালতীলতা, প্রতিমা ও তাঁর দুই ছোট বোন পূর্ণিমা ও প্রতিভা। ঘরের যাবতীয় কাজ দেখাশোনা করতেন প্রমথেশচন্দ্রের পত্নী মাধুরীলতা বড়ুয়া। ভাইবোনদের মধ্যে ঝগড়া খুনসুটি হত যেমন, নাচ গান বাজনাও হত। মুখস্থ করে কবিতা বলতে হত। বাংলা গান ও বাংলা কবিতার পাশাপাশি 'তোমরা গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে'র-মত গানও গাওয়া হত। নীহারবালা তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের নৃত্য ও গান রাজবাড়িতে কেমন মর্যাদার আসন পেয়েছিল। আমরা নীহারবাবালার সংক্ষিপ্ত জীবনকথায় বিষয়টি আলোচনা করেছি।

একবার এক সাক্ষাৎকারে প্রতিমা বড়ুয়া বলেছিলেন, 'গোয়ালপাড়িয়া গানগুলোকে আমরা 'দেশীগীত' বলে চিহ্নিত করতাম। ১৯৫৮ সালে আমি আর ভূপেনদা মিলে এদের গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছি (আজির অসম, ৫ নভেম্বর ১৯৮৮)।'

গোয়ালপাড়িয়া গানের বিষয়ে বাবা প্রকৃতীশচন্দ্রেরও গভীর উৎসাহ ছিল। তিনি নিজেইতো লিখে গিয়েছেন, 'দাদার (প্রমথেশ বড়ুয়া) ফিল্ম দেবদাস দেখে যে আনন্দ পেতাম তার হাজার গুণ পেতাম ও পাই গোয়ালপাড়িয়া গানে। ভাবি, কি করে নিরক্ষর গ্রাম্য যুবক-যুবতী এত সুন্দর গানের রচনা করল! আশ্চর্য (!) এত রকমের নূতন আবিষ্কৃত বাদ্যযন্ত্রের চেয়ে পল্লীগীতি, ঘুঘুর ডাক, বাঘের ডাক, হাতীর ডাক আর দোতরার ডাংকে কেন যে ভাল লাগে (!)—ক'ত আপন মনে হয় তা আর কি বলব....(সাক্ষাৎকার : ১৮-১-৮৮)।'



রাষ্ট্রপতি আর. বেঙ্কটরমনের কাছ থেকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি গ্রহণ করছেন

শিল্পী প্রতিমা স্পষ্ট করে অনেকবার বলেছেন, বাবার সান্নিধ্য ও প্রেরণাই তাঁকে শিল্পীজীবন গড়তে উৎসাহিত করেছে। 'বাবার সান্নিধ্যই মোক আজিকার এই জীবন পথর পথিক ক'রিল।'

ছোটোবেলায় প্রতিমাকে বাড়ির সবাই ও বন্ধুরা 'বুচু' বলে ডাকতেন। বাকি দুই বোন পূর্ণিমা ও প্রতিভারও ডাকনাম ছিল। 'নুচু' আর 'দুখু'। এই তিনকন্যার ডাকনাম আশপাশের মানুষজনের কাছে এতো বেশি পরিচিত ছিল যে অনেকে এঁদের ভালো নাম জানতেন না।

বোন পার্বতী বড়ুয়া আজ 'হস্তীকন্যা' হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত। মজার কথা, প্রতিমাকে ছোটোবেলায় অনেকে 'হস্তীকন্যা' সম্বোধন করতেন। গৌরীপুরের রাজপরিবার এমন যেখানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা জন্ম থেকেই হাতি দেখতে দেখতে বড় হয়। যখন খুব ছোটো প্রতিমা, বাড়ির পোষা হাতির জন্য কলাপাতা কাটতেন, হাতির খাবার তৈরি করতেন। মাহুতদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের ছিল খুব ভাব। হাতির পিঠে এঁরা চড়ে যেতে পারতেন অনেক অল্পবয়সেই। হাতি চড়িয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। মাহুতদের গাওয়া গানের সঙ্গে তিনি সুর মেলাতেন। গাইতেন। একটু একটু করে তাঁর ভালোবাসার আঙ্গিনায় গোয়ালপাড়ার লোকগান যোগ হয়ে যায়।

রাজবাড়ির অন্দরমহলে লোকসংস্কৃতির চর্চা ছিল যেমন, নাগরিক সংস্কৃতিও কম চর্চা হতনা। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়মিত চর্চা হত। প্রমথেশচন্দ্র কলকাতায় চলচ্চিত্র জগতে চলে যাওয়ার আগে গৌরীপুরের মাটিতেও একাধিক বাংলা নাটক প্রযোজনা করেছেন ও নিজে অভিনয় করেছেন! প্রতিমার জীবননির্ভর জনৈক তথ্যচিত্রকার বলেছেন, 'দিদির কাছে বসলে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে, এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়।' সত্যিইতো, তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার কথা আমরা অনেকেই তো জানিনা। খুব একান্তে কিংবা ঘরোয়া আসরে গাইতেন। ফলে অজানা থেকে গিয়েছে। আগে আমরা বলেছি, প্রতিমার দাদু রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া সঙ্গীতের বড় সমঝদার ছিলেন। চমৎকার দোতারা বাজাতেন। প্রভাতচন্দ্রের পুত্র প্রণবেশ বড়ুয়া ঢোল বাজাতেন খুব ভাল। রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে কার্তিকপুজো হত। সেই পুজোয় গান করতেন সবাই মিলে,

'কাইত কান্দে কাতিকা কান্দে
হাতে লইয়া ধনু।
হৈরা কাতি ইয়ো চান্দে,
না হইল তোর বিয়া।।'

'দূর হতে আইলোরে বাদুর
কলা খাবার আশে।
গাছের কলা গাছে রইল,
বাদুর গেইল মোর দেশে রে।।'

রাজবংশী মানুষের বাঁশপুজো, সোনারায় পুজো, শীতলাপুজো, সুবচনী ব্রতকথা—



শিল্পীর ঠিকানা এই ছোট্ট দুই ঘর। মাটিয়াবাগের বাড়ির পিছনদিকে এই ঘর রয়েছে

এ রাজবাড়ি বা রাজবাড়ির বাইরে যেখানেই হোক না কেন, বাড়ির সবাই মিলে আনন্দ করতেন। অংশগ্রহণ করতেন। নীহারবালা বড়ুয়া এবিষয়ে প্রচুর চিন্তাধর্মী রচনা লিখেছেন, একাধিকবার সেকথা আমরা বলেছি। তখন প্রতিমা ছোটো। পিসীমা নীহারবালা বললেন, জালালউদ্দীন শেখ আসবে। রাত্তিরে গান হবে, নাচ হবে। পিসীমা নিজে থাকবেন। প্রতিমাদের তিন বোনকেও নাচতে গাইতে হবে। বললেন প্রতিমা, 'আমি নাচিনি যদিও। সবার সাথে গেয়েছি।' কি গান গেয়েছেন?

ঘুর ঘুর ঘুর, ঘুর ঘুর ঘুর
উরানি ক'ইতর উড়িয়া পরে চালে
মদিনা সহরে বসাইছে বাঁলিয়া
বাটা ভরা পান।
পানের উপর লেখা আছে
জহিরা সুন্দরীর নামো রে।।
খাইয়া যান মোর সোনার বন্ধু
জহিরা সুন্দরীর পান।
খাইয়া যান মোর মাহুতবন্ধু
জহিরা সুন্দরীর পান
পানো না খিলিয়া মনো না ভুলিয়া
ওরে সোনার চান রে।।
খাইয়া যান যে দয়ার দাদা
জহিরা সুন্দরীর পান,
খাইয়া যান যে দয়ার বন্ধু
জহিরা সুন্দরীর পান
ওরে যেই না রঙের জহিরা সুন্দরী
সেইনা রঙের পানো রে।।

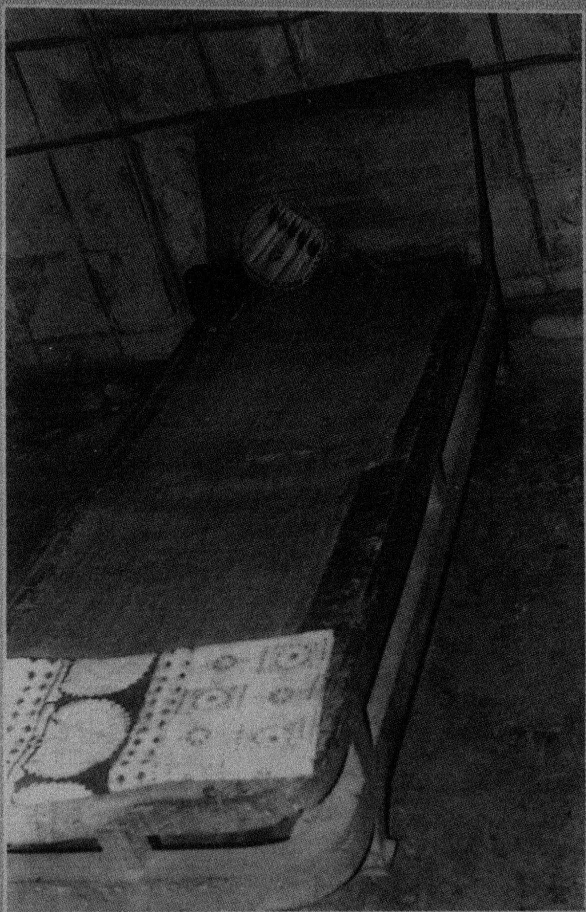
প্রতিমা বলতেন, এইটেই তাঁর জীবনের গাওয়া প্রথম গান যা তিনি অনেকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়েছেন। তারপর খুব কম সময়ে কয়েকটা 'বিয়ার গান' শিখেছেন। একটা গানের কথা মনে পড়ে তাঁর।

আরি ও ভাই,
মইসের দাফাদার রে
ডালা সাজাও ডালা সাজাও,
চল মইসের বাথান ভাই রে।।

মইষাল জীবনের সুখ দুঃখের গান পরে শিল্পী অনেক গেয়েছেন। 'ধিকো ধিকো



গানের প্রতিমা, প্রতিমার গান



শিল্পীর শয্যার আয়োজন! বাড়িতে প্রতিমা এই শয্যাতেই ঘুমোতেন



যে প্রতিমার ভাসান নাই.......

ধিকো রে' বা 'উজান খাইলো মেঘ মেঘালী' অনেকেই শুনেছেন। মন প্রাণ ঢেলে পুরো দরদ দিয়ে গেয়েছেন তিনি।

লোকগানের কোনো জাতপাতের বালাই থাকে না। শ্রমের গান, দুঃখের গান, প্রেম ভালোবাসার গান—তার আবার জাতপাত কি?

স্কুলের পড়া শেষ করে আবার কলকাতায় এলেন প্রতিমা। ১৯৪৮ সাল। তখন তিনি চৌদ্দবছরের বালিকা। কলকাতা তাঁর অচেনা নয়। দূর গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা কলকাতায় এলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। প্রতিমার বেলায় সেরকম কোনো কথাই ওঠেনা। গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে ভর্তি হলেন। কলকাতার নামকরা মেয়েদের স্কুল। স্কুলের ছাত্রীনিবাস ছিল। জনা ষাটেক মেয়ে থাকত। অনেক বান্ধবী হয়ে যায় তাঁর। তখন স্কুলের বড় দিদিমণি ছিলেন শ্রীমতি বাণী ঘোষ। ছাত্রীনিবাসের দেখাশুনোর ভার ছিল মিস রাসেল নামের একজনের হাতে। দুজনই খুব ভাল। মেয়েরা দুজনকে খুব ভালোবাসতেন। মান্য করতেন। প্রতিমা বলেছেন একজায়গায়, 'গুরু শিষ্যের সম্পর্ক তখন আর এখনকার ভেতর আকাশপাতাল ফারাক। তখন শ্রদ্ধা ছিল, স্নেহ ছিল। দাদা ভাই বোনের সম্পর্ক ছিল। এখন শ্রদ্ধা নাই, স্নেহও নাই।'

গৌরীপুরে ছোটোবেলার বন্ধু বা বান্ধবীদের ছেড়ে এসে তাঁর শুরুতে খুব ভাল লাগত না। ধীরে ধীরে ছাত্রীনিবাসের বন্ধুদের সঙ্গে ভাব হয়ে যায়। প্রতিমা ও তাঁর পরের বোন পূর্ণিমা দুজনেই গোখেল মেমোরিয়ালে পড়েছেন। প্রতিভা ভিক্টোরিয়া স্কুলে পড়েছেন।

সপ্তাহ শেষের ছুটিতে প্রতিমা কলকাতার বাড়িতে যেতেন। সেই বাড়ি যার মধ্যমণি ছিলেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। তখন প্রমথেশ খ্যাতির শীর্ষে। শনিবারে ওই বাড়িতেও গানের আসর বসত। শুরুতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটি গাওয়া হত। তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর অন্যান্য গান হত।

গৌরীপুরের স্কুলে গানের প্রতিযোগিতায় প্রতিমার পুরস্কার থাকত বাঁধা। কে তাঁকে হারাবে? সেখানে তিনি গাইতেন রবীন্দ্রনাথের নীচের দুখানা গান।

১

তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার লাগে না মনে।
আমার যায় বেলা, বয়ে যায় বেলা কেমন বিনা কারণে॥
এই পাগল হাওয়া কী গান-গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি সুনীল গগনে॥
সে গান আমার লাগল যে গো লাগল মনে,
আম কিসের মধু খুঁজে বেড়াই ভ্রমরগুঞ্জনে।
ওই আকাশ-ছাওয়া কাহার চাওয়া

এমন ক'রে লাগে আজি আমার নয়নে ।।

২

আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শূন্য হাতে—

আমি তাইতে কি ভয় মানি।

জানি জানি, বন্ধু, জানি—

তোমার আছে তো হাতখানি।

চাওয়া-পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনোমতে,

এখন সময় হল তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি ।।

আঁধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ-অন্ধ-করা,

তোমার পরশ থাকুক আমার-হৃদয়-ভরা।

জীবনদোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভুলে,

এখন জীবন মরণ দু দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি ।।

শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়। গোয়ালপাড়িয়া লোকগানেরও প্রতিযোগিতা হত। সেখানেও প্রতিমা প্রথম। দুটো গান গাইতেন। 'হস্তীর কন্যা হস্তীর কন্যা'। এই পুরো গানটি আমরা পরে দিয়েছি। ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে। এই গানটি আমরা নীচে দিলাম। ভাওয়াইয়া গানের সম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমেদ এই গানটি গেয়ে সাবা দেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে
ফাঁদ বসাইছে ফাঁদীরে ভাই পুটি মাছ দিয়া
ওরে মাছের লোভে বোকা বগায় পড়ে উড়াল দিয়া বে।
ফাঁদে পড়িয়ারে বগা করে টানা টুনা
ওরে আহারে কুন কুড়ার সূতা
হলু লোহার গুণারে।
ফান্দে পড়িয়া রে বগা
করে হায় হায়
ওরে আহারে দারুণ বিধি
সাথী ছাড়্যা যায় রে।
উড়িয়া যায় রে চাকোয়ার পঙ্খী
বগীক্ বলে ঠারে,
ওরে তোমার বগা বন্দী হইছে
ধল্লা নদীর পারে রে।

এই কথা শুনিয়া বগী
দুই পাখা মেলিল
ওরে ধল্লা নদীর পাড়ে যাইয়া
দরশন দিল রে।
বগাক্ দেখিয়া বগী কান্দে রে।
বগীক্ দেখিয়া বগা কান্দেরে।

যে বাড়ির মানুষ প্রমথেশ বড়ুয়া, সেই বাড়িতে চলচ্চিত্র নিয়ে নানা আলোচনা অবশ্যই হত। প্রতিমা ছোটো। যোগ দেওয়ার সাহস পেতেন না। রাজকাপুরের অভিনয় তাঁর মন টানত। মুকেশের গানের তিনি খুব ভক্ত দিলেন। গ্রেগরি পেকের কথাতো আগেই বলেছি। জি. এস. যেদিন গৌরীপুরে ট্রাঙ্ক খুললেন, গ্রেগরি পেকের অভিনীত ছবির বিষয়ে নানা লেখার কাটিং পাওয়া গিয়েছিল।

১৯৪৯ সালের একটি ঘটনাই হয়তো তাঁর জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে দেয়। তখন নিউ এম্পায়ারে নানা সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন হত। শিল্পীর ছোটো পিসীমা নীলিমাবালা বড়ুয়া সেখানে একদিন সন্ধেবেলায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। প্রতিমা সেখানে গোয়ালপাড়িয়া গান পরিবেশন করেন। শ্রোতারা মনপ্রাণ ঢেলে তাঁর প্রশংসা করেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান। ভুলবেন কি করে তিনি? জীবনে বারবার নানাজায়গায় বলেছেন। ওই একই অনুষ্ঠানে গান করেছিলেন মধুরকণ্ঠী অকালপ্রয়াতা শিল্পী গীতা দত্ত। গীতা দত্ত ছিলেন প্রতিমার চেয়ে তিন বছরের বড়। প্রমথেশ বড়ুয়া সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হতে পারে হয়তো, নিজের কাজের ব্যস্ততার জন্যে ভাইঝির গান আগে ভালোভাবে শুনতে পাননি। ওইদিন প্রতিমার গান শুনে বলেছিলেন, 'মেয়েটার গলা ভাল। লালজী তার কথা ভাবছেতো?'

১৯৫০ সাল। অসমের গভর্নর ছিলেন শ্রী প্রকাশ। বিশেষ কাজে তিনি গৌরীপুর এসেছিলেন। প্রতিমা তখন গৌরীপুরে ছিলেন। তাঁর গান শুনেছিলেন গভর্নর। খুশি হয়ে প্রতিমাকে বলেছিলেন, 'আমার খুব ভাল লেগেছে। চর্চা বন্ধ করোনা; তুমি খুব নাম করবে।'

কলকাতায় পড়াশুনো। গৌরীপুরে বাড়ি। সেখানকার জলজঙ্গল ও গানের ভুবনে মন পড়ে থাকে। গৌরীপুরে তখন জমিদারি দেখাশুনো করছেন বাবা প্রকৃতীশ। হাতির মহলদারি করছেন। ইচ্ছে হত প্রতিমার, বাবার হাতি ধরা ক্যাম্পে যাবেন। তাবুতে থেকে হাতি ধরা, হাতির পোষ মানানো এসব দেখবেন। একবার দিন পনেরো একটানা ক্যাম্পে থেকেও ছিলেন তিনি। পুরো পরিবার ছিল। আর প্রতিমা একা অনেকগুলো ক্যাম্পেই বাবার সাথে যান। অরণ্যের সৌন্দর্য তাঁর মন কেড়ে নিত। নিজেকে আরও বেশি উদার মনে হত। প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতেই ইচ্ছে করত।

১৯৫৩ সালে গৌরীপুরে থেকে প্রতিমা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেন। তাঁর পড়াশুনো

দেখতেন দুজন। ত্রিনেশ দাশগুপ্ত। অলকেশ বড়ুয়া। ত্রিনেশ দাশগুপ্ত প্রতাপচন্দ্র বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অলকেশ বড়ুয়া প্রমথেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান। পড়াশুনোয় ভাল ছিলেন। পরে প্রমথেশ বড়ুয়া কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হন। ভালোভাবে পাশ করেন প্রতিমা। কলেজে ভর্তি হতে আবার কলকাতায় যান। সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজে ভর্তি হন। দুবছর পড়েন। ফাইনাল পরীক্ষায় বসেননি। লেখাপড়ার জগত থেকে প্রকৃতি আর সুরের জগতে পৌঁছে যান শিল্পী। আর কখনো তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি।

গান শুধু গান

১৯৫৫ সাল। প্রতিমা তখন একুশে পা দিয়েছেন। সেসময় এখনকার সুপরিচিত গায়ক ভূপেন হাজারিকা গৌরীপুরে এলেন। অলকেশ বড়ুয়ার পরিচিত ছিলেন ভূপেন। লালজীর অতিথি হয়ে রইলেন ক'দিন। ওই সময় গান বাজনার আসর হত। ড. ধীরেন দাস তাঁর বইতে লিখেছেন, এমন একটি ঘটনার কথা এখানে পেশ করছি। আসর বসেছে। সবার নজর ভূপেন হাজারিকার দিকে। ভূপেন পরপর তিনটি গান গাইলেন।

১

পরহি পুওরাতে টুলুঙা নাওতে
রংমন মাছলৈ গ'ল

২

এটি কলির দুটি পাত
রতনপুর বাগিছাত

৩

সাগর সঙ্গমত, কতনা সাতুবিলোঁ
তথাপিতো হোরা নাই ক্লান্ত।
তথাপি মনত মোর
প্রশান্ত সাগরর
উর্মিমালা অশান্ত।

ওই আসরে মনোজকুমার বড়ুয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রতিমা একজন শ্রোতা। ভূপেন হাজারিকার গান শুনে তিনি মুগ্ধ। লালজীর অনুরোধে, সবার অনুরোধে প্রতিমাও গাইলেন। মন প্রাণ ঢেলে গাইলেন। শিল্পীর নিজের স্মৃতিচিত্রণ থেকে উল্লেখ করছি।

'ভবেন আর বয়ানে ই দুইটা দোতোরা বান্দি নিয়া গুরু ডাং মারি আরম্ভ করিল— নলো ডলো নলো ডং।' আর কি ডাং শুনিয়া মোরো গাও নাচি উঠিল; মনও নাচিল আরু গানের সুরও নাচি উঠিল। আরম্ভ কইনু—

এক. হস্তী কন্যা হস্তী কন্যা
বামোনের নারী
মাতায় নিয়া তাম কলসীও
সখি হাতে সোনার ঝারি সখি হে

ও মোর হায় হস্তীর কন্যারে
খানিকো দয়া নাই মাহুতক লাগিয়ারে।।

দুই. আরি ও
ওহো মোর ভাবেরে দেওরা
থুইয়া আইসেক মোক
বাপ ভাইয়ের দেশে।

তিন. সোনার বরণ পাখিরে তোর
হেঙ্গুল বরণ আখি
দেশের পাখি দেশে গেলু
মোকে দিয়া ফাঁকিরে

পরপর তিনটি গান গাওয়ার পর জানতে ইচ্ছে করল, কি বলেন ভূপেন হাজারিকা। মন দিয়ে তিনি গান শুনেছেন তো? আসরে উপস্থিত সবাই, বিশেষ করে আমি খুবই উদগ্রীব। বেশ খানিকক্ষণ পর তিনি মাথা তুলে বললেন, 'বাঙালি নয়, অহমিয়াও নয়। দুই ভাষায় মাঝখানে গানের কথা ও সুর। শুনে খুব মিষ্টি লেগেছে। গান শুনে ভাল লাগল খুব। মেয়েটির সুরে একটা বাড়তি গুণ আছে। আর কোথাও শুনিনি। গান নিয়মিত গাইলে একসময় বড় শিল্পী হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'ড. হাজারিকার কাছে এই প্রশংসা শুনে আমার মন ভরে যায়। ওইদিন ঠিক করি, গানের জগতেই দিন কাটাব। তবে যে গান আমি গাই, সেই বিষয়ে বাড়িতে দুরকমের মত রয়েছে। জ্যঠিমা মাধুরিলতা এই গান খুব পছন্দ করেন না। ওঁর মতে এগুলো গাঁয়ের গান। কথ্য ভাষা। অমার্জিত। ভাবও নাকি অশ্লীল। ভদ্র সমাজে গাওয়ার মত নয়। শোনার মত নয়। মায়েরও একরকমের সংস্কার ছিল। দোতারার সঙ্গে গান করে বেড়ালে বিয়ে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমার গান গেয়ে বেড়ানোটা মায়েরও পছন্দ হত না। আত্মীয়দের ভেতরেও অনেকের আপত্তি ছিল। কিন্তু বাবার মত ছিল আলাদা।'

বাবার মতে, ' সবাইতো ভদ্দরলোকের গান করে, তার মধ্যে একজন না হয় অভদ্দরলোকদের গান করল। দোতোরা বাজিয়ে গান করলে বিয়ে যদি না হয়, নাই বা হোক একজনের। কি আর হবে? সবারই কি বিয়ে হতে হবে?'

প্রতিমার দাদু প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া যে এইসব লোকগানের ভক্ত ছিলেন আমরা নীহারবালার স্মৃতিকথা থেকে জানতে পেরেছি। প্রভাতচন্দ্র নিজেও খুব ভাল দোতারা বাজাতে পারতেন। লোকগানের একজন বড়মাপের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। করিতুল্লার কথা আমরা আগে শুনেছি। যখন বয়স বেড়েছে করিতুল্লার, গান করতে পারছেন না

ঠিকমত, প্রভাতচন্দ্র তাঁর খাওয়া পরার অসুবিধে যাতে না হয়, জমিজমা দিয়েছিলেন। বলতেই হয় আমাদের, প্রতিমার জ্যাঠামশাই প্রমথেশচন্দ্রও গোয়ালপাড়িয়া লোকগানের ভক্ত ছিলেন। 'মুক্তি' চলচ্চিত্রটি যারা দেখেছেন তারা জানেন, করিতুল্লাকে দিয়ে তিনি ওই ছবিতে দেশীগান করিয়েছেন। করিতুল্লার গাওয়া গান 'নদী না যাইয়োরে বৈদ' তখন মানুষ মুগ্ধ হয়ে শুনেছে। ছবির মাধ্যমে প্রচুর শ্রোতার কাছে পৌঁছেছে। এই গানটি পরে প্রতিমাও গেয়েছেন, বইয়ে গানটি আমরা দিয়েছি। ঠাকুর্দা, জ্যাঠা আর বাবা যে গান পছন্দ করতেন, জ্যঠিমা ও আরও কেউ কেউ না চাইলেও প্রতিমার পক্ষে চর্চা করতে কোনো অসুবিধে হয়নি।

১৯৫৬ সাল। ভূপেন হাজারিকা আবার গৌরীপুরে এসেছেন। চলচ্চিত্র করছেন তিনি। এ্যারাবাটোর সুর। ঐরাবতের সুর। এই অহমিয়া ছবিতে তিনি দেশীগান দিতে চাইছেন। প্রতিমার কথাই মনে পড়ে তাঁর। হতে পারে এই গানের কথা ও সুর গোয়ালপাড়ার মাটি থেকে ওঠে এসেছে। আবেদন তার সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে যাবেই। লালজীর কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন হাজারিকা। প্রতিমা তখন বাইশে পা দিয়েছেন। বাবা সানন্দে রাজি হলেন। প্রতিমা বড়ুয়া নেপথ্য শিল্পী হিসেবে ওই ছবিতে গান করেন। তাঁর কণ্ঠমাধুর্য ও গানের মাধুর্য একসাথে দর্শক হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছিল। কলকাতার স্টুডিওতে গিয়ে গান রেকর্ডিং করতে হয়েছে। দোতারা বাজিয়েছিলেন নীহারবালার পুত্র মৃণাল বড়ুয়া। গানের ধূয়ায় অজয় বড়ুয়া, অরূপ বড়ুয়া এবং তাঁর দুই বোন পূর্ণিমা ও প্রতিভা অংশ নিয়েছিলেন। গান দুটি কি ছিল?

১

ডাং নোবি ডাং
দড়ি দিয়া বান্ধ,
মার এক ডাং
গুণ গুণ সরকার
গান শুনি নাবে।।

২

ও বিরিক্ক শিমিলারে
গগনে মেলে ডাল।
নারী হয়া রসের যৈবন
রাইকপো কত কালরে।।

প্রতিমার নাম ছড়িয়ে পড়ল সবদিকে। প্রশংসার বন্যা বইতে থাকল। বিয়ের বয়স হয়েছে। ঘর সংসারের প্রস্তাবও আসতে থাকল অনেক। মুচকি হাসছেন প্রতিমা। দোতারা বাজিয়ে গান করলে তবে যে বলেছিল বিয়ে হয় না? হয়না মানে কি? একটু বেশি বেশিই তো বিয়ের প্রস্তাব আসছে। প্রতিমা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছেন। ঘরকন্যা

করতে এক্ষুনি মন চাইছে না। যদি করতেই হয়, সে পরে দেখা যাবে।

পরের বছর ১৯৫৭ সালে ভূপেন হাজারিকা আবার গৌরীপুরে এসেছেন। আবার ছবি করবেন। মাটির গান যোগ করবেন। নকল গানে তাঁর আগ্রহ বরাবরই কম ছিল। বন্ধু ছিলেন অলকেশ বড়ুয়া। তাঁর লেখা একটি গল্প পাওয়া গেল। 'রং সবুজের গান'। গল্পটাকে একটু আধটু বদলে নিলেন হাজারিকা। সেই গল্পই সবার পরিচিত 'মানুষ বন্ধু রে' ছবির চেহারা নিল। 'যুগান্তর' পত্রিকা সেই সময় লিখেছিল, 'পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে ভূপেন হাজারিকা *রঙ সবুজের গান* নামে একটা ছবি করার সময় প্রতিমা বড়ুয়ার কাছে প্রথম শোনেন মাহুত বন্ধু রে গানটি। গানটি শুনে শ্রীহাজারিকা শুধু অভিভূত হননি, ঠিক করেন এটাই হবে ছবির নাম, টাইটেল মিউজিক। গানটি প্রতিমা বড়ুয়ার সঙ্গে নিজেও গাইলেন।'

প্রতিমার উপর অনেক কাজের ভার পড়ল। ভার বহন করতে জীবনে কখনো পিছুপা হননি। হাজারিকা ছবিটি প্রযোজনা করেছেন। পরিচালনায় সহযোগী ছিলেন অজয় কর। অজয় কর পরে বাংলা ছবির সার্থক পরিচালক হয়েছিলেন। পুরো ছবির টিম গৌরীপুরে এল। লালজী তখন গৌরীপুরে নেই। কচুগাঁওয়ে ক্যাম্প করে হাতি ধরছিলেন। সবাই মিলে কচুগাঁও চলে গেলেন। সুবিধে দুটো। লালজীর দেখা পাওয়া যাবে। ছবির শুটিং করবার লোকেশনও দেখে নেওয়া যাবে। লালজীর ক্যাম্প তখন গমগম করছিল। বরফান্দিরা রয়েছেন। মাহুতেরা রয়েছেন। বনে মাঝে মাঝে ভাওয়াইয়া আর চটকা গাওয়া হচ্ছে। ভেঙ্গে যাচ্ছে তার নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে দূর থেকে ফাঁদে পড়ে যাওয়া হাতির বিকট আওয়াজও ভেসে আসছিল। কলকাতা থেকে গিয়েছেন সবাই। এমন পরিবেশ আগে কখনও দেখেননি কেউ। সবাই মুগ্ধ। এককথায় বলা যায়, শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়ার জীবনকথাই যেন 'মাহুত বন্ধুরে' ছবিতে উঠে এসেছিল। সমবেত গানে প্রতিমা যেমন কণ্ঠ মিলিয়েছেন, একা তিনি অনেকগুলো গান গেয়েছেন।

১. আজি আউলাইলেন মোর বান্দা ময়াল রে
২. ঘুর ঘুর ঘুর ঘুর ঘুর ঘুর
৩. ও দেবদাসী
৪. আল্লা আল্লা বলোরে
৫. হস্তী কন্যা হস্তী কন্যা
৬. ও তোমরা গেইলে কি আসিবেন

মাহুত বন্ধুর গান অনেক। নানা ধরনের কথা থাকে সেই গানে। অদল বদলও হয় গানের লাইন। মাহুত বন্ধুর গান আমরা এই বইয়ের ভেতর রেখেছি। তবে ছবিতে যে গানটি গাওয়া হয়েছিল, যা আজও বহু মানুষকে মাতিয়ে রেখেছে, সেই গান আমরা এখানে পেশ করতে চাইছি।

ও তোমরা গেইলে কি আসিবেন
মোর মাহুত বন্ধু রে?
খাটা খুটো মাহুত রে তোর
গালে চাপ দাড়ি।
সত্য করিয়া কন রে মাহুত
কোন দেশেতে বাড়ি রে?
হস্তী নরাং হস্তী চরাং
হস্তীর গলায় দড়ি।
সত্য করিয়া ক'ইলং কন্যারে,
ও কন্যা গৌরীপুরে বাড়িরে।।
হস্তী নরান হস্তী চরান
হস্তীর পায়ে বেড়ি
সত্য করিয়া কনরে মাহুত
ঘরে কয়জন নারী রে?
হস্তী নরাং হস্তী চরাং,
হস্তীর পায়ে বেড়ি
সত্য করিয়া ক'ইলং কন্যা,
বিয়াও নাই করি রে।।
হস্তী নরায় হস্তী চরায়
কাকোরা বাঁশের আড়া
কি সাপে দংশিলেক ও
মোর মাহুত বন্ধু হইল খোড়া
রোজায় ঝারে গুণিকে ঝারে
ঢেকিয়া আগাল দিয়া।
মুই নারীটা ঝারং বিষ ঐ
কেশের আগাল দিয়া রে।।

এই গানে সঙ্গত করেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী হিমাংশু বিশ্বাস। তিনি বাঁশি বাজিয়েছিলেন। ভবেন দোতারা বাজিয়েছিলেন। ঢোল ছিল না। একজন শিল্পী তার বদলে কলসি বাজায়।

লোকগান গাইবার বেলায় পদে পদে বাধা থাকে। অশ্লীলতার ধূয়ো তোলেন অনেকে। কিছু গান যে তেমন নয় বলছি না। তবে শুধুমাত্র নাগরিক সংস্কৃতির বিচারে ওইসব গান যাচাই করতে গেলে এক চক্ষু হরিণের মত ঘটনা দাঁড়িয়ে যেতে পারে। ড. ধীরেন দাসের বইয়ে নীহারবালা বড়ুয়ার জীবনের একটা কাহিনি রয়েছে। নীহারবালা

গাঁয়ের মেয়েদের ডেকে এনে কাতিপূজা, হুদুম পূজা ও আরও সকল আচার অনুষ্ঠানের গান শুনে লিখে নিতেন। তারপর নিজেই কিছু কিছু গান বাদ দিয়ে দিতেন। ড. দাস লিখেছিলেন, 'অশ্লীলগুলা বাদ দিয়া ভালগুলা রাখিল।'

একথা ঠিক। পারিবারিক বাধা ছিল না বলে প্রতিমার এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়। তাছাড়া শুরুতেই ছবিতে গাইতে পেরেছিলেন বলে কম সময়ে অনেক মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন। তবে ভদ্দর-অভদ্দর সংস্কৃতির বিতর্কের মধ্য দিয়েই তো তাঁকে এগিয়ে যেতে হয়েছে।

যখন প্রতিমা চলচ্চিত্রের গায়িকা তখনও তিনি আকাশবাণীর শিল্পী হননি। আকাশবাণী নিজেরা কণ্ঠ পরীক্ষা করে শিল্পীদের নির্বাচন করে। এই কথা জানতে চাইলে প্রতিমা বলেছিলেন, 'বাপ্‌রে বাপ, ওই নিয়ে প্রথম যা ঝামেলা বেধেছিল বলবার নয়। ১৯৬০ সাল। বাবার কথামত গুয়াহাটি গেলাম। কণ্ঠ পরীক্ষা দিতে গিয়ে নাজেহাল হলাম। সুরের আলাদা পরীক্ষা। সেখানে সহজে পাশ করে গেলাম। কিছুকাল পরের কথা, আকাশবাণী থেকে বলল, গোয়ালপাড়িয়া গানগুলো তর্জমা করে গাইতে হবে। আমার রাগ হল—এ আবার কোন দেশী কথা? গোয়ালপাড়িয়া গানের অহমিয়া অনুবাদ করে গাইব? রাজি হলাম না। পাশ করবনা তো কি হয়েছে? গানের বিকৃতি ঘটাব নাকি? গানের সুরের কোনো দাম নাই? ভাষার কোনো দাম নাই?'

আমাদের আব্বাসউদ্দীন আহমেদের ঘটনার কথা মনে পড়ে। ভাটিয়ালি যেমন পুব বাংলার লোকগান, ভাওয়াইয়া তেমনি উত্তরবাংলার। রেকর্ড কোম্পানিকে বললেন আব্বাস, ভাওয়াইয়া গান রেকর্ড করতে চান তিনি। কোম্পানির আপত্তি নেই। আব্বাসউদ্দীনের রেকর্ডের বিক্রি মন্দ ছিল না। কোম্পানি লাভের মুখ দেখছিল। তবু কোম্পানি বাদ সেধেছিল। কুচবিহারের ভাষায় গাওয়া চলবেনা। দুঃখ পেয়েছিলেন। মেনে নিয়েছেন। অপেক্ষায় রয়েছেন। একদিন তিনি প্রমাণ দেবেনই। দিলেনও প্রমাণ। নিজের ভাষায় পরপর ভাওয়াইয়া গাইলেন। সেইসব রেকর্ড হাজার হাজার বিক্রি হয়েছিল।

একটা কথা বুঝতে আমাদের মাঝে মাঝে খটকা লাগে। মাটি থেকে সরাসরি লোকগান তুলে আনেন যাঁরা, তাঁরা কেন নাগরিক মানুষের বোধগম্যতার জন্যে গানের কথা বদল করবেন? কেন ভাষা বদল করবেন? আমরা যারা নগরজীবনে অভ্যস্ত, লোকগান ভালবাসি, আমাদের কি একটুও কষ্ট করতে হবেনা? বিনা পরিশ্রমে সৃষ্টির মাধুর্য ধরা দেবে কেন আমাদের মনে? অথচ নগর সংস্কৃতির প্রভাবশালী মহল বিনা বাক্য ব্যয়ে সেই কাজেই অগ্রসর হতে চায়।

গোয়ালপাড়িয়া গানের ভাব গোয়ালপাড়িয়া ভাষাতেই তো সবচেয়ে বেশি সুষমামণ্ডিত হয়। অনুবাদ রচনা কখনোই মূল সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। খুব ভাল অনুবাদ হয়েছে, এমন কথা বলে বড়জোর আমরা বাহবা দিতে পারি।

নিজে কোন কথা যোগ করতে চাইছিনা। ড. ধীরেন দাসের বই থেকে একটা উদাহরণ যথাযোগ্য মনে করে এখানে পেশ করছি।

আমরা উদাহরণ হিসেবে একটা গোয়ালপাড়িয়া গান নিই।

বন্ধু ধন, ধন রে,
এতয় গোসা কি তোমার মনতে।
দেখিতে দেখিতে গাবুর (গাভরু) হনু,
রবিবারের দিন মাতা (মাথা) ধুনু;
পাড়ার চেঙেরা দেখি করে হায় রে হায়।
মুই তো পীরিত করং না;
পাড়ার চেঙেরাও ছাড়ে না,
আরো দিয়া যায় পীরিতির বায়না।
বাপ মাও মোর (ময়াল) মায়া ছাড়া,
বেচেয়া না খায় (বিয়া নিদিয়া) মোক ছোট বেলা,
যৈবন ঢোলে মোর পূবাল বাতাসে
বন্ধু ধন, ধন রে,
এতয় গোসা কি তোমার মনতে।

এই গানের চারটি লাইন, 'এতয় গোসা কি তোমার মনতে/রবিবারের দিন মাতা (মাথা) ধুনু/দিয়া যায় পীরিতির বায়না/যৈবন ঢোলে মোর পূবাল বাতাসে' যদি আমরা অহমিয়া ভাষায় অনুবাদ করি তবে যা হবে, কবি কালিদাসের সেই বিখ্যাত উক্তির কথা মনে করিয়ে দেবে। সবাই জানেন কালিদাসের সেই কাহিনি। কেউ লিখলেন, 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে'। কালিদাস একই কথা লিখলেন অন্যভাবে, 'নিঃরস তরুবর পূরত ভাতি'।

১৯৬১ সাল। গুয়াহাটি বেতারকেন্দ্রের সঞ্চালক হিসেবে যোগ দিয়েছেন পুরুষোত্তম দাস। তিনি একদিন গৌরীপুরে এসে লালজীকে বললেন, 'প্রতিমার গান রেকর্ড করতে চাইছি'। লালজী উত্তর দিলেন, 'এক্ষুনি হবেনা। এই গানে যন্ত্র লাগে, বাজনা লাগে। যারা বাজাবে সবাই কাজে বেরিয়ে গিয়েছে।'

শ্রীদাস তখন বললেন, 'অনুগ্রহ করে গুয়াহাটি কেন্দ্রে এলে ভাল হয়। আমরা প্রতিমার গান রেকর্ড করতে চাই।'

গুয়াহাটি কেন্দ্রে পরের বছর প্রতিমার গান রেকর্ড হল। দোতারা বাজিয়েছিলেন রঞ্জিত মন্ডল। ভবেনও ছিলেন। ঢোল বাজিয়েছিলেন চাং কাকতি। তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড, একবার হরি বলো মন রসনা। পুরো গানটি আমরা এই বইয়ে দিয়েছি। পরপর গাইলেন তিনি, কেনেহে রাধে তোর বিরস মন, হস্তী কন্যা হস্তী কন্যা। ধীরেন দাস মশাই প্রতিমার রেকর্ড করা লোকগানের একটা হিসেব দিয়েছেন। প্রথমদিকে বছরে

চারবার গান রেকর্ড করার আমন্ত্রণ পেতেন। প্রতিটি অনুষ্ঠানে তিনটি করে গান গাইতে হত। ১৯৭৮ সালের পর ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বছরে চারবার গাইলেও এক এক বার চার পাঁচটি গান রেকর্ড করতেন। অনেক গান এর ভেতর নষ্টও হয়ে গিয়েছে। প্রতিমা বড়ুয়া নিজে বলতেন, 'শ'আড়াই মত গান গেয়েছি আকাশবাণী গুয়াহাটিতে'। আকাশবাণীতে তাঁর গান না বাজলেও প্রতিমা আমাদের কাছে প্রতিমাই থাকতেন। তবে আকাশবাণীর একটা জনপ্রিয় ভূমিকাতো রয়েছেই। একবার তাঁকে উচ্চতর শ্রেণিতে যাওয়ার জন্য একটানা নব্বই মিনিট গান গাইতে হয়েছে। সেই গান শুনে বিচারকেরা প্রতিমাকে বি-গ্রেড থেকে এ-গ্রেড শিল্পী হিসেবে উন্নীত করেছেন। আকাশবাণীর পাঠানো চিঠিটি আমরা নীচে দিলাম।

Government of India

A.I.R. Guwahati

No. Guw. 3(4)/88-11. Dt. Guw. the 21st Jan/88

Smt. Pratima Pandey (Barua)

C/0. Shri Prakritish Barua

Baruapatty. P.O. Gauripur, Dhubri, Assam.

Madam,

We are pleased to inform you that you have been upgraded by the directorate general, A.I.R., New Delhi from B-high to 'A'-Grade artist in Goalpara Lokagit, on the basis of your performance (off broadcast), which had been sent to the Directorate General, A.I.R., New Delhi for assessment by the Music Audition Board. Your engagement, however, will be depending upon your programme exigencies. Looking forward to your kind and further co-operation in this service and wishing you a very happy and prosperous New Year.

Yours faithfully

P.K. Singson

Station Director 10-11-88

১৯৭৫ সালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে আমন্ত্রিত হয়ে প্রতিমা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তিনটি গান তিনি এককভাবে পরিবেশন করেন। পরে দুটি গান তিনি ও ভূপেন হাজারিকা একসাথে করেছিলেন। পাঁচটি গানের প্রথম কলি আমরা নীচে পেশ করছি।

. গান শুধু গান

১. হস্তীর কন্যা হস্তীর কন্যা
২. ও মোর ভাবেরে দেওরা
৩. রাধার আয়াসের মাঝে
৪. বন্ধুর বাড়িতে তালগাছে ঢোলে
৫. লাউখোয়ার পাড়ে, পাড়ে কি

তারপর ধীরে ধীরে দেশের সকল বেতার কেন্দ্রেই প্রতিমা বড়ুয়ার গান শোনা যেত। আকাশবাণীর সম্মেলনে তিনি নিয়মিত আমন্ত্রিত হতেন। কার্শিয়াং, ডিব্রুগড় ও আগরতলা কেন্দ্রেও তিনি গান পরিবেশন করেছেন। গ্যাংটক বা ইম্ফলে গান করেছেন। বলছি এই কারণে যে হিন্দিগান বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিল্পী না হয়ে শুধু মাত্র লোকগানের দক্ষতা দেখিয়ে সারা দেশে শ্রোতা সংগ্রহের সুযোগ প্রতিমা বড়ুয়া ছাড়া আর কেউ পাননি। এই গান আবার দেশজ মাটির গান যা 'গোয়ালপাড়িয়া গান' নামে পরিচিত। গান গোয়ালপাড়িয়া হলেও শিল্পী সেই গানকে সর্বজননন্দিত করে তুলেছেন। এ খুব কম কথা নয়। আকাশবাণীতে খুব বেশি স্বপ্ন সকল মানুষের শ্রবণের ও বিনোদনের জন্য শিল্পীরা পরিবেশন করতে পারেন না। প্রতিমা পারতেন। দাপটের সঙ্গেই পারতেন।

১৯৬৬ সালে প্রতিমা দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সঙ্গী ছিলেন অলকেশ বড়ুয়া, রঞ্জিত মন্ডল, বসন্ত মালি, ভবেন রায়, পূর্ণিমা ও প্রতিভা বড়ুয়া। প্রতিভা খুব ভাল গোয়ালপাড়িয়া নাচেন। আরও দশ বার জনকে সঙ্গে নিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে গোয়ালপাড়িয়া নাচ পরিবেশন করেছিলেন। প্রতিভা তাঁর স্বামী পুত্র নিয়ে গৌরীপুরেই থাকেন। তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। দিদি প্রতিমার বিষয়ে নানা কথা জানতে চেয়েছি। প্রতিভার স্বামী দেবেশচন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিমার খুবই স্নিগ্ধ ও মজার সম্পর্ক ছিল। দেবেশচন্দ্র প্রথমে খুব কম মাইনেতে প্রমথেশচন্দ্র কলেজে পড়িয়েছেন। পরে লাইব্রেরিয়ান হয়েছিলেন। এখন অবসর জীবন যাপন করছেন। প্রতিমাকে 'বড়দি' বলে সম্বোধন করতেন তিনি। বড়দি চাইতেন প্রতিভা নাচটাকে বাঁচিয়ে রাখুক। কিন্তু সংসারে ঢুকে যাওয়ার পর আর করেন নি।

দেবেশবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এককথায় বড়দিকে আপনি কি বলবেন?

উত্তর দিয়েছিলেন চমৎকার। রোমান্টিক, গুড স্টোরি টেলার। গল্প যে তিনি ভাল বলতে পারতেন, নিজেও বোধহয় জানতেন। নইলে সাক্ষাৎকারে বলতেন না, 'গল্প বলায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার থাকলে সেই পুরস্কার আমার ঝুলিতেই জমা হত।'

আরও একটা কথা ওই বাড়ি গিয়ে জানতে পেরেছিলাম। সুকুমার রায়ের কবিতা শিল্পী প্রতিমার খুব পছন্দ ছিল। নিজের মেয়ে অলকার বরকে পর্যন্ত তিনি মজা করে 'গঙ্গারাম' বলতেন।

১৯৭৫ সাল। কলকাতা দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, মাহুতকন্যা প্রতিমা বড়ুয়ার

একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করবেন। কে নেবেন সেই সাক্ষাৎকার? প্রথমে পিসীমা নীহারবালা বড়ুয়ার কথা ভাবা হল। নীহারবালা সেই কাজের ভার নিজ কাঁধ থেকে নামিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কাছে দিলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় যতটা পরিচিত, অসমে তাঁর পরিচিতি বিন্দুমাত্র কম নয়।

১৯১২ সালে বর্তমান শ্রীহট্ট জেলায় তাঁর জন্ম। হবিগঞ্জ হাইস্কুল থেকে পাশ করে শ্রীহট্টের বিখ্যাত এম. সি. কলেজে ভর্তি হন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩২ সালে কমিউনিস্ট রাজনীতির সান্নিধ্যে আসেন। কারাবন্দী হন। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার জন্যে মুক্তি পান। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সময়েও তিনি কারাবাসে ছিলেন। চল্লিশের দশকে বিনয় রায়, নিরঞ্জন সেন, দেবব্রত বিশ্বাস ও আরও কয়েকজন মিলে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২ সালে কলকাতায় আসেন তিনি। ১৯৪৩ সালে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস মিলে 'শ্রীহট্ট গণনাট্য সংঘ' গড়ে তুলেন। গণনাট্য সংঘের একাধিক বিখ্যাত গানের সুরকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এছাড়া নিজে ভাল গাইতেও পারতেন। অসমে গণনাট্য সংঘের প্রচার ও প্রসারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। উৎপল দত্তের কয়েকটি নাট্য প্রযোজনায় তিনি সুরকারের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর শঙ্খচিলের গান, জন হেনরির গান, মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য আজও অবিস্মরণীয়। বাংলা ও অসমের লোকগীতি বিষয়ে তাঁকে অন্যতম বিশেষজ্ঞ মনে করা হয়। বাংলা ও অহমিয়া—দুই ভাষাতেই তাঁর বই রয়েছে।

তাঁর লেখা 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম' বইটি খুবই পরিচিত। বড়ুয়া পরিবারের সাঙ্গীতিক অবদান বিষয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস পুরো সচেতন ছিলেন। উল্লিখিত বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, 'আসাম গৌরীপুরের লোকসুর ও লোকনৃত্যের ভাণ্ডারী প্রমথেশস্বসা শ্রদ্ধেয়া নীহার বড়ুয়ার কাছেও আমার ঋণের অন্ত নেই। আমার অনুজাপ্রতিম অদ্বিতীয়া লোকসঙ্গীতশিল্পী প্রতিমা বড়ুয়ার কথা এই প্রসঙ্গে মনে হয়।'

প্রতিমাকে 'অদ্বিতীয়া' লোকসঙ্গীত শিল্পীর শিরোপা দিয়েছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এই শিরোপাকে শিল্পী খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অভিমত বিষয়ে প্রতিমার খুবই নির্ভরতা ছিল। প্রতিমা ও ভূপেন হাজারিকা যখন দ্বৈতসঙ্গীত গাইলেন, অনেকেই বললেন, 'ভূপেনের সঙ্গে প্রতিমা গান করেছেন।' হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছিলেন, 'প্রতিমার সঙ্গে ভূপেন গান করেছেন।' এই দুই কথার ফারাক যে কোথায়—গানের রসিকজন সহজেই বুঝতে পারেন।

'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা' বইয়ের একটি প্রবন্ধে হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন, 'আসামের গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুর অঞ্চল ভাষা ও সুরে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সংস্কৃতির অন্তর্গত হলেও গৌরীপুরের একটি চমৎকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে।'

না, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রতিমার সাক্ষাৎকার নিতে পারেন নি। ঠিক হল, ভূপেন হাজারিকা প্রতিমার সঙ্গে কথা বলবেন। কথা হল। অনুষ্ঠানের দিনও ঠিক হল। একা

আসেননি প্রতিমা। সহশিল্পীদের নিয়ে এসেছেন। কলকাতার অনুষ্ঠান বলে বাংলাতেই সম্প্রচারিত হল। সহশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ঢোল বাদক বসন্ত মালি, দোতারা বাদক সুধীর রায়। ১৯৯১ সালের ২৩শে এপ্রিল প্রতিমার গানের সঙ্গে দোতারা বাজিয়ে ফিরতে গিয়ে বাস দুর্ঘটনায় মারা যান সুধীর। ঠিক করেছিলেন প্রতিমা, আর গান করবেন না। সিদ্ধান্তে স্থির থাকতে পারেন নি। অনুজ সহশিল্পীরা তাঁকে ছাড়া বাঁচবেন কি করে?

নিছক কথোপকথন ছিলনা এই অনুষ্ঠান। গানের সুরে দর্শক ও শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দিয়েছিলেন প্রতিমা। ভূপেন হাজারিকা প্রতিমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'তোমার গানের উৎস কি? আর প্রেরণা কোথা থেকে পেয়েছ?'

উত্তরটি পাঠকের কাছে পেশ করার লোভ হয়। 'প্রকৃতি। এখন মানুষ পাথরের মত নীরস। মানুষ প্রেরণা দিতে পারে, উৎস হতে পারেনা। প্রকৃতিই আমার গানের উৎস, জঙ্গলই যন্ত্র আর যন্ত্রী আর প্রকৃতি ও সমাজই আমার গান। মানুষ থেকে আমি প্রেরণা পেয়েছি। হাজার মানুষের মধ্যে বাবার প্রেরণা বিশেষ কার্যকর মনে হয়। আপনার প্রেরণাও কম নয়।'

আমাদের আর একজন বড়মাপের মানুষের কথা মনে পড়ে। প্রতিমা বড়ুয়া তাঁর কথাও নানা জায়গায় বলেছেন। তিনি বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা। সত্যি বলতে কি, আসামের সাংস্কৃতিক জীবনে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ও বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার নাম একসাথে উচ্চারিত হয়। অপরিহার্য এই উচ্চারণ। প্রতিমা জানিয়েছেন, জ্যোতিপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় কোনো যোগাযোগ ছিল না। বিষ্ণুপ্রসাদের সঙ্গে ছিল। এ খুবই আশ্চর্যের, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া ও জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা একই বছরে (১৯০৩) জন্মগ্রহণ করেন ও একই বছরে (১৯৫১) এঁদের মৃত্যু ঘটে। ভূপেন হাজারিকা তাঁর 'আমি এক যাযাবর' বইয়ে লিখেছেন, 'জ্যোতিপ্রসাদ ভাল পিয়ানো বাজাতে পারতেন, খুব ভাল নাটক লিখতে পারতেন।' সতেরো বছর বয়েসে লেখা তাঁর নাটক এম. এ. ক্লাসের সিলেবাসে যোগ হয়েছিল।

১৯০৩ সালের ১৭ই জুন তেজপুরে জ্যোতিপ্রসাদের জন্ম হয়। অল্প বয়স থেকেই তিনি সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দেন। ১৯২১ সাল। সরকারি কলেজের পড়া ছেড়ে দেন জ্যোতিপ্রসাদ। ন্যাশনাল কলেজে ভর্তি হন। কলকাতায় ছিল এই কলেজ। ১৯২৬ সালে সমাজবিদ্যা নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য এডিনবরায় যান। বার্লিনে যান তারপর। চলচ্চিত্র নির্মাণ শিক্ষা করেন। ১৯৩৩ সালে তাঁর হাতেই প্রথম অহমিয়া ছবি 'জয়মতী' তৈরি হয়। ১৯৩২ সালে তাঁর প্রায় পনেরো মাস কারাবাসের শাস্তি হয়। অপরাধ ব্রিটিশ বিরোধিতা। ১৯৪২ সালে আত্মগোপন করেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৬ সালে শিলচরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অসম শাখার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জ্যোতিপ্রসাদ। স্বাধীনতার পর রাজনীতির

অঙ্গন থেকে সরে এসে সংস্কৃতির অঙ্গনে যোগদান করেন। অসমিয়া সাহিত্য তাঁর হাতে অপ্রত্যাশিতভাবে সমৃদ্ধ হয়।

বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার কথায় আসছি। প্রতিমা বড়ুয়া এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, 'বিষ্ণুদাকে আমি অতি ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছি। মাহুত বন্ধু রে শুটিং-এর সময় তিনি গৌরীপুরে ছিলেন। খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি আমার অটোগ্রাফের খাতায় লিখেছিলেন 'প্রতিমা, তোমার গানের নাই উপমা'। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার সাইকেলে চড়ে 'ইন্দ্রমালতী কথা' ছবির গানের মহড়ায় যেতেন ভূপেন হাজারিকা।'

গোপালচন্দ্র রাভার চার কন্যা পাঁচ পুত্র। অষ্টম সন্তানের নাম ছিল বিষ্ণুপ্রসাদ। ১৯০৯ সালের ৩০শে জানুয়ারি ঢাকায় বিষ্ণুপ্রসাদের জন্ম হয়। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। ১৯১৭ সালে মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি বাবাকে হারান। মা সবাইকে নিয়ে তেজপুরে চলে আসেন। তেজপুর সরকারি হাইস্কুলে ভর্তি হন। বাংলা থেকে অহমিয়া। প্রথম পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি তিনি। হতাশ হননি। পরের বছর ভাল ফল করলেন। ১৯২৬ সালে জেলায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এরপর কলকাতা এলেন বিষ্ণুপ্রসাদ। সেন্ট পল্‌স্ কলেজ থেকে আই. এসসি. পাশ করেন। ১৯২৮ সালে বি. এ. ক্লাশে রিপন কলেজে ভর্তি হন। তখন বিজ্ঞান ছিল না। ১৯৩০ সালে স্বাধীনতার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। আবার রাজনীতি। আবার পলায়ন। রংপুরে গিয়ে মাইকেল কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩১ সালে ইংরেজিতে কলেজের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়েছে তখন সারা দেশে। বিষ্ণুপ্রসাদ ফাইনাল পরীক্ষা দেননি শেষ পর্যন্ত। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যান। কলকাতায় এলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কাগজে যোগদান করেন। সাহিত্য সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রে নিজেকে ছড়িয়ে দেন। পুলিশের সন্দেহ তাঁর উপর থেকে যায়নি। চট্টগ্রামের সংঘর্ষের পর তাঁর উপরেও রোষ এসে পড়ে। আবার তিনি পালিয়ে যান। ঢাকায় চলে যান। ঢাকায় গিয়ে পুলিশ প্রশাসনে চাকুরি নেন। শিলং-এ ডি. এস. পি. পদে যোগ দেননি। শিলং যাবার পথে বরপেটায় থেকে যান। বরগীত শেখেন।

১৯৩৫ সালে ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। বিয়ের চব্বিশ দিন পর স্ত্রীকে হারান। স্ত্রী টাইফয়েডে মারা যান। ষোল বছর পর বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যা কনকলতাকে বিয়ে করেন। ১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালে তাঁদের দুটো ছেলে হয়। ১৯৬২ সালে কনকলতার মস্তিষ্কে টিউমার ধরা পড়ে। তিনিও মারা যান।

ছেলেদের সামলে সকল কাজ করা দুঃসাধ্য। মোহিনীবালা বসুমাতারির পাণিগ্রহণ করেন। খাদি আশ্রমের আদর্শে মোহিনীবালা মানুষ হয়েছেন। পরম যত্নে ছেলেদের মানুষ করেছেন।

তাঁর প্রতিভার পরিচয় আমরা দু'চার কথায় দিতে পারবনা। খানিকটা আন্দাজ করতে পারব মাত্র।

১৯৪০ সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত উদয়শঙ্কর ও ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সামনে নাচ দেখিয়ে সবাইকে খুশি করেন। নৃত্যবিশারদ শুধু নন। খুব বড় মাপের চিত্রকরও ছিলেন তিনি। অভিনয় করতেন খুব ভাল। ঐরাবতের সুর, মাহুত বন্ধু রে— এসব ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। আবার ভূপেন হাজারিকার কথায় যাই। তিনি বলেছিলেন, 'বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা সবকটা ট্রাইবাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানতেন।...সেই বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, জ্যোতিপ্রসাদ প্রমুখ দিক্‌পাল মানুষদের প্রভাব আমার জীবনে পড়েছিল।'

তাঁর সাহিত্য অসামান্য। কোনো জাত বর্ণ ধর্মের প্রতি বিষোদগার নেই। সমাজের শোষিত মানুষের লড়াইয়ের কথা লিখেছেন। 'এই আজাদি ঝুঁটা হ্যায়', স্বাধীনতার পরে পরেই কমিউনিস্ট পার্টির এমন শ্লোগানে তাঁর সমর্থন ছিল।

১৯৬৮ সালে তাঁর শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ে। সারা অসম তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করেছিল। ১৯৬৯ সালের ২০ শে জুন কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ প্রয়াত হন। সতেরোটি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। ষোলটি ভাষায় গান করতেন। এমন মানুষের সঙ্গে শিল্পী প্রতিমার যখন সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে আমরা প্রতিমার মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের একটা পছন্দের তালিকা তৈরি করতেই পারি। অসমের সংস্কৃতি জগতে তিনি একজন প্রাতঃস্মরণীয় চরিত্র।

১৯৮৭ সালে গুয়াহাটি দূরদর্শন প্রতিমার একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন কমলরাণা শর্মা। কমলরাণা শিল্পীকে বলেছিলেন, আপনি মাঝে মাঝে গোয়ালপাড়িয়া ভাষায় উত্তর দিবেন। কথা রেখেছিলেন শিল্পী। খুশিও হয়েছিলেন। কিছু বছর আগে তাঁকে তো একারণেই বাধা দেওয়া হয়েছিল। এরপর প্রতিমা দূরদর্শনে একাধিকবার আমন্ত্রিত হয়েছেন। সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কার লাভের পর ড. বীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ড. দত্ত পরে 'অসম সাহিত্য সভা'র সভাপতি হন। 'অসম সাহিত্য সভা' প্রতিমা বড়ুয়াকে ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত একটানা ছাব্বিশ বছর তাঁদের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ করেছে। সত্যি বলতে কি, 'মাহুত বন্ধুরে' ছবি হয়ে যাওয়ার পর প্রতিমা চারদিক থেকেই আমন্ত্রিত হতে থাকেন। সাড়াও দেন তিনি সাধ্যমত।

জনসাধারণের দরবারে প্রতিমা প্রথম শিলং-এর অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন। নিজেই বলেছেন তিনি, 'সেটা ১৯৫৭ সালের কথা। আমরা তখন শিলং-এ থাকতাম। বাবা বিধায়ক ছিলেন। সে সময় বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন দেবকান্ত বড়ুয়া। ওঁরা সবাই মিলে শিলং-এ বিহুর আয়োজন করতেন। শিলং-এ সেই বিহুর মঞ্চে আমি প্রথম গান গাই। সেই আমার প্রথম মঞ্চে গান গাওয়া, শুরু আমার শিল্পী জীবনের।'

তারপর হাজার হাজার শ্রোতার সামনে প্রতিমা বড়ুয়া বহুবার গান করেছেন।

অসমের মাটিতে করেছেন। অসমের বাইরেও করেছেন। সকল মানুষ মন প্রাণ ঢেলে তাঁকে ভালোবেসেছে। কলকাতায় 'আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি' একাধিকবার তাঁর গান শোনার সুযোগ করে দিয়েছে। তাছাড়া ১৯৭০ সালে ইডেন গার্ডেন ময়দান, ১৯৭৫ সালে কলকাতা ইয়ুথ কর্ণার, ১৯৭৬ সালে কলকাতা ময়দান, ১৯৭৭ সালে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৭৭ সালেই পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা, ১৯৮৭ সালে 'ভ্রমরা'র আয়োজনে বার্ষিক উৎসব—প্রভৃতি জায়গায় আমরা তাঁর গান শুনতে পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত 'সঙ্গীতমেলা'য় তিনি গান করেছেন। প্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতিতে 'সঙ্গীতমেলা'য় মঞ্চ নির্মিত হয়েছে। সেখানে লোকগান পরিবেশিত হয়েছে।

আমি সঙ্গীতের শল্যবিশারদ নই। সঙ্গীতকে তার সমগ্র চেহারায় দেখতে ও বুঝতেই আমার ভাল লাগে। তবু দু একটা খুব সহজ কথা পাঠকদের কাছে নিবেদন করতে পারি। প্রথম কথা, লোকগানে কোনো কালেই বাজনার আধিক্য ছিল না। গানের চেয়ে বাজনা কখনই ছাপিয়ে যেতে পারে না। এই বিষয়ে বড় মাপের সকল শিল্পীই সচেতন ছিলেন। গোয়ালপাড়িয়া লোকগান তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। এই গানে সুর প্রধানত চার রকমের। ভাওয়াইয়া, চটকা, চাচর / চকরা ও মইষালী। দোতারা বাজানোর নিয়মটা এরকম।

১. ভাওয়াইয়া (বিলম্বিত কাহারবা) : দোতারার মাত্রা
ডোলো /ডোলো/ডোলো/ডং।
ডোলো/ডোলো/নোলো/ডং।।

২. চটকা-খেমটা ও ভাওরি (একতাল) : দোতারার মাত্রা
ডোলো/ডং/নোলো/ডং।

৩. মইষালী (তেওরা, ঝাপ, দাদরা) : দোতারার মাত্রা
ডোলো/ডং/নোলো/ডং

৪. চকরা (বিভিন্ন তাল) : দোতারার মাত্রা
ডোলো/ডোলো/নোলো/ডং

প্রতিমা বড়ুয়া ধীরে ধীরে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। নানা ভাষার সংস্কৃতি তাঁকে 'আপনার জন' বলেই ভাবছিল। সাময়িক কেউ কেউ তাঁকে ভুল বুঝলেও তা উত্তেজনার মুহূর্ত ছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় সহ একাধিক শিল্পী তাঁর গান ভালোবাসেন। উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, পূর্ণদাস বাউল-এঁরা সবাই শিল্পীকে তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তাঁর অপূর্ব কণ্ঠের গান শুনেছেন। শান্তিনিকেতনে সান্ধ্য অনুষ্ঠান। প্রতিমা গাইছেন। শ্রোতা প্রচুর। বিশিষ্টদের মধ্যে রয়েছেন ভারত সেরা ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ, কবিগুরুর স্নেহধন্য অগ্রজ শিল্পী

শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, পূর্ণদাস বাউল ও মঞ্জুদাস বাউল। গান ধরেছেন প্রতিমা,

আরি ও মোর ভাবেরে দেওরা
থুইয়া আইসেক মোক,
বাপ ভাইয়ের দেশে।।

১৯৮৬ সাল। 'গজমুক্তা' ছবির শুটিং হবে। সবাই মিলে গৌরীপুর গিয়েছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মুনমুন সেন। তাঁদের সঙ্গেও শিল্পীর গভীর সখ্য তৈরি হয়।

বরেণ্য চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক বড়ুয়া পরিবারের সাংস্কৃতিক অবদানকে বরাবরই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার কাজের ঐশ্বর্য তিনি পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে বারবার বলতেন। ১৯৬৫ সালের তাঁর একটি সংলাপ আমরা স্মরণ করতে পারি।

'পদ্ধতি টদ্ধতি বুঝি না মশাই, আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়াই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই।'

অনেকেই জানেন, 'বগলার বঙ্গদর্শন' নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র তৈরির জন্য ঋত্বিক ঘটক চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন। প্রথমদিকের খানিকটা অংশ শুটিংও করেছিলেন। এই ছবির সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য আমরা চাইলে পড়তে পারি। এই চলচ্চিত্রের নায়ক বগলা বোস খুবই কষ্ট করে তাঁর পরিবার চালায়। সে লোকগানের ভক্ত। অঞ্জনা নদী দেখার পর বগলা কাঞ্চনকে (প্রধান নারী চরিত্র) বলছিলেন, 'বাঙলাদেশে বাড়ি কিনা, চওড়া চওড়া নদীর দেশ। তাই জল দেখলেই মুড ভালো হয়ে যায়। Folk song গাইতে ইচ্ছা করে। ওসব বুঝতে গেলে এলেম লাগে।'

চিত্রনাট্যের আরও একটি জায়গায় সুখেন্দু নামের জনৈক চরিত্র বলছেন, 'তবে? কলকাতার লোক folk culture এর কি বোঝে মশায়? বাউল দেখেছেন? সত্যিকারের বাউল? চলুন আজ দুপুরে তিনকড়ির মেলায়। দেখে আসবেন বাউল কাকে বলে।— আপনার দেশ কোথায়?

বগলা : পূর্ববঙ্গে।

সুখেন্দু : হাঃ।

বগলা : হাঃ নয়। আপনি শুনেছেন পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি? নদীর বুকের উপর— সেকী নদী ; এপার ওপার দেখাই যায়না-তার মধ্যে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে বাউলের টান। নদী নয়। সমুদ্দুর বলতে পারেন।

সুখেন্দু : ঠিক আছে। আজ আমাদের বাউল দেখে আসবেন চলুন। তারপর আপনার ভাটিয়ালি শোনা যাবে পরে।

পুরো চলচ্চিত্রটির জন্য ঋত্বিক প্রতিমা বড়ুয়াকে দিয়ে ৭/৮টি লোকগান রেকর্ড করিয়েছিলেন। ঋত্বিকপুত্র ঋতবান ঘটকের কাছ থেকে জেনেছি, অসমাপ্ত ছবিটি সম্পাদনা করে তিনি দেখার মত করে তুলেছেন। চিত্রনাট্যের চরিত্রদের কারও মুখে লোকগান ছিল না। প্রতিমা বড়ুয়ার গানগুলো নেপথ্যে বাজিয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক। দুটো গান কাজে লাগিয়েছেন ঋতবান। প্রথম গান, 'হস্তীর কন্যা, হস্তীর কন্যা'। দ্বিতীয় গান, 'একবার হরি বলো মন রসনা, মানবদেহের গৌরব কইরনা'।

১৯৭৮ সাল। শিবসাগর ও. এন. জি. সি. অতিথিশালায় শিল্পীদম্পতি এসেছেন। সঙ্গে রয়েছেন প্রবীণ ঢোল বাদক বসন্ত মালি। অনেক শ্রোতাই ছিল। প্রতিমা একটার পর একটা গান করে চলেছেন। দুচোখ বুজে আপন ভাবে গান করছিলেন। পাশে অধ্যাপক গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডে আর তাঁদের এক কন্যাসন্তান বসে। একজন শ্রোতা শিল্পীর মুখের সামনে মাউথপীস ধরে গান টেপে তুলে নিচ্ছেন। হঠাৎ একটা চার-পাঁচ বছরের মেয়ে বারান্দায় পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে শিল্পীর কাছে চলে এল। অঝোরে কাঁদছে সেই ছোট্ট মেয়ে। প্রতিমা গান বন্ধ করেন নি। মেয়েটির কান্নার শব্দ যাতে না বাইরে আসে, তার জন্যে মেয়েটি নিজেই দুটি ছোটো হাত দিয়ে মুখ চেপে বসেছিল। কে এই মেয়ে? শিল্পীর দ্বিতীয় কন্যা অলকা। শিখে গিয়েছিল ওই বয়সেই। মা যখন গান করবেন, তখন মাকে বিরক্ত করা চলবে না। দুই ছোট্ট মেয়ে মায়ের গা ঘেঁসে বসে মাকে গানের স্বাধীনতা দিয়ে চলেছে একশোভাগ, এমনটা সাধারণত চোখে পড়ে না।

আধুনিককালে লোকগানের বিশুদ্ধতা থাকছে না, এ অভিযোগ বহু মানুষের। প্রতিমা বড়ুয়া ছিলেন এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। ছোটোবেলা থেকেই পরিশ্রম করে শ্রমজীবী মানুষের অবসর যাপনের গান অবিকল সুরে ও কথায় নিজ কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন। একটুও কথার বদল করেননি। একটুও সুরের বদল করেন নি। কাকে আমরা বলব লোকগান, এই বিষয়ে তাঁর খুব পরিষ্কার অভিমত ছিল। আব্বাসউদ্দীন আহমেদ খুবই বড় মানের লোকসঙ্গীত শিল্পী। জসিমউদ্দীনের কবিত্বশক্তিরও কোনো তুলনা নেই। জসিমউদ্দীনের অনেক গান অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রতিমা তাকে লোকগান বলতে চাইছেন না। আদলটা লোকগানের হতে পারে। এই গানতো খেটে খাওয়া মানুষের শ্রম লাঘবের ভাবনা থেকে তৈরি হয়নি।

বাজনা বিষয়ে প্রতিমা বলেছেন, 'স্প্যানিশ গীটার, হাওয়াইয়ান গীটার, অঙ্গ বঙ্গ, তারপর ঐ ম্যারাকাস—সব বাজনার আমি নাম জানি, কিন্তু ব্যবহার করিনা। কেন, আমাদের দেশে কি যন্ত্র নেই? আমাদের দেশের যন্ত্রগুলোরও তো বেঁচে থাকতে হবে, আর এদের বাঁচাতে হবে।'

একই কথা আমরা আব্বাসউদ্দীনের কাছে শুনতে পেয়েছি। বলছেন আব্বাসউদ্দীন, '....দেশ যত শিল্পায়িত হবে, পল্লীগীতি তত লোপ পেতে থাকবে। বিভিন্ন সভা সমিতি পত্র পত্রিকায় আজ আট-দশ বছর ধরে আমি বহুভাবে বলে আসছি, এই

পল্লীসংগীত সংরক্ষণের ব্যবস্থা হোক, টেপ রেকর্ডে পল্লীর গান, তার কথা ও সুর অবিকৃতভাবে রেখে দেওয়া হোক কালজয়ী, লোকজয়ী করে।'

লোকগানের সমঝদার গবেষক খালেদ চৌধুরী তার 'শিকড়ের সংগীত' রচনায় লিখেছেন, '....গ্রামীণ স্তর থেকে লোকসংগীতকে সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায়শই এর বিকৃতি ঘটছে। বিকৃতি ঘটছে কথায়, বিকৃতি ঘটছে সুরে, কখনও ইচ্ছাকৃত। লোকভাষাকে ফেলে দিয়ে গানকে শহুরে করে তোলার জন্য ব্যবসায়িক কারণে মার্জিত করা হচ্ছে। কখনও ডায়ালেক্ট না বুঝে নিজের কথা বসিয়ে দেবার জন্যও বিকৃতি ঘটছে।' অবিকৃত লোকসংগীতের রেকর্ড করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে খালেদ চৌধুরী মশায় 'আব্বাসউদ্দীন, কেশব বর্মণ, সুরেন্দ্র বাসুনিয়া, প্রতিমা বড়ুয়া, অনন্তবালা বৈষ্ণবী এবং শচীনদেব বর্মণ' এর নাম উল্লেখ করেছেন।

প্রতিমা বড়ুয়া লোকগানের বাইরে অন্য কোনো গান রেকর্ড করেননি। ধুবড়ি থেকে তাঁর একটি ক্যাসেট বেরিয়েছে যেখানে গোয়ালপাড়িয়া গান রয়েছে শুধু, তাই নয়। একটা করে ভোজপুরী, সাঁওতাল, কাশ্মিরী ও বোড়ো লোকগান রয়েছে। অবিকৃত সঙ্গীত পরিবেশনার জন্যে প্রতিমা এক যথার্থ ও প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার অনুভব করতেন। জনৈক প্রশ্নকর্তা 'বড় শিল্পী' কথাটা উচ্চারণ করে একবার বিপদে পড়ে যান। প্রতিমা সঙ্গে সঙ্গে জানতে চান, 'বড় শিল্পী? কারা? লোকসঙ্গীতে বড় বড় শিল্পী কারা?' কিছু নাম উচ্চারিত হল। প্রতিমার সাহসী উচ্চারণ, 'যাঁরা লোকসঙ্গীতের জন্য জীবনটা দিল তাঁরা কেউই বুঝি বড় নয়?'

১৯৬৯ সালে শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়ার বয়স পঁয়ত্রিশ। আমাদের দেশে এমন বেশি বয়সে সাধারণত মেয়েদের বিয়ে হয় না। প্রতিমা বহুকাল ধরেই ভাবছিলেন, গোয়ালপাড়িয়া গানে প্রাণ সঁপে দেবেন, সংসার ধর্ম করবেন না। কিন্তু প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার নামাঙ্কিত কলেজে অধ্যাপনারত এক যুবকের তিনি পাণিগ্রহণ করেন। বিয়েতে ধূমধাম হল না বিশেষ। মাটিয়াবাগ প্যালেসের পাশেই একটা অত্যন্ত সাদামাটা শিবমন্দির রয়েছে (বইয়ে ছবিটি দিয়েছি)। সেখানেই বিয়ের কাজ সমাধা হয়। আগে আমরা বলেছি, স্বামীর নাম গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডে। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলিতে শিবপুরী গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর দাদু রঘুনাথ পাণ্ডে। বাবা সূর্যকান্ত পাণ্ডে। সূর্যকান্তের আট সন্তান। বড় দুজন বদরপুরে কাজ করেন। দাদা গঙ্গাসহায় পাণ্ডে। দিদি কমলা মিশ্র আর মাধুরী তেওয়ারি। দাদা গঙ্গাসহায় জীবনবীমা কোম্পানির ডেভলপমেন্ট অফিসার ছিলেন। কলকাতায় থাকতেন। গঙ্গাশঙ্কর মাকে ১৯৬৬ ও বাবাকে ১৯৬৮ সালে হারান।

গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডের লেখাপড়া রায়বেরিলিতে গাঁয়ের প্রাথমিক স্কুলেই শুরু হয়। তারপর খাজুরগাঁও মিডল স্কুলে পড়াশুনো করেন। শিবপুরীর বাড়ি থেকে খাজুরগাঁওয়ের দূরত্ব ছিল মাইল পাঁচেক। সাইকেলে যেতেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ঐ স্কুলে পড়েন। তারপর রায়বেরিলি হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন।

কলকাতায় দাদার কাছে এসে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হলেন। তখন তিনি কলেজ হোস্টেলে থাকতেন। বাড়ির বড়রা চেয়েছিলেন, তিনি ইঞ্জিনিয়ার হোন। তা হলনা। ইংরেজিতে বি. এ. ও পরে এম.এ. পাশ করেন।

গৌরীপুরে গিয়েছি যখন, গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডে আমায় নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। মৃদুভাষী। ধীরে ধীরে সব কথারই জবাব দিয়েছেন। ১৯৬৬ সালের ১২ই আগস্ট তিনি প্রমথেশচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। তার আগে কিছুকাল ১০, মিডলটন রো, কলকাতার অল ইন্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনে কাজ করেছেন।

প্রথমে কলেজের বাড়ি ছিল না। প্রতাপচন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ে ক্লাশ হত। ওখানে গিয়ে অলকেশ বড়ুয়ার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। পারিবারিক সূত্রেই গঙ্গাশঙ্কর নিরামিষাশী ছিলেন। মাছ মাংস খান না। পেঁয়াজও খেতেন না। পরে খান। আলাদা বাড়ি নিয়ে থাকছিলেন।

কিছুদিন পর লালজীর সঙ্গে দেখা হয়। মাটিয়াবাগ বাড়ির সামনে বসে ছিলেন। প্রতিভার বর দেবেন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গেও পরিচয় হয়। ১৯৪৬ সালে প্রতিভা ও দেবেন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল। বড়বোন প্রতিমা তখনও ঘর সংসারের স্বপ্ন দেখছেন না। অনেক বছর পর প্রতিমা বড়ুয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এই বিয়েতে দেবেন্দ্র ও প্রতিভার খুবই ভালোরকমের ভূমিকা ছিল। ১৯৫৩ সালে চট্টগ্রামে পূর্ণিমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণিমা এখন আর বেঁচে নেই। সবার ছোটো বোন সবার আগে গিয়েছে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁকে, 'শুরুতে কি আপনি প্রতিমাকে এমন বোহেমিয়ান জীবন কাটাতে দেখেছেন?'

উত্তর দিয়েছিলেন, 'না, চারমিনার খেতে দেখেছি। দু তিন প্যাকেট চারমিনার থাকত। পানীয়ের নেশা একেবারেই ছিল না, বলবনা। তবে চোখে পড়ার মত নয়। প্রতিভার কথা আগে বলেছি। ভাল গোয়ালপাড়িয়া নাচতেন। শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্করের কাছে ক্লে-মডেলিং শিখেছিলেন। কাজে লাগান নি।

হায়দ্রাবাদের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইংলিশে গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডে ১৯৭০-৭১ সালে ডিপ্লোমা করতে যান। প্রতিমা ও গঙ্গাশঙ্করের ঘরে তখন বড়মেয়ে অমৃতার (ডাকনাম টুকু) জন্ম হয়েছে। ১৯৭০ সালেই অমৃতার জন্ম। ছোট মেয়ে অলকার (হাপু) জন্ম ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন। পরে আবার ফেলোশিপ পেয়ে 'Problems of literary translation from English into Hindi'-এর উপর কাজ করতে যান।

এখানে অন্য একটি কথা বলতে হয়। ইয়র্কশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে গঙ্গাশঙ্কর গবেষণার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রতিমা বাইরে যেতে রাজি নন। ফলে গঙ্গাশঙ্করও যাননি।

আমরা নানা সাক্ষাৎকারে দেখতে পেয়েছি, প্রতিমা বলেছেন, ১৯৮৯ সাল থেকে তিনি ও গঙ্গাশঙ্কর কোনো সম্পর্ক রাখেননি। পাশাপাশি ঘরে দীর্ঘকাল কাটিয়ে গিয়েছেন। পরস্পর কথা বলতেন না। না, এঁরা দুজনের কেউই ভিন্ন অর্থে কোনো অনুচ্চারণযোগ্য সমান্তরাল জীবন যাপন করেননি। বারবার বলেছেন প্রতিমা, স্বামীকে তিনি আজও শ্রদ্ধা করেন। তাঁর যতটুকু গান করার সুযোগ ঘটেছে, স্বামীর অবদান সেখানে বলবার মতই।

১৯৮৪ সাল। Phonological studies of Assammese English এর উপর এম. লিট. করেছেন গঙ্গাশঙ্কর। ১৯৮৫ সালে ডক্টরেট করবেন বলে দরখাস্ত করেন। টিচার ফেলোশিপ পেয়েও যান। তিনবছর একটানা কাজ করেন। থিসিস জমা দেননি।

আমরা এখন নানা সময়ে প্রতিমা তাঁর স্বামীকে নিয়ে কেমন অভিমত প্রকাশ করেছেন, দেখব।

কুলেন্দ্র চৌধুরী শিল্পীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'স্বামীর কাছ থেকে কীরকম অনুপ্রেরণা আপনি পেয়েছেন?' উত্তর দিয়েছিলেন প্রতিমা, 'আমার স্বামীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সমাজে আজ আমার যেটুকু জনপ্রিয়তা, তা ওঁর জন্যই।' অন্য একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কেমন ছিল তাঁদের দাম্পত্য প্রেম। উত্তর দিলেন শিল্পী, '...আমার আর স্বামীর মধ্যে একটা মতভেদ সর্বদাই থেকে গেল। খাদ্যাভাস বা চিন্তার পার্থক্য—এসবকে ঠিক মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু তাঁকে আমি এ কারণেই ধন্যবাদ দিই যে আমার মতো এরকম একজন আইনকানুন না-মানা বেপরোয়া মানুষের সঙ্গেই তবু জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। আমার মতো মানুষকে ট্যাক্‌ল করা বড় মুশকিল।' পতি-পত্নীর সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে তাঁর অভিমত ছিল, 'আমাদের সম্পর্ক ছিল most artificial. I am a girl from Gouripur, not a girl, but a woman. He is a man from UP —মেলানোর চেষ্টা করেও মেলাতে পারিনি। এটা সংস্কৃতির পার্থক্য। তিনি ধূমপান বা মদ্যপানের বাইরে থাকেন, নিরামিষ খান, আমি আমিষ খাই। Still I respect him very much. I adore him till now.' একই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন প্রতিমা, '....১৯৬৬ সালে অনেকে এসেছিলেন গৌরীপুর কলেজে। Most decent সব মানুষজন। Very disciplined, very cultured-not cultured, rather educated —এখন এই এডুকেটেড এবং কালচার্ড মানুষের ভেতর প্রচুর পার্থক্য থাকে। একজন নগণ্য মানুষও যেমন কালচার্ড হতে পারে, তেমনি ঠিক তার উলটোটাও হয়। তিনি আমার জীবনে এলেন—আমি তাঁকে অবমাননা করতে পারিনি।'

সংস্কৃতিবান হওয়া না হওয়াটা যে নিছক ডিগ্রির উপর নির্ভর করেনা, একথা স্পষ্টভাবেই অনুভব করতেন প্রতিমা বড়ুয়া। ড. ধীরেন দাস লিখেছেন, 'আমার গানের বিষয়ে আমার স্বামী কোনো বাধা দেননি, উৎসাহই দিয়ে গেছেন। আমাকে বহু অনুষ্ঠানে

তিনি নিজেই নিয়ে গেছেন। আমাদের নানারকমের ভিন্নতা ছিল। দাম্পত্য জীবনে আমরা অভিন্ন ছিলাম। মানুষ হিসেবে পাণ্ডেজী যুক্তি মানেন। দুই ভিন্ন পরিবেশে জন্মেছি। দুই ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বড় হয়েছি।'

বিয়ের পর দুই দশক তাঁদের সংসার জীবন মতের নানা মিল অমিল হলেও বিচ্ছিন্ন ছিল না। ১৯৮৯ সালের পর চেহারা খানিকটা বদলে যায়। সত্যি বলতে কি, বাবা লালজী আগের বছর (১৯৮৮) প্রয়াত হওয়ার পর খুবই দুঃখ পেয়েছেন প্রতিমা। মনে তার গভীর রেখাপাত করেছে এই বিয়োগব্যথা। একটা হাহাকার মনের ভেতর তার তো ছিলই। নইলে জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারে তিনি হতাশায় বলে ওঠতেন না, 'আমার যে কি হোলো? আমার স্বামীর সাথে ১২ বছর কোনো সম্পর্ক নেই।' সম্পর্ক নেই মানে কি? কথা হতনা দুজনের। দুজন দুই ভিন্ন পৃথিবীর নাগরিক ছিলেন। জীবনের যত পদক, যত স্বীকৃতি, প্রতিমার এসবের প্রতি বিন্দুমাত্র টান ছিল না। স্বামী গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডে সেগুলো সব গুছিয়ে রেখেছিলেন। নইলে বইয়ের ভেতর আমরা যে অভিজ্ঞান পত্র ও অন্যান্য শংসাপত্রের অলোকচিত্র দিয়েছি, আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না।

নিয়মিত মদ্যপান ও ধূমপানের নেশা ছিল প্রতিমার। আমাদের কাছে কি এ খুব আনন্দের সংবাদ? তবু তাঁর জীবন নির্বাহের উপায়টুকু আমাদের খোলা চোখে খোলা মনেই দেখতে হবে। এ বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি খুব পরিষ্কার জবাব দিতেন।

'মদের প্রচলন রাজপরিবারে আগেই ছিল। সম্রাট-বাদশাহদের আমলে তো ছিলই। আমাদের রাজারাজড়াও মদ খেতেন। জেলার বড়-বড় মানুষেরাও। সে সব হল বিখ্যাত মানুষদের কথা। কিন্তু যখন সেই মদ আপামর মানুষের মধ্যে এল, গন্ডগোল বাঁধল তখনই। তারা মদ খেয়ে এসে ঘরে মা-বউয়ের ওপর অত্যাচার করে। That is bad...very bad. আমি এখন নিজের কথায় ফিরে আসি...I am talking about myself, why I drink?... আপনি যদি একটা গাড়ি চালান, তাতে যদি তেল না— দেন, সেটা কি ঠিক হবে? মদ হল আমার এই শরীর নামক ইঞ্জিনটার তেল-মোবিল। আমি যখন মঞ্চে উঠেছি মদ্যপান করেই উঠেছি, কিন্তু কোথাও কোনদিন bad be-have করিনি। বহু শিল্পী, বহু নামকরা শিল্পী আছে ধুবড়িতে, তারা গান গেয়ে ৪০-৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায়, অথচ তাদের টাকাপয়সার কোন অভাব নেই। কিন্তু প্রতিমা বড়ুয়া কী পায়? মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। আমার কি টাকার প্রয়োজন নেই? আমি গেয়ে থাকি, হায় হস্তীর কন্যা রে, খানিক দয়া নাই মাহুতক লাগিয়া রে...। মাহুতের প্রতি হস্তীর কন্যার কোন দয়ামায়া নাই, সেটা তো হতে পারে না। আমার প্রাপ্য টাকা আমি পাব না। সেটা আবার কী নিয়ম? If you are to find out a real artist, you have to know their sentiment. আপনি আমাকে নিয়ে একটা পোগ্রাম করবেন,

ভালো কথা। আপনি আপনার রেঞ্জ জানেন, আমি আমারটা। কিন্তু দু'জনেরই দু'জনার রেঞ্জ জানাটা দরকারি।

আগে বলেছি আমরা, জনসাধারণের দরবারে প্রতিমা বড়ুয়া লোকগান ভিন্ন আর কোনো গান করেননি। শিল্পীর কথায়, 'আমি সারা জীবন প্রচলিত লোকগান সংগ্রহ করেই গেয়েছি। অন্য গান আর গাওয়া হয়নি। গোয়ালপাড়া জেলার গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমান সমাজের মুখে মুখে প্রচলিত লোকগানগুলি সংগ্রহ করে আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছি।'

প্রতিমা সমাজের প্রতি শিল্পীর দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গেও কথা বলেছেন। শিল্পীর দায়বদ্ধতা বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলে বলতেন, 'বর্তমানে প্রায় সমস্ত গায়ক-গায়িকাকেই ধনের প্রতি লালায়িত হতে দেখা যায়। বহু মঞ্চেই আমি গান গেয়েছি, কিন্তু কোথাও সেভাবে কোন টাকা দাবি করিনি। একদিন একজন গায়ক (জনপ্রিয় গায়ক, সঙ্গীত পরিচালক) আমার সঙ্গে একই মঞ্চে গান পরিবেশন করছিলেন, আমার তেমন কোন দাবি ছিলনা। কিন্তু তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার সঙ্গে কত টাকার কনট্রাক্ট আছে।' আমি আশ্চর্য হয়ে পালটা প্রশ্ন করেছিলুম, সংস্কৃতির কি কন্ট্রাক্ট হয়?'

শেষ জীবনে তাঁর টাকা পয়সার সত্যিই টানাটানি ছিল। সরকার থেকে মাসে ১৫০০ টাকা পেতেন। মাস মাইনের মত প্রতি মাসের শেষে পেতেন না। অগোছালো দৈনন্দিন জীবনে খেই হারিয়ে ফেলতেন। দুঃখ করেই তো বলেছিলেন, 'পদ্মশ্রী, সঙ্গীত নাটক আকাদেমির পুরস্কারও পেয়েছি। কত সংবর্ধনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে নেমন্তন্ন। ডি. লিট.। আমি নাকি ড. প্রতিমা বড়ুয়া। আমার পরনের শাড়িখানা দেখ, পেট-ভাতেরই জোগাড় হয়না। ধুবড়ির অনেক নামকরা শিল্পী আছে এককেটা অনুষ্ঠানের জন্য ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা নেয়। আর প্রতিমা বড়ুয়া ৫-হাজার। যার আছে, সে যে অত টাকা নিয়ে কি করিবে কায় জানে।'

তবু দেখেছি আমরা, ব্যক্তিগত দুঃখ তাঁর কাছে সামাজিক দুঃখের চেয়ে কখনও বড় হয়ে দেখা দেয়নি।

প্রঃ আপনার জীবনে কী দুঃখ নেই?

উঃ আমি আমার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট। আমি জানি, এই পৃথিবীতে কোন মানুষ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে না। দুঃখ আমারও আছে—তবে সেটা সাধারণ মানুষের দুঃখ দেখেই বেশি পাই।'

জমিদার তনয়াকে যখন রাজা ও জমিদারদের শোষণ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলতেন, 'রাজা বা জমিদার সব সময়ে শোষণকারীই ছিল না।' ক্লিন চেক তিনি রাজা-জমিদারদের দেননি। তাঁদের শোষণের উপস্থিতি পরোক্ষে মেনে নিয়েছেন। তবে একথাও বলেছেন, নেতা ও মন্ত্রীরাই বা কম যায় কিসে? 'আমাদের কোন মূল্যই নেই। রাজা-জমিদারদের এত সিকিউরিটির প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা অনেকেই ছিলেন খুব

শ্রদ্ধার পাত্র।' পাঠক খেয়াল করুন, তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষ হিসেবেই সম্বোধন করেছেন। লোকগানের প্রসারে তিনি বারবার মন্ত্রীদের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। বলেছেন বহুবার, লোকসংস্কৃতি অবিকৃতভাবে রক্ষার একাট উপযুক্ত কেন্দ্র গড়ে উঠুক। না, তা আজও হয়নি। আক্ষেপ তাঁর কম ছিল নাকি? সুরীতি শর্মা ব্রহ্ম চৌধুরী লিখেছেন, প্রতিমা বড়ুয়া বলছেন একদিন, 'খালি বাজনাদার গুলাকে কিছু একটা দিলেই হইল। এখন তোরা দিদির কথা বুঝবি না। যখন থাকব না, তখন বুঝবি কি বলেছিলাম...।' রেগে গিয়ে বলেছেন, '...আমি একটা সংস্কৃতি কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারি সাহায্য চেয়ে পাই না, কিন্তু মদের দোকান খোলার লাইসেন্স তারা যাকে-তাকে দিয়ে দেয়।'

প্রতিমা যে ঘরে থাকতেন তার জীর্ণ চেহারা দেখে আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলাম। লোকগানের সম্রাজ্ঞীর এই ঠিকানা? 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে অমর পালের কণ্ঠে গীত গানটির কথা মনে পড়ে যায়। ভাল মানুষেরা থাকে সব ভাঙ্গা ঘরে আর খারাপ মানুষগুলো সব সোনার সিংহাসনে চড়ে।

তাঁর ঘুমোনোর ব্যবস্থা আরও বিচিত্র। একটা বেঞ্চি বলাই ভাল। তার উপর মাদুর বিছানো। বালিশে ঘুমোতেন না। গৌরীপুরের মানুষ যখন ভয়ানক শীতে একাধিক কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমোয়, প্রতিমা সেখানে পাতলা একটা চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতেন। দরজা হাট করে খোলা থাকত। স্বামী মাঝে মাঝেই দেখতেন, নানা রকমের সাপ তাঁর শরীর বেয়ে নেমে যেত। তিনি নির্বিকার থাকতেন। উষ্ণ শীতল কোনোরকমের অনুভূতিই হতনা।

যে বাড়িতে থাকতেন, খুব কি প্রিয় বাড়ি ছিল তাঁর? হয়তো ছিল। হয়তো ছিলনা। বহুকালের বাড়ি। একটা নষ্টস্মৃতিতো জড়িয়ে থাকবেই। তবে সন্ধ্যা নামলেই তিনি কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়তেন। পরিচিতদের অনেকবার বলেছেন, 'সন্ধ্যার সময় এই বাড়ি আমার ভাল লাগে না। নিস্তব্ধ। নীরব। রবিঠাকুরের ক্ষুধিত পাষাণের মত। শূন্যতা আমাকে গিলে ফেলে।'

জমিদার বাড়ির অতীত কাহিনির স্মৃতি রোমন্থন করতে প্রতিমা ভালোবাসতেন না। জানতে চাইলে বলতেন, 'মই শিল্পী মানুহ, এই বিলাকর পরা আঁতরি থাকিব খোজো।' আমি শিল্পী মানুষ, আমার এই বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই। বলছেন প্রতিমা বড়ুয়া, 'উনচল্লিশ বছর ধরে আমি গান গাইছি। I believe, I have the folk songs of Goalpara. Till my end I'll sing these songs.'

শুধু কি গোয়ালপাড়িয়া গান? নানা রাজ্যের লোকগান বিষয়েও প্রতিমার ভাল ধারণা ছিল। Inter-state cultural exchange group নিয়ে প্রতিমা জম্মু-কাশ্মীর গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে কাশ্মিরী লোকগান শিখে এসেছিলেন। রাজকাপুর 'বরষাত' ছবিতে সেই লোকগানের সুর বসিয়ে গান করেছিলেন 'হাবা মে উরতা যায়ে মেরে লাল দোপাট্টা মলমল'।

ভূপেন হাজারিকার গান 'গৌরীপুরিয়া গাভরু দেখিলো হাতি ধরিবলৈ গৈ'। এই গানের সুর আর 'ভাল করিয়া বাজনরে দোতরা'র একই সুর। প্রতিমা বড়ুয়া একবার বলেছিলেন (সাক্ষাৎকার : পরান কুমার বর্মণ, 'নন্দিনী'), 'এটা ঠিক যে আমি ভূপেনদার কোনো গান নকল করিনি। কিন্তু ভূপেনদা আমার বহু গানের সুর নকল করে গেয়েছেন।' গৌরীপুরের লোকগানে যে সঙ্গত থাকত, একই সঙ্গত নিয়ে প্রতিমা বড়ুয়া গেয়েছেন, পল রোবসনের বিখ্যাত 'We are on the same boat brother'; এই গান তাঁর এক মোহনীয় সৃষ্টি। না শুনলে অনুভব করা যায় না। কলকাতার রবীন্দ্র সদনে এসে বলেছিলেন, 'দেশী বাজনার সঙ্গে গাইছি, দেখেন, আপনাদের পছন্দ হয় কি না।' তাঁর কাছেই প্রথম শুনি, একই সুরে নাকি একটি ভোজপুরী লোকগীতি রয়েছে।

স্বামী গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডে আমাকে অনেকটা সময় দিয়েছিলেন। প্রতিমার একটা ব্যাগ দেখিয়ে বললেন, এতে কি থাকত জানেন? চুড়ি, চিরুনি, সিগারেট, দেশলাই। কথায় কথায় বড়ুয়া বাড়ির মেয়েদের ছোটবেলার কথা ওঠে এল। সবাই কিশোর বয়স না পেরোতেই শিকারে ওস্তাদ। নিখুঁত নিশানা। নিখুঁত টিপ। বড় বয়সেও সেই নিশানা প্রতিমার চলে যায়নি। একদিন বাড়ির পেছনে একটা গাছের ডালে ছোট্ট একটা সাপ পাখির ছানা খাচ্ছিল। ঘরের দরজা থেকে গুলি করে সাপটাকে মেরে ফেলেছিলেন প্রতিমা। পাখির ছানা বেঁচে গিয়েছিল।

তাঁর প্রিয় জিনিস বলতে কি ছিল? অনেকে হেসেই উড়িয়ে দেবেন। প্রথম প্রিয় জিনিস চুড়ি। দ্বিতীয় প্রিয় জিনিস হাওয়াই চপ্পল। সর্বহারাদের এমন স্বপ্ন থাকতে পারে। রাজকন্যার প্রিয় জিনিস এমনটা হয় কেমন করে? আসলে কি তিনি রাজকন্যা ছিলেন? রক্তের সম্পর্কে ছিলেন। মানুষ হিসেবে ছিলেন না।

প্রয়োজনে তিনি অনেক কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাস। গৌরীপুরে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। সাধারণ মানুষের ঘর বাড়ি ক্ষেত খামার ডুবে গিয়েছে সব। রাজবাড়ির অনেকেই মানুষের ত্রাণকার্যে নেমে পড়েছেন। এক আশ্চর্য ক্ষমতা দেখেছি তখন আমরা শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়ার। ১৯৮৮ সালের বন্যার পর মানুষের ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শিল্পী। জাত-পাত, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ছোটো বড় করে দেখতে তিনি কখনও শেখেননি। সবাই তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছে। সহায়তা পেয়েছে।

শিল্পীর স্বামী জি. এস.-ই বলছিলেন, গৌরীপুরে যখন 'মাহুত বন্ধু রে' ছবির শুটিং হয়েছে, পুরো দলটার দেখাশোনা করার ভার তিনি নিপুণ ভাবে সামলেছেন।

স্বামী গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঝগড়া হলে কখনও, কি নিয়ে ঝগড়া হত? উত্তরে বলেছিলেন তিনি, তেমন ঝগড়া হত না। তবু কখনও হয়ে গেলে বলতেন, 'আমার বুঝি কোন ব্যাটা নেই ভেবেছ? সারা বাংলাদেশ আর অসম জুড়ে আমার ব্যাটারা রয়েছে।'

'হ্যাঁ, সত্যি হয়েছিল সেই কথা। সে চলে যাওয়ার পর দেখেছি। গৌরীপুরের মাঠে দু হাজার আলো জ্বলেছিল সেদিন।'

সম্পদে আসক্তি ছিল না কখনও, বলেছি। মন্ত্রীরা সবাই মাটিয়াবাগের বাড়িতে এসেছেন। একবার হিতেশ্বর সাইকিয়া এলেন। অসমের তিনি মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিমাকে বললেন, 'মেয়েদের কি করলেন? আপনি পদ্মশ্রী। স্বামী প্রিন্সিপাল। কি চাই বলুন?' প্রতিমা বললেন, পরে বলব 'খন।

কিছুক্ষণ পরে প্রতিমা বললেন, তাঁর ছোট বোন পূর্ণিমা বাংলাদেশ থেকে এসেছে। ভিসা চলে গেছে। পুলিশ খবর নিচ্ছে। যদি এই বিষয়টা তিনি ঠিক করে দিতে পারেন।

এই ছিলেন প্রতিমা। প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডে। হাফেজ আলি খাঁ-র কথা শুনেছি। রাষ্ট্রপতি যখন তিনি কি চান জানতে চাইলেন, বললেন খাঁ সাহেব, ওই 'রাগ'টা লোকেরা ঠিকঠাক গাইছে না। আপনি রাষ্ট্রপতি। ফতোয়া জারি করে ঠিক করে দিন।

গোয়ালপাড়িয়া গানের চর্চা এখনও হয়। তবে ধ্রুবতারা না থাকলে একটা বিষাদতো সেখানে কাজ করেই। মেয়ে অলকা ভালোই গোয়ালপাড়িয়া গান করেন। বড় মেয়ে অমৃতা গোয়ালপাড়িয়া নাচ জানেন। তবে বলছিলেন, 'বিশেষ কেউ ডাকে না এখন। কে জানে, আমাদের নাচ আর বোধ হয় কারও ভাল লাগে না।' নিরুত্তর ছিলাম। কি উত্তর দিতে পারি তাঁকে?

প্রবীর বড়ুয়া, প্রতিমার ভাই, যিনি আমাকে গৌরীপুরে যাওয়ার পর দিনরাত সহায়তা করেছেন, তাঁর মেয়ে পুনম ভাল গোয়ালপাড়িয়া গাইছেন। কাগজে প্রশংসা হচ্ছে তাঁর বিষয়ে। সবে সে কলেজে ভর্তি হয়েছে। বাঁচিয়ে রাখুক এই গান, আমরা সবাই মিলেই চাইব।

শেষ যাত্রা

তেজপুরে অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন শিল্পী। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অনেকটাই অসুস্থ। ২১শে ডিসেম্বর ২০০২ ধুবড়ি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হল। দ্রুত অবস্থার অবনতি ঘটছিল। পর দিনই সকাল সাতটায় গুয়াহাটিতে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। ২৪ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চৈতন্য ছিল। ওইদিন বিকেলেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন। গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডে রয়েছেন পাশে। বড় মেয়ে অমৃতা রয়েছেন। ভূপেন হাজারিকা এলেন। তাঁর কাছে গান শুনতে চেয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

বাবা মারা যাওয়ার পর মনটা যে তাঁর ভেঙ্গে পড়েছিল, আমরা অগেই বলেছি। বড় মানুষের আশ্রয়ে ছিলেন। আশ্রয়হীন হয়ে গিয়ে নিজেকে বড় বেশি বেসামাল করে নিয়েছেন। রাজবাড়ির সম্পদে তাঁর কখনও কোনো লোভ ছিল না। বলতেন প্রতিমা, 'দরকারে গাছতলায় থাকব। রাজবাড়িতে একসময় অনেক মোহর ছড়ানো ছেটানো দেখেছি। ওসব থাকল কই?'

২০০২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর সকালে প্রতিমার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। অসমের ঘরে ঘরে সেই বার্তা পৌঁছে যায়। হাজার হাজার মানুষ শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। গুয়াহাটির নিউরোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে প্রতিমার চিকিৎসা চলছিল। সাতষট্টি বছর বয়সে তিনি চলে গেলেন। ভূপেন হাজারিকা তখনই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, 'One of the greatest folk singers of the World'.

কাসেমা খাতুন শিল্পীর সঙ্গে দীর্ঘ আটাশ বছর কাটিয়েছেন। শিল্পীর নানা বায়না সামলেছেন। ঘরের সকল ফাই ফরমাস খেটেছেন। প্রতিমা একটা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসও লিখেছিলেন। 'প্রান্তরের পিয়াসা'। সেই উপন্যাস তিনি কাসেমা খাতুনের হাতে দিয়ে যান। উপন্যাসটি কবে আলোর মুখ দেখবে আমরা জানি না।

গুয়াহাটি থেকে গৌরীপুর শিল্পীর মৃতদেহ নিয়ে আসতে পুরো একটা রাত কেটে যায়। প্রতিটি মোড়ে মোড়ে অসংখ্যা মানুষ বৃষ্টি ভেজা রাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শিল্পীকে একবারের মত দেখবেন। ২৮শে ডিসেম্বর সকাল আটটায় গৌরীপুরে শিল্পীর মৃতদেহ পৌঁছায়। বিকেল চারটের সময় স্বামী গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডে মুখাগ্নি করেন। নশ্বর দেহ পুড়ে যায়। যখন তাঁর দেহ পুড়ছিল, কয়েকশো মানুষ দোতারা নিয়ে একসাথে সুর ধরে। এইতো শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর যথার্থ উপায়।

লোকগানের ব্যতিক্রমী শিল্পী বললে তাঁকে কম বলা হয়। গানের বিকৃতির বিরুদ্ধে বারবার কথা বলেছেন। এসময়ের নাগরিক জীবনের শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। লোকগানের বিকৃতি তাঁর নজর এড়িয়ে যায়নি। তিনি তাই গান বেঁধেছিলেন এমন,

যার কয়েকটি লাইন,

ডালে শোভে পেলাস্‌টিকের ফুল মনোহর
কেউ দেখে না কখন গাছে শুকায় শিকড়।
বিলাপে বিফল আজ চোখের জলও বাসি
তাই মনের কথা বলি গানে মুখে ফোটাই হাসি।
নকলে কলকাঠি নাড়ে আসল কয় 'গেলাম'
কেউ করে কাম কেউ করে ইনকাম

যাঁরা শিল্পীদের সঙ্গে শেষদিন পর্যন্ত সঙ্গত করেছেন তাঁদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। মাটিয়াবাগের বাড়িতে তাঁরা এসেছেন। পুনমের গানের সঙ্গে বাজিয়েছেন। তখন বলেছিলাম, দিদির কথা কিছু বলুন। বলেছেন সবাই টুকরো টুকরো কথা। স্মৃতি থেকে বলেছেন। কেউ অনুষ্ঠানের বায়না দিতে এলে প্রতিমা সবটুকু টাকা সঙ্গতকারদের হাতে আগে তুলে দিতেন। নিজে কখনও আগে নিতেন না।

অসমের সবকটি জেলায় তাঁকে নিয়ে স্মরণসভা হয়েছে। কলকাতায় 'ভ্রমরা' ও 'ভারতীয় যাদুঘর' ২০০৩ সালের ২৫ শে জানুয়ারি এক স্মরণসন্ধ্যার আয়োজন করেছিল। সেখানে শিল্পীর প্রতি গান ও কথার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন অনেকেই। অমর পাল, পূর্ণচন্দ্র দাস, বিষ্ণুপদ দাস, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, নীরেন্দু চৌধুরী, গীতা চৌধুরী, সুখবিলাস বর্মা, স্বপন বসু, তপন রায়, অভিজিৎ বসু, কণা ভদ্র, অমিত গুহ, তপন রায় প্রধান, পূরবী মুখোপাধ্যায়, নজমুল হক, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিক, রমেন সাহা এবং ভ্রমরা'র শিল্পীগোষ্ঠী।

শিল্পীর সঙ্গে যাঁরা সঙ্গত করেছেন

দোতারা বাদক : করিতুল্লা, মৃণাল বড়ুয়া, ভবেন রায় বয়ান, রঞ্জিত মণ্ডল, বিনয় সরকার, অভিজিত সরকার, অমরেন্দ্র রায়, বীরেন রায়, সুধীর রায়, মৃদুল সিংহ, শ্রীকান্ত বিশ্বাস

ঢোল বাদক : বসন্ত মালি, তারাপদ মালি, বিমল মালি।

খোল : শিবেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল, রবীন্দ্র অধিকারী

বেহালা : বিনয় সরকার

সারিন্দা : সীতানাথ রায়, বিনয় সরকার

বাঁশি বাদক : হিমাংশু বিশ্বাস, বাণীকান্ত রায়, চন্দ্রকান্ত নন্দী

গানের সঙ্গে যাঁরা গোয়ালপাড়িয়া নাচতেন

প্রথম পর্যায়—প্রতিভা বড়ুয়া, পূর্ণিমা বড়ুয়া, বিজয়া বড়ুয়া, নন্দিতা অধিকারী, স্বপ্না মিত্র, গীতা দেববর্মন, অনামিকা মণ্ডল, মঞ্জুলিকা মণ্ডল, প্রতিমা মিত্র, দেবযানী বড়ুয়া।

দ্বিতীয় পর্যায়—অপর্ণা অধিকারী, পরি মণ্ডল, ছায়া বড়ুয়া, ইভা বড়ুয়া, কৃষ্ণা বড়ুয়া, বাৎসামণি মণ্ডল, বাৎসামণি চক্রবর্তী, দিলশাহী বড়ুয়া, পার্বতী বড়ুয়া দাস, কণিকা অধিকারী, প্রণতি বড়ুয়া, ফুকন, পূর্ণিমা বড়ুয়া, কুন্তলা বড়ুয়া, সাধনা বড়ুয়া, অনিমা রায়, সুমিতা বড়ুয়া, মালবিকা চাংকাকতি।

বর্তমান পর্যায়—মুন্‌কু অধিকারী, বুলু দাস, পুতুল সরকার, মঞ্জু রায়, রীতা মালি, মনোমিতা রায়, মধুছন্দা রায়, সজিনা বিবি, তুলতুলী, বুল্লি বিবি, মেহের নাগা বিবি, অনীতা বড়ুয়া, অমৃতা পাণ্ডে, অলকা পাণ্ডে।

কখন কোথায় অনুষ্ঠান হবে এসব বিষয়ের যিনি দেখাশুনা করতেন তিনি তাঁর সঙ্গতকারীদেরই একজন ছিলেন। শ্রীকান্ত বিশ্বাস।

বাবুলচন্দ্র রায়, যিনি দিদির সঙ্গে মাঝে মাঝে বাজিয়েছেন, দিদির প্রয়াণে একটি গান রচনা করেছেন। মাটিয়াবাগের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় সেই গান শুনেছি। সঙ্গতে ছিলেন বিমল মালি। এই গান যেমন প্রতিমার নিজের মানুষদের শ্রদ্ধার গান, আমরাও সেই গানেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধ নিবেদন করলাম।

প্রতিমার মধুসুরের গান
ইতিহাসের সোনার খাতাত লেখা থাকিল্ নাম
প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডের নাম

অন্ধকারের কলা
পোহরত আনিলু
ও তুই সাজালু পারালু
সাজে পারে বিশ্ব মাঝে পরিচয় করালু
ও তুই সুনাম যে নেওয়ালু
আজি ধন্য হইল্ আমার কলা কৃষ্টি
জগত মাঝারে
রে মানুষের সমাজে
প্রণাম জানাই সবাই আমরা
তোমার চরণে
শিল্পী তোমার চরণে
বসন্তকালে কোকিল আইসে

কয় যে কত গান
গায় সুখ দুঃখের গান
বসন্ত ফুরিয়া গেইলে
দেখায় পাওয়ায় টান
কোকিলাকে দেখায় পাওয়ায় টান।

আজি ওই মতন করি তুইও গেলুরে
আমাকো ছাড়িয়া
ও তুই সগাকে কান্দিয়া
(কোন বসন্তত আসপু ঘুরি কলুনা খুলিয়া, আমাক্ কলুনা খুলিয়া) (৩)

কথা : বাবুলচন্দ্র রায় সুর : প্রচলিত (মিশ্র)

সাক্ষাৎকার

প্রতিমা বড়ুয়া'র সাক্ষাৎকার
অ জীবন রে ছাড়িয়া না যাইছ মোকে

গৌরীপুর। অসমের পশ্চিম প্রান্তে ধুবড়ি শহরের কাছে পুরনো কোচরাজ্যের রাজধানী। ধর্মপ্রাণ, ক্রীড়া এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক রাজপরিবারের বাসস্থান। মহারাজ নরনারায়ণের মৃত্যুর পর প্রাচীন কোচরাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়। সোনকোশ নদীর (বর্তমানে গদাধর) পাড় থেকে হাজো পর্যন্ত এই রাজ্যে মহারাজ নরনারায়ণের ভাই চিলা রায়ের উত্তরপুরুষেরা রাজত্ব করেছিল। হিমালয়ের একটি প্রশাখা রাঙামাটি পাহাড়ের কাছে পুরনো গৌরীপুর শহরে ছিল সেই রাজবংশের রাজধানী। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা প্রতাপচন্দ্রই রাঙামাটি থেকে বর্তমান গৌরীপুর শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইতোমধ্যে পূর্ব ভারতে ইংরাজ-শাসনে রাজপরিবারের প্রাধান্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং জমিদারি প্রথার প্রবর্তন হয়। প্রতাপচন্দ্রের পুত্র প্রভাতচন্দ্রের সময়ে জমিদারি প্রথার পূর্ণ প্রচলন ছিল। ১৯৫৫ সালের সরকার আইন করে জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটানোর ফলে রাজপরিবারের সচ্ছলতা হ্রাস পায়। রাজকীয় স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে রাজপরিবারের সদস্যরা জীবিকার তাড়নায় বিভিন্ন বৃত্তিতে জড়িয়ে পড়লেও তাদের রক্তে প্রবহমান জাত্যভিমান ত্যাগ করতে পারেননি।

প্রভাতচন্দ্রের প্রথম পুত্র প্রমথেশ বড়ুয়া কলকাতায় গিয়ে চলচ্চিত্রে মনোনিবেশ করেন। আরেক পুত্র প্রকৃতীশ বড়ুয়া (সর্বসাধারণ তাঁকে 'লালজী' বলেই জানে) অবশিষ্ট রাজকীয়তা আঁকড়ে থেকে গেলেন। এই প্রকৃতীশ বড়ুয়ার কন্যা আমাদের অতি আদরের, গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করা এবং জীবিতকালেই কিংবদন্তীতে পরিণত হওয়া শিল্পী প্রতিমা পাণ্ডে বড়ুয়া।

গুয়াহাটি থেকে ৩১ নং জাতীয় সড়কে ২৭৫ কিমি গেলেই পাওয়া যায় গৌরীপুর শহর। শহরটিতে পৌঁছনোর আগেই মাটিয়াবাগ নামের একজায়গায় একটা ছোট্ট পথের ধারে ছোট্ট এক টিলার ওপরে দেখতে পাওয়া যায় আকাশের দিকে সগর্বে মুখ তুলে থাকা প্রাচীন ঐতিহ্যবহনকারী দালানটিকে।

প্রাসাদের পূর্বদিকের একটা কোণে কতকগুলি ঘর, প্রতিমাদি আর তাঁর স্বামী জি এস পাণ্ডে সেখানে থাকেন। শ্রীযুক্ত পাণ্ডে স্থানীয় গৌরীপুর মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ।

প্রতিমা বড়ুয়া সম্বন্ধে তাঁর স্বামীর বক্তব্য — সমাজে রাজপরিবারের প্রাধান্য সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও এঁদের মন থেকে অহমিকাবোধ আর উচ্চবংশীয় ধারণার কোন

পরিবর্তন হল না। পোশাক-পরিচ্ছদে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোন পার্থক্য না-থাকলেও তাদের সঙ্গে মেলামেশা এঁদের নিয়মের বাইরে ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রক্তে প্রবাহিত ঔদ্ধত্যের কারণে প্রতিমা বড়ুয়াও ছিলেন বেপরোয়া স্বভাবের। পরিবারের পুরুষদের থেকেও তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা। চাষি-মজুর ও সাধারণ মানুষের মুখে-মুখে প্রচলিত গান সংগ্রহ করে সেই গান গাওয়ার দুর্বার বাসনাই তাঁকে এই সমস্ত সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

পরিবারের অন্য সদস্যরা সাধারণ স্তরের মানুষদের সঙ্গে হেথাহোথা ঘুরে-বেড়ানো একটা মেয়ের এই স্বভাবকে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু তাঁর পিতা প্রকৃতীশ বড়ুয়া কখনই তাঁকে নিরুৎসাহিত করেননি। পিতার উৎসাহেই এক অসীম সাহসী মনের মেয়ে হয়ে উঠেছিলেন প্রতিমাদেবী। যুবতী বয়সে হাতি ধরতে যাওয়া বা শিকারিবেশে বাঘ ও অন্যান্য পশুশিকারে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। হাতি-মাহুতের মুখের গান প্রতিমাদেবীর জীবনে সব সময়েই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। এই কারণেই তাঁর একটা জনপ্রিয় নাম হল 'হস্তীর কন্যা'।

রাজপরিবারের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন পদ্ধতি তাঁকেও ছুঁয়ে গেছে। মদ্যপান এবং ধূমপানের অভ্যাস জীবনের প্রথমদিকে শুরু করে আজও তা ছাড়তে পারেননি। ধনদৌলতের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি না থাকার ফলে আজ তিনি দারিদ্র্যপীড়িত জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। অবশ্য এ জন্য তাঁর কোন আক্ষেপ নেই। প্রতিমাদেবীর অর্জিত সমস্ত সম্মানফলক, এমনকী পদ্মশ্রীর ফলকও ঘরের কোণে পড়ে থাকে। সেগুলিকে সযত্নে তুলে রেখেছেন তাঁর স্বামী।

প্রতিমাদেবীর বিবাহের কাহিনিও গতানুগতিক নয়। তাঁর স্বামী জি এস পাণ্ডে উত্তরপ্রদেশ থেকে চাকরির সন্ধানে অসমে আসা এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের লোক। অজানা-অচেনা এক উত্তরপ্রদেশীয় মানুষের সাথে বিবাহের ব্যাপারে প্রকৃতীশ বড়ুয়া একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিমাদির বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। প্রতিমাদির স্বভাবে থেকে গেছে ক্ষয়িষ্ণু রাজকীয় অহমিকা, অন্যদিকে স্বামী থেকে গেছেন তাঁর আজন্মলালিত রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে। ব্যক্তিত্বের এই বৈপরীত্য দু'জনকে দু'জনের থেকে দূরত্বে নিয়ে গেলেও এখনও স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একঘরে আপন ইচ্ছানুসারে স্বাধীন জীবনযাপন করে চলেছেন।

প্রশ্ন : আপনার জীবনের কোন অবিস্মরণীয় ঘটনার বিষয়ে আমাকে কিছু বলবেন কি?

প্রতিমা বড়ুয়া : আমি ১৮-১৯ বছর বয়সে নিজের হাতে ছ'টা চিতাবাঘ আর একটা ডোরাকাটা বাঘকে গুলি করে মেরেছি। সে সবই আমার জীবনের সত্যিকারের অবিস্মরণীয় আর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

প্র : আপনার জীবনের যে-সময় চলে গেছে, তা নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট? আপনার

জীবনে কি দুঃখ নেই? প্রকৃত সুখ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

উ : আমি আমার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট। আমি জানি, এই পৃথিবীতে কোন মানুষই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে না। দুঃখ আমারও আছে — তবে সেটা সাধারণ মানুষের দুঃখ দেখেই বেশি পাই।

প্র : নারীর সৌন্দর্যের সংজ্ঞা আপনি কীভাবে দিতে চান?

উ : লোকগীতির ভাষাতেই বলি — যখন ছিলাম আমের আমসি/তখন ছিলাম কথার মান্‌সী/এখন সুকিয়া হৈছে বয়স চুনা/এখন হৈছি সবাইরে কথা শুনা।

যতদিন আমি যুবতী ছিলাম আমার চারপাশে বহু মানুষ ছিল। আর আজ এতখানি বয়স হল, এখন কেবল মানুষের কটুকথাই শুনি।

প্র : প্রেম সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? প্রেম আপনার জীবনে কীভাবে এসেছিল?

উ : প্রেম কী? আপনি আমাকে ভালোবাসেন, অসমের মানুষ আমাকে ভালোবাসে, সেটাই তো প্রেম। মা ও বাবার সঙ্গ-সাহচর্যেই আমার মনে প্রথম প্রেমের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছিল। ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে সকলেই নিজের-নিজের সংসার নিয়ে ভিন্ন হয়ে গেলেও মা-বাবা তো তা পারে না। অক্ষুণ্ণ থাকে সেই প্রেম।

প্র : আর দাম্পত্য প্রেম? আপনাদের মধ্যে ছিল না নাকি?

উ : ছিল। কিন্তু আমার আর স্বামীর মধ্যে একটা মতভেদ সর্বদাই থেকে গেল। খাদ্যাভ্যাস বা চিন্তার পার্থক্য — এসবকে ঠিক মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু তাঁকে আমি এ কারণেই ধন্যবাদ দিই যে আমার মতো এরকম একজন আইনকানুন না-মানা বেপরোয়া মানুষের সঙ্গেই তবু জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। আমার মতো মানুষকে ট্যাক্‌ল করা বড় মুশকিল।

প্র : এই 'আইন না-মানা'র গুণটা আপনার ভিতরে কীভাবে এল?

উ : আমার রক্তের মধ্যেই ছিল অন্যের শাসন স্বীকার না-করার গুণ।

প্র : কিন্তু পতি-পত্নী হিসেবে আপনাদের সম্পর্কটা কী ধরনের ছিল?

উ : আমাদের সম্পর্ক ছিল most artificial. I am a girl from Gouripur, not a girl, but a woman. He is a man from UP — মেলানোর চেষ্টা করেও মেলাতে পারিনি। এটা সংস্কৃতির পার্থক্য। তিনি ধূমপান বা মদ্যপানের বাইরে থাকেন, নিরামিষ খান, আমি আমিষ খাই। Still I respect him very much. I adore him till now.

প্র : আপনাদের বিবাহ কে অ্যারেঞ্জ করেছিল?

উ : কেউ করেনি। নিজে-নিজেই হয়েছে। আজকালকার বিয়ে আবার অ্যারেঞ্জ করে করতে হয় নাকি?

প্র : অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে আপনাদের ভিতর প্রেমের উদয় হয়েছিল?

উ : না হে, সেরকমও নয়। ১৯৬৬ সালে অনেকে এসেছিলেন গৌরীপুর কলেজে। Most decent সব মানুষজন। Very disciplined, very cultured – not cultured, rather educated – এখন এই এডুকেটেড এবং কালচার্ড মানুষের ভিতর প্রচুর পার্থক্য থাকে। একজন নগণ্য মানুষও যেমন কালচার্ড হতে পারে, তেমনি ঠিক তার উলটোটাও হয়। তিনি আমার জীবনে এলেন — আমি তাঁকে অবমাননা করতে পারিনি। একটা সম্পর্ক হল। মানুষের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ— এ সব একেবারে অনিশ্চিত। যা হওয়া উচিত হয়, হয় তার উলটো।

প্র : তাহলে, বিবাহের ক্ষেত্রে আপনার কোন আক্ষেপ থেকে গেল নাকি?

উ: না-না, কোন আক্ষেপ নেই। আমি জানি, যা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে। I have to accept it. It is a question of adjustment. আমি যে-পরিবার থেকে এসেছি, তাতে এই অ্যাডজাস্টমেন্ট একেবারে মজ্জায়-মজ্জায় রয়ে গেছে। আমি এই যে-ছেঁড়া শাড়িটা পরে আছি, তাকে তো আমায় গ্রহণ করতেই হয়।

প্র : এই যে আপনার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, মদ্যপানের অভ্যাস, সেটা কীভাবে আরম্ভ হল? মদের প্রতি আপনি কীভাবে আকৃষ্ট হলেন?

উ : মদের প্রচলন রাজপরিবারে আগেই ছিল। সম্রাট-বাদশাহদের আমলে তো ছিলই। আমাদের রাজারাজড়ারাও মদ খেতেন। জেলার বড়-বড় মানুষেরাও। সে সব হল বিখ্যাত মানুষদের কথা। কিন্তু যখন সেই মদ আপামর মানুষের মধ্যে এল, গণ্ডগোল বাঁধল তখনই। তারা মদ খেয়ে এসে ঘরে মা-বউয়ের ওপর অত্যাচার করে। That is bad....very bad. আমি এখন নিজের কথায় ফিরে আসি...I am talking about myself, why I drink?...আপনি যদি একটা গাড়ি চালান, তাতে যদি তেল-মোবিল না-দেন, সেটা কি ঠিক হবে? মদ হল আমার এই শরীর নামক ইঞ্জিনটার তেল-মোবিল। আমি যখন মঞ্চে উঠেছি মদ্যপান করেই উঠেছি, কিন্তু কোথাও কোনদিন bad behave করিনি। বহু শিল্পী, বহু নামকরা শিল্পী আছে ধুবড়িতে। তারা গান গেয়ে ৪০-৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায়, অথচ তাদের টাকাপয়সার কোন অভাব নেই। কিন্তু প্রতিমা বড়ুয়া কী পায়? মাত্র পাঁচ হাজার টাকা? আমার কি টাকার প্রয়োজন নেই? আমি গেয়ে থাকি, হায় হস্তীর কন্যা রে, খানিক দয়া নাই মাহুতক লাগিয়া রে...। মাহুতের প্রতি হস্তীর কন্যার কোন দয়ামায়া নাই; সেটা তো হতে পারে না। আমার প্রাপ্য টাকা আমি পাব না, সেটা আবার কী নিয়ম? If you are to find out a real artist, you have to know their sentiment. আপনি আমাকে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করবেন, ভালো কথা। আপনি আপনার রেঞ্জ জানেন, আমি আমারটা। কিন্তু দু'জনেরই দু'জনার রেঞ্জ জানাটা দরকারি।

প্র : আপনি কি সারা জীবন প্রচলিত লোকগীতিই গাইলেন, নাকি স্বরচিত অথবা অপরের রচিত গানও গেয়েছেন?

উ : আমি সারা জীবন প্রচলিত লোকগান সংগ্রহ করেই গেয়েছি। অন্য গান আর

গাওয়া হয়নি। গোয়ালপাড়া জেলার গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমান সমাজের মুখে-মুখে প্রচলিত লোকগানগুলি সংগ্রহ করে আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছি। সেই গানগুলিই আরও জনপ্রিয় করার জন্য আমি নানা মঞ্চে গেয়েছি—

একবার হরি বোল মন রসনা
মানবদেহের গৌরব কৈরহ না...
বা,
দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে
রঙ্গিলা দালানের মাটি
গোঁসাইজী কোন রঙে.....

এ ধরনের গান ঠিক একেবারে গোয়ালপাড়িয়া গান নয়। গোয়ালপাড়িয়া গান বলতে বোঝায় — গানগুলির অর্ধেক গোয়ালপাড়ার, অর্ধেক কামরূপের। আমার অধিকাংশ গানই গৌরীপুর অঞ্চলের আশপাশের গ্রামগুলি থেকে সংগৃহীত।

প্র : আপনি গানের কথা বেশি ভালোবাসেন, না তার সুর?

উ : গানের কথাই আমাকে বেশি আকর্ষণ করে। তেমনি সুরও ভালোবাসি। সুর না থাকলে আর গান হবে কেমন করে? আমাদের লোকগীতিতে প্রকাশিত মানবিক অনুভূতি আর কোথাও তেমন করে পাওয়া যায় না।

প্র : আপনার গাওয়া লোকগীতির অধিকাংশই দেহতত্ত্ব বিচার নিয়ে। মানুষের শোকের অনুভূতি প্রকট হয়েছে যে-গানে, সেই গানই আপনার অধিক প্রিয় নাকি?

উ : যাতে মানুষের দুঃখ ও হাসিকান্নার ভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে, আমি সেই গানই ভালোবাসি। সাধারণ মানুষের আনন্দপ্রকাশের গানও আমার প্রিয়।

প্র : গায়ক-গায়িকার সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উ : বর্তমানে প্রায় সমস্ত গায়ক-গায়িকাকেই ধনের প্রতি লালায়িত হতে দেখা যায়। বহু মঞ্চেই আমি গান গেয়েছি, কিন্তু কোথাও সেভাবে কোন টাকা দাবি করিনি। একদিন একজন গায়ক (জনপ্রিয় গায়ক, সঙ্গীত-পরিচালক) আমার সঙ্গে একই মঞ্চে গান পরিবেশন করছিলেন, আমার তেমন কোন দাবি ছিল না। কিন্তু তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার সঙ্গে কত টাকার কনট্রাক্ট আছে।' আমি আশ্চর্য হয়ে পালটা প্রশ্ন করেছিলুম, 'সংস্কৃতির কি কন্ট্রাক্ট হয়?'

প্র : শ্রদ্ধেয় ভূপেন হাজারিকার 'গৌরীপুরীয়া গাভরু দেখিল হাতি ধরিবলৈ গৈ'— অনেকের ধারণা এই গানটি আপনাকে কেন্দ্র করেই রচিত? গদাধর নদী এবং রাজপরিবারের হাতির মহলের উল্লেখ দেখে এই ধারণা আরও প্রবল হয়। আপনি কী বলেন?

উ : ভূপেন হাজারিকা একজন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। মিউজিক কম্পোজার, মিউজিক মেকার—তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আমার সঙ্গীত জীবনে তার প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু এই গান কাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল, সেটা আমি জানি না। বয়সে তিনি আমার থেকে অনেক বড়। কিন্তু এ কথাটা নিশ্চই ভালোভাবে জানো যে গানটির সুর আমারই গাওয়া একটা লোকগানের একেবারে কার্বন কপি — ভালো করিয়া বাজান রে দোতারা, কমলা সুন্দরী নাচে। এটা ঠিক যে আমি কোনদিন ভূপেনদার গানের নকল করিনি, কিন্তু তিনি আমার গাওয়া অনেক গানের সুরে নিজের গান গেয়েছেন। তবু তিনি আমার অতি শ্রদ্ধার প্রিয় শিল্পী।

তাঁর 'বহাগ মাথোঁ এটি ঋতু নহয়—বিমূর্ত মোর নিশাটি যেন'— আমার বড় প্রিয় গান।

প্র : আপনি জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা এবং বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার ব্যক্তিগত সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন কি?

উ : জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা আমার সময়ে ছিলেন না। কিন্তু বিষ্ণুদাকে আমি অতি ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছি। মাহুত বন্ধু রে'র শ্যুটিঙের সময় তিনি আমার এখানে ছিলেন। খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি আমার অটোগ্রাফের খাতায় লিখেছিলেন, 'প্রতিমা, তোমার গানের নাই উপমা।'

কিন্তু আমি যে আজ এতখানি স্বীকৃতি পেয়েছি, তার মূলে আছেন আমার বাবা। তাঁরই উৎসাহে আমি গ্রামে গঞ্জে মহিষচরার গান, হাতি-মাহুতের গান, হালোয়ার গান, রুবনি দারনির গান ইত্যাদি গেয়ে বেড়াচ্ছি দেখেই লোকে এ সব গানকে গোয়ালপাড়িয়া গীত আখ্যা দিল। নাহলে গোয়ালপাড়িয়া গীত বলে আজ কিছু থাকতই না।

প্র : আপনার গাওয়া গানগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় গান কোন্‌টি?

উ : প্রতিটি গানই আমার প্রিয়। বিশেষ কোন গানকে প্রিয় বলতে পারব না।

প্র : দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে রঙিলা দালানের মাটি—গানটির কথাগুলি যেন মনে হয় রাজপরিবারের প্রতি বক্রোক্তিপ্রসূত?

উ : তা নয়। এই গানও আমি গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলাম। এটি প্রকৃতপক্ষে দেহতত্ত্বের গান হে। দিনে দিনে ক্ষয় হয়...আহা...জীবন নিয়ে রচিত এই গান...রাজবাড়ি নিয়ে নয়।

প্র : রাজা বা জমিদার সব সময়ে প্রজাদের শোষণ করেই এসেছে বলে সকলে জানে। আপনি সাধারণ মানুষের গানেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, তাই বলছি, আপনার মনের ভিতর কি শোষণকারী জমিদারদের ওপর ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়েছিল?

উ : না। রাজা বা জমিদার সব সময়ে শোষণকারীই ছিল না। অন্তত আজকের মন্ত্রী বা আমলাদের থেকে তারা কম শোষণ করত। তখন দয়া, মায়া, ক্ষমা—এসবের

অস্তিত্ব ছিল। এখন আর সে সব নেই। নেতা বা মন্ত্রীদের এখন রাজ্যের মানুষদের থেকে বহু দূরে অবস্থান। কোন সুবিচার তাদের কাছে তুমি পাবে না। শুধু তাদের জীবনই যেন মহামূল্যবান...সময়ও এখন তাদেরই পক্ষে। আমাদের কোন মূল্যই নেই। রাজা-জমিদারদের এত সিকিউরিটির প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা অনেকেই ছিলেন খুব শ্রদ্ধার পাত্র।

প্র : বর্তমানকালের যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেড়ে ওঠা উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয়ে আপনার মতামত?

উ : তাদের মধ্যে বেড়ে-ওঠা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য এই সমাজই দায়ী। পড়াশোনা করা কত যুবক কোন চাকরি পায় না, বিদ্রোহ তো তারা করবেই। তাদের জন্য কিছু করার কেউ নেই, কারও সাপোর্ট নেই, দেশ চতুর্দিকে দুর্নীতিতে ভরে আছে। কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে। সে জন্যই তারা খারাপ পথে চলছে।

প্র : আপনি কী ভাবেন? এক্ষেত্রে বাবা-মায়ের কোন দায়িত্ব নেই?

উ : মা-বাবাই তো তাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু কোন কিছুতে সংস্থাপন তো করতে পারেননি। মা-বাবা এর বেশি আর কী করতে পারেন? আরও একটা কথা— আজ আমি একটা সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র খোলার জন্য সরকারি সাহায্য চেয়ে পাই না, কিন্তু মদের দোকান খোলার লাইসেন্স তারা যাকে-তাকে দিয়ে দেয়। এটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

প্র : আপনি যে-সংস্কৃতিচর্চা-র কেন্দ্রের কথা বললেন, তার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন?

উ : একবার নয়, বারবার করেছি। কিন্তু কেউ গুরুত্ব দেয়নি। আমার এ দুঃখটা থেকেই গেল। পারো যদি তোমরা রাজ্যবাসী বা সরকারকে বলো। আমি রাজঘরানার মেয়ে। আমি দিতে জানি। কিন্তু অপরের থেকে চাইতে পারব না। অথচ আমার বর্তমান অবস্থাই আমাকে চাইতে বাধ্য করছে। তবু চেয়ে পাইনি। আমার এই ঘরেই বহু মন্ত্রী এসেছেন। জমিদারি বিলুপ্ত হওয়ার পর মহলটির অবস্থা সকলেই দেখেছে। মন্ত্রীদের সকলকেই বহুবার এর পুরনো ঐতিহ্যরক্ষার জন্য বলেছি। অনুরোধ করেছি। সকলেই প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু সবই ঐ বুদ্‌বুদের ফেনা। কাজে কিছুই নয়।

প্র : আপনি তো জীবনে অনেক সম্মান, অনেক পদক লাভ করেছেন, তার মধ্যে কোন্ সম্মানকে আপনি সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ বলে মনে করেন?

উ : সবচেয়ে বড় সম্মান হল অসমের মানুষের দেওয়া ভালোবাসা আর স্বীকৃতি। ভারত সরকার আমাকে কী বা দিয়েছে? কতরকম অ্যাওয়ার্ড! অ্যাওয়ার্ড তো কতজনেই দিয়ে থাকে। কিন্তু আমি যখন মঞ্চে গান গাই, তখন এ রাজ্যের শ্রোতা যত উৎসাহ আর যত ভালোবাসা আমাকে দিয়েছে, আমার কাছে তার চেয়ে আর কোন পুরস্কারই বড় নয়।

প্র : পদ্মশ্রী সম্মানের সঙ্গেও কি তার তুলনা চলে না?

উ : না। কখনও নয়। পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড আজ একজন, কাল আরেকজন, এ ভাবে মানুষ বিচার করে দেওয়া হয়। এর থেকে আমার কাছে অত্যন্ত মহত্তর পুরস্কার হল সঙ্গীত নাটক আকাদেমির পুরস্কার। এটি সংস্কৃতির প্রতি সম্মান জানানোর পুরস্কার। ডিব্রুগড় লেডিজ ক্লাব আমাকে 'সতী জয়মতী' পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল। সেই আপ্যায়নে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আনন্দে আমি এই বয়সেও একুশটা গান গেয়েছিলাম। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে দিয়েছে ডি লিট। যথেষ্ট সম্মান আর আদর-আতিথ্য পেয়েছি। আমি তো ডি লিটের অর্থই জানতাম না। ভগ্নীপতি বুঝিয়ে দিয়েছিল—'নামের আগে ড. লিখতে পারবে, কিন্তু আমি লিখিনি।' এখন আমার জীবিকার সমস্যাই গুরুতর সমস্যা। শিল্পী-পেনসনের নামে যতটুকু অর্থ পাই, তাতে আমার পেট-ভাতেরই যোগাড় হয় না, সংসারই চলে না। তবু আমি গান গেয়ে চলি। আপনাদের আশীর্বাদে ২০০০ সালে আমি যত প্রোগ্রাম করেছি, আমার কাছে সেটা রেকর্ড। গানই গেয়ে যাব। কেননা গোয়ালপাড়ার গানকে আমি ভালোবাসি। ভূপেনদা বলেছেন, প্রতিমা, The day you die, the folk songs of Goalpara will die with you. আমি সেই থেকে জাতি-ধর্ম ভাষা নির্বিচারে যে-ই ডাক দেয়, সেখানেই গান গেয়ে আসি, গেয়ে যাই, গেয়েই যাব জীবনের এই গান।

অ জীবন রে ছাড়িয়া না যাইছ মোকে
তুই জীবন ছাড়িয়ে গেইলে
আদর কইরবে কাহায় জীবন রে?

প্রতিমা বড়ুয়ার মনের কথা
সাধারণ মানুষের দুঃখযন্ত্রণাই আমার গানের বিষয়
কুলেন্দ্র চৌধুরী

অসমের প্রথিতযশা শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ একটি নাম প্রতিমা বড়ুয়া। গোয়ালপাড়ার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এই শিল্পীর অগ্রণী ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত।

এরকম একজন বিশিষ্ট ও মহান শিল্পীর সাক্ষাৎকার নেবার উদ্দেশ্য নিয়ে পৌঁছলাম গৌরীপুরে, শিল্পীর বাড়িতে। শিল্পী নিজে আমাকে সস্নেহে ভেতরে ডেকে নিলেন। আসার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতেই হাসিমুখে রাজি হয়ে গেলেন।

কুলেন্দ্র চৌধুরী : কবে থেকে আপনি সঙ্গীত পরিবেশন করতে শুরু করেছিলেন?

প্রতিমা বড়ুয়া : সেটা ১৯৫৭ সালের কথা। আমরা তখন শিলং-এ থাকতাম। বাবা বিধায়ক ছিলেন। সে সময় বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন দেবকান্ত বরুয়া। ওঁরা সবাই মিলে শিলং-এ বিহু'র আয়োজন করতেন। শিলং-এ সেই বিহুর মঞ্চে আমি প্রথম গান গাই। সেই আমার প্রথম মঞ্চে গান গাওয়া, শুরু আমার শিল্পীজীবনের।

প্র : সঙ্গীতসাধনার শুরুতে আপনাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল কে?

উ : আগের থেকেই আমাদের বাড়িতে গানের চর্চা ছিল। সন্ধ্যায় বাড়িতে গানের আসর বসত। আমার বাবাই ছিলেন প্রধান আয়োজক। সেখান থেকেই আমি প্রথম অনুপ্রেরণা পাই।

প্র : আপনার গানের প্রধান বিষয়বস্তু কী?

উ : সাধারণ মানুষের কষ্টকর জীবনকে সাধারণত অনেক শিল্পীই লক্ষ করে দেখেন না। এই সব মানুষ যে কত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে — সে বিষয়ে ঐ শিল্পীরা উদাসীন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাই আমার গানের প্রধান বিষয়বস্তু। সাথে-সাথে গোয়ালপাড়ার লোক-সংস্কৃতিও আমার গানের অন্যতম বিষয়।

প্র : শিল্পী হিসেবে ড. ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?

উ : ভূপেনদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় '৫৭ সালে। অসমীয়া একটি ছবিতে আমাকে দিয়ে উনি প্রথম একটি গান গাইয়েছিলেন। এরপর 'মাহুত বন্ধু রে' ছবির সব ক'টি লোকগীতি ভূপেনদা আমাকে দিয়ে গাইয়েছিলেন। সর্বদা ওঁর উপদেশ আমি পেয়ে এসেছি। প্রয়োজনে উনি আমাকে নানান সহায়তা করে থাকেন।

প্র : স্বামীর কাছ থেকে কীরকম অনুপ্রেরণা আপনি পেয়েছেন?

উ : আমার স্বামীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সমাজে আজ আমার যেটুকু জনপ্রিয়তা, তা ওঁর জন্যই।

প্র : অসমের বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার গানের ভূমিকা কতটা?

উ : অনেকেই আমাকে এই প্রশ্ন করে থাকেন। আমি নীরব থাকি। কিন্তু আপনাকে বলি, আগে যখন আমি গান গাইতাম তখন অসমের পরিস্থিতি এতটা খারাপ ছিল না।

বর্তমানে আমি ভাবছি আবার নতুন গান রচনা করে অসমের আজকের পরিস্থিতিকে কিছুটা হলেও শান্ত করবার লক্ষ্যে চেষ্টা করব।

প্র : আপনার কি কখনও নিজেকে একলা মনে হয়?

উ : অতীতের সেই ব্যস্ত ও উজ্জ্বল দিনগুলির কথা যখন মনে পড়ে তখন একাকিত্বের অনুভূতি আসে।

প্র : কোন্ সময়ে আপনার খারাপ লাগে?

উ : অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর যখন কর্তৃপক্ষের দেখা মেলে না আর যখন কোন অনুষ্ঠানে আগে উপস্থিত হয়ে হলের খালি চেয়ারগুলি দেখি, তখন আমার বেশ খারাপ লাগে।

প্র : অসমের বাইরে কি কখনও লোকগীতি পরিবেশন করেছেন?

উ : সিমলা, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং কলকাতা, রাজস্থান, দিল্লি, পাটনা, গ্যাংটক ইত্যাদি নানান জায়গায় লোকগীতি পরিবেশনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

প্র : আপনার পছন্দের শিল্পী কে?

উ : শিল্পী হিসেবে শ্রদ্ধেয় ভূপেনদাকে আমার ভালো লাগে।

প্র : অসমের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিঘটিত উন্নতির ক্ষেত্রে আপনার দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রশ্নে আপনার ভাবনা কী?

উ : আমি অসমেরই মেয়ে। যতদিন আমি জীবিত থাকব, অসমের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাব। আমার খারাপ লাগে যে সরকার এই বিষয়ে নীরব। সরকার আজ পর্যন্ত আমাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। বহু লেখালেখি করেও তেমন কোন সুফল পাইনি।

শেষ সাক্ষাৎকার : মাটির প্রতিমা ও লোকসঙ্গীত

।সকাল ১১টার পর থেকে দুপুর তিনটে ছাড়িয়ে। ২৭° সেলসিয়াস। কাঁপবার কথা ছিল এই শীতের সকালে, কিন্তু প্রতিমা দর্শনে যাব—এতেই বোধহয় শীত ছিল না। বাংলার সীমান্তগঞ্জ থেকে যাব আসামের সীমান্তগঞ্জে। সকালের বাসে কামাখ্যাগুড়ি থেকে বাক্সীর হাট হয়ে গৌরীপুর (ধুবড়ি আরো কিছু দূর)। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে লোকাল বাসে 'মাটিয়াবাগ' স্টপ-এ নামলাম। তৃষ্ণা মেটাতে একটা হতশ্রী চায়ের দোকানে—সেখানে আলাপ হোলো সোনাউদ্দিন শেখ-এর সাথে। সে তো তাঁর/তাঁদের দিদির কাছে যাচ্ছি শুনে আপ্লুত—পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ঢিবির ওপর সুবিশাল প্রাসাদোপম বাড়ীতে।

প্রাসাদের নাম হাওয়া মহল। আমার মেয়েরা দেখছে শাহরুখ খানের দেবদাস, আমরা দেখতে পেয়েছি প্রমথেশ বড়ুয়ার দেবদাস—সেই প্রমথেশ বড়ুয়ার স্মৃতিধন্য হাওয়া মহল। প্রকৃতির একান্ত উপাসক প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার মেয়ের সাথে হেঁটমুণ্ডে আলাপ করতে চাই। ডানপাশের শুঁড়িপথ দিয়ে যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন দেখি হা হতোস্মি শতছিন্ন এক ঘর—ঘর নয়, ঘরের কঙ্কাল। বারান্দায় সাইকেল—গৃহকর্তার বেরোনোর তোড়জোড়। ডাকতেই তিনি বেরিয়ে এসে 'প্রতিমা বড়ুয়া বাড়ী নেই' জানিয়ে আবার ভেতরে ঢুকলেন। আমরা তার বেরিয়ে আসার অপেক্ষায়—এবার তিনি আমাদের পথপ্রদর্শককে বললেন, 'সোনা প্রথমে কলুর বাড়ী নিয়ে যা, সেখানে না থাকলে টুকুর বাড়ীতে।' আমাদের জানালেন, ডিব্রুগড় থেকে জনৈক লোকসঙ্গীতের গবেষক এসেছেন, তাঁকে নিয়ে যখন বেরিয়েছেন তখন ঢোলুয়া কলু'র বাড়ীতে পাওয়া যেতেই পারে। নাহলে হয়ত' বড় মেয়ে টুকুর বাড়ীতে যেতে পারেন।

আবার রাস্তায়, রিকসায়। থামলাম কলু'র বাড়ীতে—ঋত্ ছুটে নেমে গেল, মুহূর্ত পরে ঘুরে এসে জানাল দিদি আছেন, ডাকছেন। কত মিথ—মিথ্যা মিথ। যাঁর দেখা পেলাম তিনি এক মাটির মানুষ যাঁর কাছে 'আবাহন আছে, বিসর্জন নেই'।

আলাপ হোলো প্রাগুক্ত গবেষক ডিব্রুগড়ের চালখোয়া মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডঃ দিলীপরঞ্জন বড়ঠাকুরের সাথেও। তাঁর উদ্দেশ্য লোকবাদ্য বাদনের ছবি ও সুর রেকর্ড করা এবং পরিচিতি পাওয়া। আমাদের উদ্দেশ্য দিদির কাছ থেকে লোকগান বিষয়ে মন্তব্য শোনা, লোকবাদ্যের সাথে পরিচিত হওয়া, সর্বোপরি দিদির গান শোনা। কিন্তু ক্লান্ত প্রতিমা জানালেন যে তিনি গাইতে পারবেন না 'গান ন হয়'। জানতে চাইলেন আমাদের ব্যক্তি পরিচিতি—জানালাম। খোলামেলা উঠোনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ভরদুপুরে চলল গানকেন্দ্রিক আড্ডা। চলতে লাগল টেপরেকর্ডার, কথা

—এটি গুইসাপর (গোসাপের) ছাল। পাঁঠার ছালও হয়।

দিদি, দোতরাতে বাজানোর যে স্টাইলগুলো তাকেই কি ডাং বলে?

প্রতিমা ঃ ইটিজ্ ইণ্ডিজেনাস স্টাইল অফ দিস ইনস্ট্রুমেণ্ট।

ডাং ক' ধরনের হয়, মানে ডাং-এর কি রকমফের হয়?

প্রতিমা ঃ হুঁ? আছে।

এতক্ষণে দোতরা, সারিন্দা, ঢোল একই সুরে বাজতে শুরু করেছে। দিদির চোখমুখে খুশীর ঝলক। গ্লাস হাতে ধরাই থাকল, চুমুক দিলেন না, ডুব দিচ্ছেন সুরের সাগরে। সুর ভাঁজতে ভাঁজতে গান ধরলেন ঃ তোমরা না যাইও, নাইও

না যাইও সইরে ঐ না যমুনার জলে...

একসময় শেষ হোলো, কিন্তু এতো আরেক গানের মুখ দেখতে চাওয়ার অছিলা।

প্রতিমা ঃ এতিয়া ময় একটা আমার এই অঞ্চলর মুসলমানী বিয়া গীত...

ছোট এলাচী, বড়রে এলাচী

ডালচিনি আর ঘি রিয়া বানি দে...

থামলেন প্রতিমা। থামল না দোতরা, সারিন্দা। আলাপের শুরুতে প্রতিমা বড়ুয়া জেনে নিয়েছিলেন আমাদের পরিচিতি। এখন তিনি ঋত্‌কে প্রশ্ন করলেন 'তুই গাইব মা?' ইতঃস্তত করলেও দিদি অভয় দেন, যন্ত্রীদের বলেন 'ধর, এই ছোওয়াড়া একটু গাইবে।' গাইল তোর্সা নদীর ধারে ধারে। শেষ হতেই তিনি আরো গেয়ে যেতে বললেন।

প্রতিমা ঃ তোর মত তুই গা।

আবার 'তোমরা না যাইও, না যাইও, না যাইও সইরে...'। গানের কথা ভুল যাচ্ছে দেখে লোকসংগীত সম্রাজ্ঞী কথা যোগান দিতে লাগলেন আর এইভাবে তন্ময় হয়ে তিনিও গাইতে শুরু করলেন। এক অনবদ্য সম্মিলন নবীনা-প্রবীণায়। গান শেষ।

ঋত্ ঃ আচ্ছা, এই যে গলা ভাঙাটা—এটা

প্রতিমা ঃ নিজে নিজেই ভেঙে যায়। ইণ্ডিজেনাস স্টাইল—এটা করতে হয় না, হয়ে যায়।

আর ভাওয়াইয়াতে বা চটকাতে যেভাবে ভাঙাটা পাই

প্রতিমা ঃ ধূত্।

গৌতম ঃ আচ্ছা, ভূপেনদা আপনার ধ্যানে জ্ঞানে, না? আপনি কথায় কথায় ওনার গান থেকে উদ্ধৃতি...

প্রতিমা ঃ কেন দেব না? গুণীকে তো গুণীর সম্মান দিতেই হয়। উনি নিজে, নিজের জীবনে কি, হোয়েদার হি ইজ ব্যাড অর গুড, দ্যাট ইজ নান অব মাই বিজনেস।

ওনার গুণকে তো শ্রদ্ধা করতেই হবে। কেমন লোক, কেমন না লোক, আমার তা দেখার কি দরকার?

ঋত্ ঃ আমি পরেও উত্তরবঙ্গে আসব যখন, তখন আপনার কাছে আসি যদি—আপনি আমাকে

প্রতিমা ঃ কোথায় আসবে?

ঋত্ ঃ কামাখ্যাগুড়িতে।

প্রতিমা ঃ ওখানে, শিপ্রাতে আমার ছোটবেলা কেটেছে। বাবা তখন ওখানে, ফরেস্টে। আমি সর্বত্র গেয়েছি। কিন্তু কামাখ্যাগুড়িতেই আমাকে কেউ ডাকেনি।

গৌতম ঃ ওখানে সুনীল পাল—একজন লোকসংস্কৃতির নীরব গবেষক আছেন, তাকে গিয়ে বলব যাতে...

প্রতিমা বড়ুয়া উঠে ঘরের ভেতরে গেলেন। কলুদা আবার এসে বসলেন ঢোলের সামনে। হাতদুটি জোড় করে বললেন, 'উনিই পাইলে আমাদের দ্যান। কারণ উনি তো আমার মা। আমার সংসারডা কে চালাইতে আছেন জানেন? শুধু এই যে আমার ঘরের অবস্থাডা দ্যাহেন, বাচ্চাগুলো...মেয়েকে বিয়া দিতে পারিনি...আমার মা আছে বইল্যাই তো আমি বাইচ্যা আছি।' আবার ফিরে আসেন দিদি, বসেন সেই টালমাটাল মোড়াটির ওপরেই।

ঋত্ ঃ আচ্ছা, আমার গানে কি কি ভুল ছিল? (দিদি সজোরে মাথা ঝাঁকান) কিছু ভুল নেই? ভুল তো আছে কিছু নিশ্চয়ই। (আবার মাথা ঝাঁকিয়ে—নাঃ) আপনার গানটার কথাগুলো এখনো মুখস্থ হয়নি সেইভাবে।

আচ্ছা, এখনকার যে লোকগীতি—এই যে নোতুন লেখা হচ্ছে—সেগুলো কি ঠিকঠিক নিয়ম মেনে করা হচ্ছে?

প্রতিমা ঃ নাঃ। এগুলোকে আমি লোকগীতি মনে করিনা। এগুলো রচনা।

গৌতম ঃ লোকগীতি মানে তো যেগুলো ফোকরা তৈরী করেছেন।

প্রতিমা ঃ দ্যাট ইজ্ কলড্ ইণ্ডিজেনাস ফোক সংস অফ দিস এরিয়া। এগুলো আসছে সব, ধারাবাহিক। কে রচনা করেছে, কে লিখেছে, কে গেয়েছে—তা তো জানার দরকার নেই।

ঋত্ ঃ ধরুন কয়েকটা গান আব্বাসউদ্দিন গেয়েছিলেন—জসিমউদ্দিনের লেখা—সেগুলো কি লোকগীতি?

প্রতিমা ঃ না, আমি মনে করি না।

গৌতম ঃ আপনার মাহুত বন্ধুরে—এতো অনেকদিন ধরে...হাতি খেদানোর গান কি হাতি ধরার গান।

প্রতিমা ঃ কি, মাহুতের গান।

এগুলো আপনারা তো শুনে এসেছেন পরম্পরা ধরে!

প্রতিমা ঃ শুনে এসেছি, শুনেই শিখেছি।

ঋত্ ঃ এই যে এখন গানগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেণ্টগুলো ব্যবহার করা হয়—এই ক্ষেত্রগুলোতে কি আপনারা কিছু করতে পারেন না যাতে কেউ ওসব যন্ত্র ব্যবহার না করেন?

প্রতিমা ঃ পারি। কিন্তু কেউ যদি না শোনে?

ঋত্ ঃ আমাদের ওদিকে দেখেছি লোকগানের সাথে সিন্থেসাইজার, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি বাজানো হয়। এগুলো নিয়ম করে বন্ধ করতে পারবেন না?

প্রতিমা ঃ পারব। তবে গালাগালিটা শুনতে হবে।

গৌতম ঃ গোয়ালপরীয়ার সব ধরনের গান নিয়ে আপনার ক্যাসেটের সংখ্যা কত? ক্যাসেট কিরকম আছে?

প্রতিমা ঃ এবারে করেছি।

গৌতম ঃ কোথা থেকে বেরোবে?

প্রতিমা ঃ ধুবড়ি থেকে। ধুবড়িতে পরেশ বরদলৈ— ভেরি মাচ ইণ্টারেস্টেড ইন মিউজিক—কইছে যে 'বাইদো (দিদি), আপোনি হেরি চারিখান গোয়ালপরীয়া, চারিখান বেলেক (অন্যান্য) গান আপোনি যদি গায়'...

বেলেক-এর মধ্যে কি কি গেয়েছেন?

প্রতিমা ঃ ভোজপুরী, সাঁওতাল, কাশ্মিরী, তারপর বোড়ো।

আপনার ক্যাসেট এখানে কিনতে পাওয়া যাবে?

প্রতিমা ঃ জানি না। পাবেন হয়তো। আমাদের মত ছোটো শিল্পীর ক্যাসেট কে রাখে?

কি বলছেন? অতদূর থেকে আমরা এসেছি কি এমনিই!

গৌতম ঃ আপনার তিনটি ক্যাসেট আমার কাছে আছে। হস্তীর কন্যা, ও জীবন রে, আর সাধের ভমরা—গৌহাটী থেকে সংগৃহীত—ঐ তিনটি আর আরো একটা ক্যাসেট আছে অমর পাল আর আপনার 'ও মোর বাংলা'।

প্রতিমা ঃ ও সব মিক্স করে। আমার গান ঢুকিয়ে দেয় ওনার ক্যাসেটে, তার গান ঢুকিয়ে দেয় আমার ক্যাসেটে—একসাথে কোনোদিন বেরোয়নি। ভূপেনদার সঙ্গে করেছি।

ওগুলো তো রেকর্ডে—ইপি, এলপিতে....পরে কি ক্যাসেট বেরিয়েছে? কোলকাতায় পাওয়া যাবে?

প্রতিমা ঃ হ্যাঁ। এখনো স্ট্রং ক্যাসেট সব। সব জায়গাতেই পাওয়া যাবে। আমি ফাংশানে যাচ্ছিলাম যোরহাটে—পথে চা খেতে নামল আমার সাথে যারা বাজায় তারা। সামনে দেখলাম ক্যাসেটের দোকান—'এই দ্যাখ তো আমার ক্যাসেট আছে কিনা?' কয়-আছে। 'একটা দিন তো'। কারণ আমার ক্যাসেট আমি কোনো দিন শুনতেই পারিনি। তো যেই ছেলেটা কিনল সেই নিয়ে নিল, আমার আর কিছু লাভ হোলো না।

ঋত্ ঃ আচ্ছা, ক্যাসেট শুনে গান তোলা কি ঠিক? ধরুন লোকগীতি—আমরা তো সামনে কাউকে পাচ্ছি না—যেমন আপনার গান যদি আমি গাইতে চাই—মানে গোয়ালপাড়িয়া যদি গাই—তাহলে কি আমি ক্যাসেট থেকে তুলব না? সেটা কি অন্যায়?

প্রতিমা ঃ হুঁ। তুলবে। আমার ক্যাসেটটা যদি শোনো—আমি কি রকম গাইছি! আমার কায়দাটা কি রকম!

হঠাৎ হঠাৎই প্রতিমা যেন বিষাদ প্রতিমা হয়ে যাচ্ছিলেন। যেমন এখন

প্রতিমা ঃ আমার যে কি হোলো? আমার স্বামীর সাথে ১২ বছর কোনো সম্পর্ক নেই।

আবার ধাতস্থ হলেন। জানতে চাইলেন একই প্রশ্ন—আমাদের এখানে আসার কারণ। আবার জানাতে হোলো যে, এবার প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল যাতে প্রতিমা পাণ্ডে (বড়ুয়া)-র সাথে আলাপ করা যায়, একটা দীর্ঘসময়ের আড্ডা দেওয়া যায় এবং তার অসামান্য গানের ঝর্ণায় স্নাত হওয়া যায়।

প্রতিমা ঃ আজকেই কি আপনারা ফিরে যাবেন?

গৌতম ঃ হ্যাঁ, যেতে তো হবেই।

প্রতিমা ঃ ওখান থেকে বেরিয়েছেন কখন?

সকালে। আপনার হাওয়া মহলে (হায়, বাড়ীর নাম হাওয়া মহল। কিন্তু বিশাল বাড়ীর পশ্চাৎপটে যে ঘরগুলোয় প্রতিমার আস্তানা, তাকে পর্ণকুটীর বলাই সঙ্গত—আর ভাঙাচোরা বেড়ার ফাঁক এতই বড় যে ঐ অংশটিই যেন সদর্থে হাওয়া মহল) গিয়ে জানতে পারলাম আপনাকে এখানে পাওয়া যেতে পারে, নাহলে আপনার বড় মেয়ে টুকুর বাড়ীতে।

এর মধ্যে এসে গেল খাওয়ার আহ্বান। দুপুর পেরিয়ে বিকেলের দিকে ঘড়ির কাঁটা ছুটছে। একটা ছোট্ট থালায় এক মুঠো ভাত, কিছু ভাজাভাজি, তরকারি, বাটিতে ডাল আর মাছের ঝোল। এত সুবিশাল আয়োজনে প্রতিমা বড়ুয়া বিরক্ত।

প্রতিমা ঃ মোক কিছু দিবা না। আগাগোড়ায় কয়া দিনু। ভাত কমা। 'অতিথি বৎসল গৃহকর্ত্রী এর আবার কমানোর কি আছে ভাবেন? প্রতিমার দাবড়ানিতে কমাতে বাধ্য হন।'

ঋত্ ঃ ওটুকু তো পাখীতে খায়। আর আপনি যে পাখীর থেকেও বেশী গান

করেন।

প্রতিমা ঃ আমি পাখীর থেকেও কম খাই। আর গানটা তো আমার ভেতরের জিনিস।

ভূপেনদা এতটুকু ভাত খান। সকাল ১০টার সময় ফ্রুট জুস খাবেন—কমলার সময় কমলা, জম্বুরা বোঝেন তো—বাতাবি লেবুর রস, আমরা কুশাটি বলি মানে আখ, কামরাঙা—কিসের রস খান না? কিছু না থাকলে সরবৎ। আনারস তো বাঁধা।

গৌতম ঃ আপনি কোনো রস খান না?

প্রতিমা ঃ আমি শুধু এই রস খাই। এটাও তো রস। আমি বলি কি—এটা খাওয়া অপরাধ নয়। খেয়ে, অপরাধের কাজ করাটা অপরাধ। খেলাম—বাড়ীতে গিয়ে খুব হট্টগোল করলাম, বৌকে মারধোর করলাম, ছেলেমেয়েদের বকাঝকা করলাম, রাস্তাঘাটে এই করলাম—দ্যাট আই হেট।

আমার কিস্‌সু হয়নি—স্ট্রেইট্—আর বেশী তো এরাই খেল—দেখলেন তো?

এখন আমি যাব। আমার হাজব্যাণ্ড থাকেন রাজকীয় বিছানায় আর আমি থাকি কুটীরের মধ্যে। উনি যখন রাতে আসবেন, তখন দরজাটা দয়া ক'রে খুলবেন—আমি ঢুকব। একটাও কথা বলি না।

কেন বলেন না?

প্রতিমা ঃ উনি কেন বলেন না?

আর, এসব আমার কেমন বাড়ী জানেন? আমার নিজের বাড়ী। এরা আমার খুব নিজের লোক।

গৌতম ঃ আমাদের সকালে সোনাউদ্দিন শেখ আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে বলল—দিদি তো আমাদের দিদিই।

ভূপেন হাজারিকার সাথে আপনার....

প্রতিমা ঃ ভূপেনদা আর আমরা হচ্ছি ক্লোজ রিলেটিভ—ডোণ্ট টেক ইট আদারওয়াইজ্— ক্লোজ ইন পিওর সেন্স। আমি ওনাকে খুব শ্রদ্ধা করি, আর উনিও আমাকে খুবই স্নেহ করেন।

দিদি, একসময় 'মাহুত বন্ধুরে' বলতে বুঝতাম ভূপেন হাজারিকা আর প্রতিমা পাণ্ডে'র নাম।

প্রতিমা ঃ এখনো সেই-ই। বেচারি এখন গাইতে পারেন না। হি ইজ্ রানিং সেভেণ্টি এইট। আই অ্যাম রানিং সিক্সটি সেভেন। এটা ভাবতে কেমন লাগে—আমাদের ভাষায় মায়া লাগে। অতবড় একটা শিল্পী—এটাতে তো কোনো সন্দেহ নেই যে হি ইজ্ আ গ্রেট আর্টিস্ট। ওনার এক একটা গান অতুলনীয় রচনা....

অবশ্যই, ভূপেন হাজারিকা একজন গ্রেট কম্পোজার।

প্রতিমা ঃ রঙ্গিয়াতে ওনার একটা নাইট হোলো রঙ্গিয়া নিয়ার গৌহাটি—রঙ্গিয়া থেকে এক ঘণ্টার পথ। আমি তখন উনিশটা গান গাইছি—তখনো উনি এসে পৌঁছান নি—কিন্তু ওনারই নাইট। যারা আমার সাথে বাজাচ্ছে, তারা বলল—'উনি যদি হোল নাইট না আসেন, আপনি কি গেয়ে যাবেন?' শেষটায় উনি এলেন। গাড়ী থেকে নামেননি, বসে আছেন। অনেক লোক ভীড় করেছেন—'দাদা, নাবক, নাবক।' 'রবো, গান হুনি'। তারপর অর্গানাইজাররা এলেন, বললেন—'এতিয়া আপোনি উঠিবার পারেন।' ওনাকে ফুলের স্তবক দিয়ে আমন্ত্রণ করল ওরা—আর আমাদের গাঁদা ফুল, ফুলের তোড়া। উনি বললেন, 'এডা রাখোক'। নিলাম, প্রণাম করলাম। উনি গাইলেন, এত ভালো গাইলেন—ইউ ক্যান নট কম্পেয়ার ইট।

দিদি প্রসঙ্গান্তরে গেলেন। ঋত্‌কে জিগ্যেস করলেন কি ধরনের গান সে করে থাকে, আমি জানতে চাইলাম আব্বাস মেলায় তিনি আমন্ত্রণ পান কিনা ফিবছর।

প্রতিমা ঃ ডাকলেই যেতে পারি। এখন কেমন হয় মেলা?

ঋত্ ঃ বেশ ভালো মেলার পরিবেশ। বহু বড় বড় শিল্পী আসেন।

প্রতিমা ঃ বড় শিল্পী? কারা? লোকসঙ্গীতে বড় বড় শিল্পী কারা?

গৌতম ঃ এবার এসেছিলেন ফেরদৌসী রহমান। তাছাড়া বিষ্ণুপদ দাস, অমর পাল...

প্রতিমা ঃ আর যারা লোকসঙ্গীতের জন্য জীবনটা দিল, দিচ্ছে—তারা নয়। একটা কথা বলব—জীবন কিন্তু আব্বাসউদ্দিনও দেন নি। জীবন দিচ্ছি আমরা। আমাদের গানের মধ্যে আপনারা কোনো...ইয়ে পাবেন না।

তা ঠিক, আপনাদের সঙ্গীতে কোনো তঞ্চকতা, কোনো আধুনিকতা...

প্রতিমা ঃ ইণ্ডিজেনাস।

সঙ্গীত-প্রতিমা'র একধরনের বিষণ্ণতা আমাদেরকে খুবই আচ্ছন্ন করছিল। তাই অনুসন্ধিৎসা চাপতে পারিনি, প্রশ্ন করে ফেললাম স্বামী প্রসঙ্গে। সকালে যখন হাওয়া মহলে গৌরীশঙ্কর (?) পাণ্ডে'র সাথে আলাপ হয় তখন. পাছে দিদির সাথে দেখা না হয় তাই কিছু টুকরো কথা জানতে চেয়েছিলাম—কিন্তু অবাক হয়ে দেখেছিলাম তাঁর স্বনামধন্যা স্ত্রী বিষয়ে তিনি কোনো খোঁজই রাখেন না।

প্রতিমা ঃ প্রফেসর। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। গৌরীপুর প্রমথেশ বড়ুয়া কলেজের। আমি কিন্তু দেখলাম—খারাপ পাবেন না—শিক্ষিত লোকেরা বেশী অশিক্ষিত হয়। পুঁথিগত বিদ্যা হলে কিন্তু শিক্ষা হয় না। ওরা চাকরী করে, আমরা চাকরী করি না—আমরা কা'রোর চাকর না। ১৯৮৯ থেকে আমার সাথে কোনো কথাবার্তা নেই। হিসাব করুন ১৯৮৯ থেকে...

আসার সময় ভয় ছিল তাঁকে ঘিরে মিথ্যা মিথ্ এর। ভয় ভেঙে গেল। দিদির শেষ কথা 'গৌহাটীতে প্রোগ্রাম করে তো আমার কিছু হবে না। আমি তো গ্রামের। আর ময় ওরমই লোক।'

আসার সময় বলছিলাম 'প্রতিমা পাণ্ডের সাথে আলাপ করতে যাচ্ছি'। ফিরছি সেই পরিচিত নাম প্রতিমা বড়ুয়া'র শুভ-স্মৃতি নিয়ে।

ফেরার পথে ঋত্ বলল, ধন্য হলাম 'মাটির প্রতিমা'কে প্রণাম জানিয়ে।

(৪-১২-২০০২এ আলাপ। মনে হয়েছিল এই প্রক্ষিপ্ত আলাপচারিতা প্রকাশিত হলে সাম্প্রতিক প্রতিমা বিষয়ে একটা ধারণা সৃষ্টি করা যায়। তারই মধ্যে ২১-১২-০২ এর 'সংবাদ প্রতিদিন' এ তাঁর গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ প্রকাশিত হয়। রাত্রে ঐ পত্রিকার গৌহাটী সংবাদদাতার কাছ থেকে খবর নিই—কিন্তু ২৭-১২-০২ রাতে ই-টিভি জানায় প্রতিমা ভাসানের সংবাদ। ভালো লাগছে না ওবিচুয়ারি লিখতে, ভালো লাগছে না দাবি করতে যে এটিই সম্ভবত প্রতিমা বড়ুয়া'র শেষ সাক্ষাৎকার। তবু এ লেখা কেন যে হঠাৎ ইতিহাস হয়ে গেল...)

গোয়ালপাড়িয়া লোকগান

অ জীবন রে জীবন ছাড়িয়া না যাইছ মোকে
তুই জীবন ছাড়িয়া গেইলে
আদর করিবে কাহায় জীবন রে।।
কচুর পাতের জল যেমন রে
ও জীবন টলমল টলমল করে
ঐ মতন মানুষের দেহা
কখন ঢলিয়া পড়ে জীবন রে।।
ধান কাটে ধানুয়া ভাইয়া রে
ও জীবন ছাড়িয়া কাটে নাড়া
ঐ মতন নরের দেহা
জীবন গেইলে মরা জীবন রে।।
দুনো জনে যুক্তি করিয়া রে
ও জীবন আসিল ভবের হাটে
তুই জীবন ছাড়িয়া না যাইছ
নিধুয়া পাথারে জীবন রে।।
তুই জীবন ছাড়িয়া গেইলে রে
ও জীবন কান্দিবে বাপো ভাই
শ্মশানঘাটে সোনার দেহা
পুড়িয়া করিবে ছাই জীবন রে।।
ভাই বলে ভাতিজা বলো রে
ও জীবন সম্পত্তির ভাগী
আগে করিবে ভাগবাটেরা
পাছে দেহার গতি জীবন রে।।

একবার হরি বলো মন রসনা
মানবদেহার ভাই গৈরব কইর না।।
মানবদেহা মাটির ভাণ্ড
ভাঙিলে দেহা জোড়া নিবে না।।
বেলা ডুবিলে হইবে রাতি
সঙ্গে নাই মোর সঙ্গের সাথী
এ ভব নদী কেমনে হব পার।।
টাকা-পইসা ভিটাবাড়ি
জীবন গেইলে সব রইবে পড়ি
সঙ্গের সাথী কেউ তো হবে না।।
একবার হরি বলো মন বারে বার
বেলা ডুবিলে হইবে রে অন্ধকার।।

দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে
রঙ্গিলা দালানের মাটি
গোঁসাইজী কোন্ রঙ্গে।।
বাঁধিছেন ঘর মিছা
মিছাই দ্বন্দ্ব বাজে
গোঁসাইজী কোন্ রঙ্গে।।
হাড়ের ঘরখানি চামের ছাউনি
বান্ধে বান্ধে তার জোড়া
তাহার তলে ময়ুরা ময়ুরী
শূন্যে উড়ায় তারা
গোঁসাইজী কোন্ রঙ্গে।।
বাল্যকাল গেল হাসিতে খেলিতে
আর যৌবনকাল গেল রঙ্গে
বৃদ্ধকাল গেল ভাবিতে চিন্তিতে
আর গুরু ভজিবি কোন্ কালে
গোঁসাইজী কোন্ রঙ্গে।।

আজি আউলাইলেন মোর বান্দা ময়াল রে।
হাতির পিটিত থাকিয়ারে মাহুত কিসের বাটুল মারো.
ওরে পরের ঐ কামিনীকে দেখিয়া
জ্বলিয়া কেনে মরো রে।।
হাতির মায়া জানো
নারীরও বেদনা রে মাহুত
কিবা তোমরা জানো রে।
বৈদ্যাশিয়া মাহুত তোমরা রে
তোমার কীসের মায়া
নারীর মন ভাঙ্গিয়া রে মাহুত
যাইবেন ছাড়িয়া রে।।

কন্যা : ঐ গদাধরের পারে পারে রে
ও মোর মাউতে চরায় হাতি
কী মায়া নাগাইলেন মাহুত রে
ও তোর গালায় রসের কাটি
কী মায়া নাগাইলেন মাহুত রে।।
ও রে উচা করি বান্দেন ছাপোর রে
ও মুঞি আইস্তে যাইতে দেখিম্
কী মায়া নাগাইলেন মাহুত রে।।
ঐ দুধ খোয়াইলেন দই খোয়াইলেন রে
মাহুত না খোয়াইলেন মাটা
এবার হাতে টুটিয়া গেইলো কি,
ঐ তোর আসা যাওয়ার ঘাটা
কী মায়া নাগাইলেন মাহুত রে।।
মাহুত : না-কান্দেন না-ভাবেন কন্যা হে
না-ভাঙেন রসের গালা
এবার যদি ঘুরিয়া আইসোং রে
ও তোর সোনায় বান্দিম্ গালা
এবার যদি বাউরি আইসোং রে।।

মাহুত বন্ধু রে

আজি গাও তোলো গাও তোলো ও মইষাল বন্ধু রে।
গাও তোলো গাও তোলো বন্ধু গাও তোলো ডাংগিয়া
কি ও হোরে— কোন্ বা চোরা
নিয়া যায় মোক্ চুরি না করিয়া রে।।
মইষ চরান মোন মইষাল বন্ধু মইষের গলায় দড়ি
কি ও হোরে— বিধাতা বঞ্চিত হইল
মোরে একলায় যাবেন ছাড়ি রে।।
মইষ চরান মোর মইষাল বন্ধু বড় বাসের খোপে
কি ও হোরে— কোন্ নিধি নিদারুণ হইলেক্
দংশিলে কালসাপেরে।
রোজায় ঝাড়ে বৈদ্যে ঝাড়ে ঢেকিয়ার আগাল দিয়া
কি ও হোরে—মুই অভাগী ঝারোঙ বন্ধুক্
ক্যাশের আগাল দিয়া রে।।

আমার বাড়ী যান ও মোর প্রাণের মইষাল রে
ও মইষাল্ বইস্তে দিব মোড়া
বুকোতে হেলানি দিয়া রে
ও মইষাল্ বাজাইবেন দোতরা।।
আমার বাড়ী যান ও মোর প্রাণের মইষাল রে
ও মইষাল বইস্তে দিব পিড়া
জলপান করিয়া দিব রে
ও মইষাল সরু ধানের চিড়া।।
সরু ধানের চিড়া ও হোরে
ও মইষাল বরনী ধানের খই
ঘরে আছে চাম্পা কলা রে মইষাল
মইষাল গামছাবান্দা দৈ।।
একে গাছের গুয়া মোর প্রাণের মইষাল রে
মইষাল একে গছের পান
কী দিয়া খোয়াইলেন গুয়া রে
ও মইষাল ঘরে না রয় মন।।
ভার বান্দ মোর ভারাটি বান্দ রে
ও মইষাল ভইষের পিঠে জিন
আজি কেনে দেখঙ মইষাল রে
তোমার ঝাড়িয়া যাবার চিন্।।

মাহুত বন্ধু রে

প্রাণ কান্দে মোর, মইষাল বন্ধু রে--
মইষ চড়ান, মইষাল বন্ধু, ঘাটের উজানে,
তোমার মইয়ের ঘণ্টা বাইজে
মন উড়াং বাইরং করে রে।
মইষ বান্ধ, মইষাল বন্ধু, বাড়ির বগলেতে
মুই নারীটা দেখা দিম
সকালে বৈকালে রে।
ভার বান্ধেন বারাটি বান্ধেন (মইষাল)
ছাড়িয়া আপন মায়া
ওরে আজি কেনে দেখং মইষাল,
মোক ছাড়িয়া যাবার কায়া রে।
তোমরা যাইবেন দূর দ্যাশে
আমার হইবে কী--
দিন রাইতে, ওরে মইষাল, কান্দি কান্দি মরি রে।।

(আরে) ধিকো ধিকো ধিকো মইষাল রে
মইষাল ধিকো গাবরালি
এ হেন সুন্দর নারী ক্যামনে যাইবেন ছাড়ি
মইষাল রে।।
(আরে) তখনি না কইচোং মইষাল রে
মইষাল না যাইন্ গোয়ালপাড়া
(আরে) গোয়ালপাড়ার চেংড়িগুলা জানে গুয়া পড়া
মইষাল রে।।
(আরে) তখনি না কইচোং মইষাল রে
মইষাল না যাইন্ গোয়ালপাড়া
(আরে) কাড়িয়া নিবে হাতের বাঁশি ছিঁড়িবে গলার মালা
মইষাল রে।।
(আরে) তোমরা যাইবেন মইষ বাথানে রে
মইষাল কিনিয়া আনিবেন কী?
(আরে) তোমার পেন্দনের শ্যামলাই ধুতি আমার দাঁতের মিশি
মইষাল রে।।
(আরে) ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো কইন্যা রে
কইন্যা মিছা তোমার মায়া
(আরে) ফুলের যৈবন শুকিয়া গ্যালে উড়ি যায় ভোমরা
কইন্যা রে।।

মাহুত বন্ধু রে

গঙ্গাধরের বাতায় বাতায় রে
ও রে কাশিয়া থোপা থোপা
তারই তলে সোনার বন্ধু বাজায় দোতরা রে।

গঙ্গাধরের বাতায় বাতায় রে
ও রে নানান জাতের ফুল
ছাড়িয়া দে মোর শাড়ির আন্‌চল
ঝাড়িয়া বান্ধুম্‌ চুল রে।।

লাল গামছা রাঙ্গা শাড়ি রে
ও রে তার মধ্যে রাঙ্গা ডোর
আগের মতো যাও বন্ধু
সোয়ামি আছে মোর রে।।
গৌরীপুরের সৌখিন চেরি রে
ও রে নাইওর যাবার চায়
স্বামীর সঙ্গে পেখ্‌না করে
ঢাকাই শাড়ি চায় রে।।

ও পাড়ে কামরাঙ্গা গাছ
ঝিকিমিকি করে পাত্
ঐটা হইল্ মোর বাপো মায়ের দ্যাশ
মোর জান কালা ও।।

বাপো মায়ের কী কারণ
বেচেয়া খাইল্ মোক অকারণ
বেচেয়া খাইল্ মোক মদকিয়ার ঘরে
মোর জান কালা ও।।

মদকিয়ায় মধু খায়
মোর পরাণটা জ্বলিয়া যায়
গোটাই রাইত মোর নিন্দ বিহনে কাটে
মোর জান কালা ও।।

ও পাড়ে তম্বুলের গাছ
টলোমলো করে পাত্
ঐটা হইল্ মোর বুঢ়া বাবার দ্যাশ
মোর জান কালা ও।।

বুঢ়া বাবার কী কারণ
বেচেয়া খাইল্ মোক অকারণ
বেচেয়া খাইল্ মোক গুয়া চাচার ঘরে
মোর জান কালা ও।

গুয়া চাচায় গুয়া খায়
মোর পরাণটা জ্বলিয়া যায়
সোনার হাত মোর কাটাইরিতে কাটে
মোর জান কালা ও।।

ও পাড়ে কামরাঙ্গা গাছ
ঝিকমিকি করে পাত্
ঐটা হইল্ মোর বড়ভাইয়ের দ্যাশ
মোর জান কালা ও।।

বড়ভাইয়ের কী কারণ
বেচেয়া খাইল্ মোক অকারণ
বেচেয়া খাইল্ মোক মদকিয়ার ঘরে
মোর জান কালা ও।।

মদকিয়ায় মধু খায়
মোর পরাণটা জ্বলিয়া যায়
গোটাই রাইত মোর নিন্দ বিহনে কাটে
মোর জান কালা ও।।

মাহুত বন্ধু রে

বাণিজ্ বাণিজ্ করেন ও মোব প্রাণ সাধু রে
সাধু বাণিজের কী বা রীতি
অফুটা ফুলের রস সাধু রে
সাধু খাইতে না দেয় বিধি।

যখন না ছিলং মোর প্রাণ সাধু রে
সাধু বাপো মায়ের ঘরে।
তখনো না গেইলেন্ সাধু রে
সাধু বিদেশে বাণিজে।

নাউ কুটিনু ঘুচি রে ঘুচি
সাধু চালে থুইয়া দাও।
শিশুতে করাইচেন্ রিয়া রে
সাধু অ্যালাও গন্দায় গাও।

সোনা না-হয় রূপা না-হয় রে
সাধু অঞ্চলে বান্ধিব।
চালের কুমড়া না-হয় রে
সাধু পড়শি বিলাব।

মাথার মুকুট মোর প্রাণ সাধু রে
সাধু কপালো নাই আর ঘেরে।
কেমনে ছাড়িয়া যাইবেন রে
সাধু বিদেশে বাণিজে।

আরার বাশ কাটিয়া প্রাণ সাধু রে
সাধু বান্ধো নায়ের গুড়া।
এবার বাণিজে যাক সাধু রে
সাধু তোমার দয়ার খুড়া।।

(আরে) দুধো মিঠা দইও মিঠা আরও মিঠা ননী
আর তার চাইতে অধিক মিঠা রে
বাছা মা-ও সে জননী
সোনার চান্দ চাঁদ রে
চান্দো হারাইলাম নদেতে।।
নিমের তলে বইসো বাছা
নিমের ছেঁড়ো পাতা
(আরে) কাই তোরে হরিয়া নিল রে
ও তোর সোনা মুখের কথা
বৈরাগী না হইও বাছা
সন্ন্যাসে না যাইও
(আরে) ঘরে বসে কৃষ্ণের নামটিরে
বাছা মায়েরে শুনাইও।।

রাধার আওয়াসের মাঝে উড়াইল ভ্রমরা রে।।
ফুল নাহি ফোটে হে যশোদা
ডাল নাহি মেলে হায় হায়।।
(আর) নয়া রং যৈবনের ভারে
হালিয়া হালিয়া পরে রে।।

উমার কমলার কাটিয়া দেখ
বীচি ঝাউ ঝাউ করে (হায় হায়)
(আর) আমার কমলা কাটিয়া দেখ
রসে খোরা ভরে ভরে রে।।
ফুলের সাজি লইয়া রে যশোদা
যান বা গোয়ালপাড়া
(আর) অলি অলি গলি গলি
তায় বেচায় কমলা রে।।

দাদা আমার নাই রে বাড়ি
ভ্রমরা গুনগুন করে।
(আর) আসুক দাদা কয়া দিম্
পরায় বসত করে রে।।

মন মোর কান্দে রে
রাতি নিষায় ওরে কালে
নিন্দের আলিসে পতি মোক
মা বুলিয়া ডাকে
মন মোর কান্দে রে।।

আরে বাপো কানা মাও কানা ও
ও দারুণ বিধি কানা পারার লোক
পইছার লোভে বেচেয়া খাইচে
স্বামী নাবালোক
মন মোর কান্দে রে।।

কয়া দেন মোর দয়াল বাবা কো
ও কাগামোক দুধ পাঠেয়ারে দিবে
সেইনা দুধ খায়া কাগা মোর
পতি মানুষ হৈবে
মন মোর কান্দে রে।।

আজি বাপোক খাইল মোর
বনের বাঘাও
ও দারুণ বিধি মাওক খাইল মোর সাপে
ঘটক গোলম পরিয়া মরুক
নিধুআ পাথারে
মন মোর কান্দে রে।।

মাহুত বন্ধু রে

মরিহে মরিহে মরিহে শ্যাম
শয়নে স্বপোনে তোমার নাম
বরাই বারির সাচিরে পান
পইচা দিয়া শ্যাম কিনিয়া আন
আনোরে গুরা পান কাটো হে খাই
হাসি মনে শ্যাম চলিয়া যাই।।

আগুনের ছলে মুই বাইরা জাং
তবুও শ্যাম তোর দেখা নাপাং
একদ্দিন দেখিচং স্বপনে
মরিহে শ্যাম সেই তোর বদনামে।।

বাপো মাও মোর দুরাচার
বেচেয়া খাইচে মোক দুরান্তর
সেওবা দেশে সকলে পর
দিবসে দেখং মুই অন্ধকার।।

গোয়ালপাড়িয়া লোকগান

মনের আয়েনা খুলিয়া দেখিলে হয়
দেহের কপাট মেলিয়া দেখিলে হয়
মনের মানুষ কোথায় পারা যায়।।

যেমন আন্ধার ঘরে সাপ সোন্দাইলে
আন্ধার ঘরে সাপ সোন্দাইলে
সারা রাতি সাপের ভয়
মনের মানুষ কোথায় পারা যায়।।

যেমন শিঙি মাছের কাটা বিন্ধাইলে
শিঙি মাছের কাটা বিন্ধাইলে
সর্ব্ব অংগ জ্বলিয়া যায়

মনের মানুষ কোথায় পারা যায়।।
একবার মনের মানুষ চলিয়া গৈলে
মনের মানুষ চলিয়া গৈলে
আরতো ফিরিয়া আছিবার নয়
মনের মানুষ কোথায় পারা যায়।।

মাহুত বন্ধু রে

(আরে ও) ও কি ওরে মোর ভাবের দেওরা
থুইয়া আয়ে মোক
বাপো ভাইয়ার দেশেরে (দেশতে)
(ও কি ও) আরে ও....... দেশতে
বাপো ভাই মোর দুরাচার
বেচেয়া খাইচে আইমোক দুবান্তরে
বেচে খায়া মোক না করে উদিশ্যরে।।

এলুয়া কাশীয়ার ফুল
নদী হৈছে দেওরা হুলস্থুল রে
থুয়া আয় মোক বাপো ভায়ার দেশেরে।।

মদকিয়া মদ খায়
আঁগুন দিতে আই মোর রাতি পোয়ায়রে
নলের ডাঙে মোর শরির পরিল কালারে।।

অষ্ট অলংকার খুলিয়া নেও
হাসি মুখে দেওরা বিদায় দেওরে
বিদায় দিলে জাইম মুই
বাপো ভাইয়ার দেশরে

হস্তীর কন্যা হস্তীর কন্যা বামোনেরো নারি
মাথায় নিয়া তাম কলসি ও সখি হাতে সোনার ঝারি সখিও
ও মোর হায় হস্তীর কন্যারে,
খানিকো দয়া নাই মাহুতক লাগিয়া রে।।

আরে কালু তিল তিল পক্ষী কান্দে বালুতে পরিয়া
আর গৌরিপুরিয়া মাহুত কান্দেও সখি ঘর বাড়ি ছাড়িয়া সখিও
ও মোর দান্তাল হাতীর মাহুত রে
যেদিন মাহুত ছাড়িয়া যায় নারীর মন মোর জুরিয়া রয় রে।।

আরে আকাশতে নাইরে চন্দ্র
তারা কেমন জ্বলে
আর কেমন জ্বলে
আর যে নারীর পুরুষ নাই ও
ও তার রূপে কি কাম করে সখিও
ও মোর শারিন হাতীর মাহুত রে
যেদিন মাহুত শিকার জায় নারীর মন মোর কান্দিয়া রয় রে।।

আরে আইয়ক ছাড়িলং বাইয়ক ছাড়িলং ছাড়িলং সোনার পুরি
আর বিয়া করিয়া ছাড়িয়া আছিলং অ সখি অল্প বয়সের নারি সখিও
ও মোর শারিন হাতীর মাহুত রে
যেদিন মাহুত শিকার যায় নারীর মন মোর কান্দিয়া রয়রে।।

আরে পুখুরিতে নাইরে পানী
নউকা কেমনে চলে
যে নারীর পুরুষ নাই অ'
অ রূপে কি কাম করে।।

ওরে পাততিরা করিয়ারে মাহুত
বারেয়া দিলুং পাও
মাথার ও পর কাল জেঠী ও
সখি করে পঞ্চ রাও সখিও
ও মোর দান্তাল হাতীর মাহুত রে
যে দিন মাহুত শিকার যায়
নারীর মন মোর কান্দিয়া রয় রে
ও মোর হায় হস্তীর কন্যারে।।

বার মাসে তের ফুল ফোটে
কালা বছরে ফোটে হোলা সই
নাযায়ো যমুনার জলে
তোমরা নাযাইয়ো নাযাইয়ো নাযাইয়ো সই হে
অইনা যমুনার জলে।।

যে ঘাটে ভরিব আরো জল
কালা সেই ঘাটে কানাইয়া সই
নাযাইয়ো যমুনার জলে।।

নন্দের বেটা চিকন আরো কালা
কালা দিলেক (দিহিলেক) বিছম জালা সই
নাযাইয়ো যমুনার জলে।।

কদম গাছে হেলানিরে দিয়া
কালা বাজায় মোহন বাশি সই
নাযাইয়ো যমুনার জলে।।

পদের ওপর পদ আরো দিয়া
রাধা গাথে ফুলের মালা সই
নাযাইয়ো যমুনার জলে।।

কত পাষাণ বান্দিছেন পতির মনেতে হে
পাষাণ বান্দিছেন পতির মনেতে

আর জৈষ্ঠ মাসের মিষ্ট ফল আসার মাসের নয়া জল রে
আর শাঁওন মাস গেল কইন্যার ভাবিতে আর চিন্তিতে হে।।

ভাদ্র মাসের আউলা কেশ আশিন মাসে বর্ষার শেষ রে
আর কার্ত্তিক মাস গেল কন্যার ভাবিতে চিন্তিতে হে।।

আঘোন মাসে কাটে ধান আরো পৌষ মাসে শীতের বাণ রে
আর মাঘ মাস গেল কন্যার ভিজাইতে আর শুকাইতে।।

ফাগুন মাসের তিগুণ জ্বালা আর চৌত্র মাসের বরণ কালা রে
আর বৈশাক মাস গেল কন্যার কান্দিতে আর কান্দিতে।।

কলসীর পানী মাজিয়ায় ঢালিয়া
কলসী হইল মোর খালিরে
আরে কলসীতে নাই মোর পানী রে।।

সেই না কলসী ভরিবার গেনু মুই
অগম দরিয়ার মাঝেরে
আরে কলসীতে নাই মোর পানী রে
কলসীতে নাই মোর পানী রে।।

সেই না দরিয়ায় ফুটিয়ায় আছে
শুন্দী হোলার ফুল রে
আরে কলসীতে নাই মোর পানী রে
কলসীতে নাই মোর পানী রে।।

আরে ঐ না ফুল তুলিয়া দিনু মই
ঢালুওয়া খোপার মাজেরে
আরে কলসীতে নাই মোর পানী রে
কলসীতে নাই মোর পানী রে।।

আরে ধুবুনি চিলায় ছুবুনি দিয়া
ধোবনী চিনায় মুপোনি দিয়া
নিয়া গেইল খোপার ফুল রে
আরে কলসীতে নাই মোর পানী রে
আরে কলসীতে নাই মোর পানী রে।।

রসিয়া বসাইচে ফান কালা
বানিয়াই বসাইচে ফান কালা
নিধুআ পাথারে ও কালা যাইওনা

সেইনা ফান্দে পরি আছে শ্যাম কালা
শালে শুয়া পঙ্খি অ' কালা যাইওনা।।

সিতের সিন্দুর বন্দক থুয়া কালা
পঙ্খি ছুটান করে ও কালা যাইওনা।।

কানের সোনা বন্দক থুয়া কালা
পঙ্খি ছুটান করে ও কালা যাইওনা।।

গলার মালা বন্দক থুয়া কালা
পঙ্খি ছুটান করে ও কালা যাইওনা।।

হাতের শাঁখা বন্দক থুয়া কালা
পঙ্খি ছুটান করে ও কালা যাইওনা।।

পায়ের নুপুর বন্দক থুয়া কালা
পঙ্খি ছুটান করে ও কালা যাইওনা।।

মাহুত বন্ধু রে

কি অ' বন্ধু কাজল, ভোমরারে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু
কয়া জান কয়া জানরে

যদি বন্ধু যাবার চান ঘারের গমছা থুয়া জানরে
কি অ'বন্ধু.....................কয়াজান রে

যদি বন্ধু যাবার চান হাতের আঙঠি থুয়া জানরে
কি অ'বন্ধু কাজল..........................কয়াজান রে

বট বৃক্ষের ছায়া যেমন রে
আরে তোর বন্ধুর ময়া তেমন রে
কি অ' বন্ধু.....................কয়াজান রে

বন্ধু যাইবেন খেওয়ার পার
গেইলে কি আসিবেন আর রে
কি অ' বন্ধু..................কয়াজান রে

তোমরা গৈলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে
হস্তী নরান হস্তী চরান কাকুয়া বাসের আরাল
অ'রে কি সর্পে দংশিলেক বন্দুয়া
বন্দুয়া হৈ মোর খোরা রে
গৈলে কি................বন্ধুরে।।

রোজায় ঝারে গুনেকে ঝারে ঢেকীয়ার আগাল দিয়া
অ'রে মুই নারিটা ঝাড়ং বন্দুয়াক কেশে আগাল দিয়ারে
আরে গৈলে..........................বন্ধুরে
তোমরা গৈলে...............বন্ধুরে।।

হস্তী নরাং হস্তী চরাং হস্তীর গলায় দড়ি
ওরে সত্য করিয়া কনরে মাহুত কোনবা দেশে বাড়িরে
আরে গৈলে........................বন্ধুরে
তোমরা.......................বন্ধুরে।।

হস্তী নরাং হস্তী চরাং হস্তীর গলায় দড়ি
ওরে সত্য করিয়া কনরে মাহুত ঘরে কয়জন নারীরে
আরে গৈলে.......................বন্ধুরে।।

অ' মুই বুজুনু বুজুনু বৈদেশা বন্দুয়ার মনটারে
অ'মোক ঝুনুকা গড়েয়া দে

ঝুনুকার ভরতে হাটিবার নাপাং বন্দু
পিটিত করিয়া নে মোকে
অ' মোক ঝুনুকা গড়েয়া দে
অ' মুই বুজুনু...........গড়েয়া দে।।

আর ঘরেরে পাছিলায় ভাঙা না কোদাল খান
নল গড়েয়া দে মোকে
অ' মোক ঝুনুকা গড়েয়া দে
অ' মুই বুজুনু.................গড়েয়া দে।।

আরে ঝনুকার ভরতে হাটিবার নাপাং বন্দু
কোলাত করিয়া নে মোকে
অ' মোক ঝুনুকা গড়েয়া দে
অ' মুই বুজুনু............গড়েয়া দে।।

ঘরেরে পাছিলায় ভাঙা না কাচি খান
মালা গড়েয়া দে মোকে
অ'মোক ঝুনুকা গড়েয়া দে
অ' মুই বুজুনু............গড়েয়া দে

মাইরো নারে তোমরা কার ঘরের ছোকরা রে
ভরা দুপর বেলা লেবুর তলে কিসের খেলা
ছিরিয়া বাইগোনের বোটা মাইর নারে
তোমরা কার ঘরের ছোকরা রে
কি শারি আনচেন রে ভৈরব চান্দ
ও বালি না খায় মনেরে আভোলার ভৈরব চান্দরে।।

আমার রঘু হাট যায় কতয় শারি অনিয়া দেয়
মনের গৈরবে বালি পেন্দেনা রে
তোমরা কার ঘরের ছোকরা রে
ঘুরেয়া নিয়া জান নিয়া জান
কি পিন্দিবে তোর মায়েরে
আভোলার ভৈরব চান্দরে।।

আমার রঘু হাট যায়
কতই শাঙ্খা আনিয়া দেয়
কিসের গৈরবে বালি পেন্দেনারে
তোমরা কার ঘরের ছকরা রে
ঘুরেয়া নিয়া যাও নিয়া যাও
কি পিন্দিবে তোর বইনেরে
আভোলার ভৈরব চান্দরে।।

কি শাঙ্খা আনচেন রে ভৈরব চান্দ
ও বালি নাখায় মনেরে
আভোলার ভৈরব চান্দরে।।

আমার রঘু হাট যায় কতই সিদুর অনিয়া দেয়
মনের গৈরবে বালি পেন্দেনারে
তোমরা কার ঘরের ছোকরারে
ঘুরিয়া নিয়া যাও নিয়া যাও
কি পিন্দিবে তোর ভাউজেরে
আভোলার ভৈরব চান্দরে।।

কি সেন্দুর আনচেন রে ভৈরব চান্দ
ও বালিরনা খায় মনেরে
আভোলার ভৈরব চান্দরে।।
ঘুরিয়া নিয়া যাও নিয়া যাও
কি পিন্দিবে তোর মায়েরে
আভোলার ভৈরব চান্দরে।।

অ' প্রাণ কোকিলা রে
যখন কোকিলায় মুই আসিনা ছামটং
তোর কোকিলের আই মুই কান্দন শোনং
হাতের বারুণ মাটিত থুয়া
বসিয়া ভাবং
অ' প্রাণ কোকিলা রে একবার আসিয়া
একবার দেখা দিয়া
তোরে জইন্যে নারীর মন মোর থাকে ঝুরিয়া
অ' প্রাণ কোকিলা রে
যখন কুকিলায় মুই জল আনোং তোর কুকিলের আই মুই
কান্দোন শোনং
কাখের কলস ঘাটত থুয়া
বসিযা ভাবং
অ'প্রাণ কুকিলা রে একবার আসিয়া
একবার দেখা দিয়া
তোরে জন্যে নারীর মন মোর
থাকে ঝুরিয়া
অ' প্রাণ কুকিলা রে যখন কুলায় মুই
বিছনা পারো তোর কুকিলের আই মুই
কান্দন শোনং
বিছনা পারা ছারি দিয়া বসিয়া কান্দোং
অ' প্রাণ...........একবার..........ঝুরিয়া
আরে তোরে জন্যে নারীর মন মোর থাকে ঝুরিয়া
অ' প্রাণ ককিলা রেঁ
যখন ককিলা মুই বারা বাপেং
তোর কুকিলের আই মুই কান্দোন শোনং
হাতের গাইন মাটি থুয়া বসিয়া ভাবোং
অ' প্রাণ কুকিলা রে
একবার আসিয়া একবার দেখা দিয়া
তোরে জইন্যে নারীর মনমোর থাকে ঝুরিয়া

আর নাচিতে নাচিতে কমলা সুন্দরী
হালিয়া হালিয়া পরে রে
(আরে) ভাল করিয়া বাজাওরে দোতরা
কমলা সুন্দরী নাচে
ও তুই ভাল করিয়া বাজাওরে দোতরা
কমলা সুন্দরী নাচে

আরে কমলা সুন্দরীর পেন্দনের শাড়ি
রইদে ঝিলমিল করে রে
আরে কমলা সুন্দরীর কানের সোনা
নাচিয়া যাইতে ঢোলে রে
ও তুই ভাল করিয়া............নাচে।।

মুই কি এবাড়ি হতে ঐবাড়ি গেনু
ঘাটায় ছিপ ছিপ পানী
আরে গবরুর ভিজিল জামা জোরা
কইনার ভিজিল শাড়ি রে
তুই ভাল করিয়া.................নাচে।।

আবে কমলা সুন্দরীর নাচন দেখিয়া
রান্দনি রান্দন ছারে রে
ও তুই ভাল করিয়া...........নাচে।।

কমলা সুন্দরীর নাচোন দেখিয়া
জালোরা জাল ছাড়ে রে
ভাল করিয়া............নাচে।।

আজি সোনার বরণ পাখিরে
সোনার বরণ পাখিরে তোর হেঙুর বরণ আখি
দেশের পাখি বিদেশ গেলু
মোকে দিয়া ফাকি
সোনার বরণ পাখিরে

বাচ্চা হাতে পুষিনুরে পাখি
দুধ ভাত দিয়া
আর জাবার কালে গেলু পাখি
বুকে শেল দিয়া
সোনার বরণ পাখিরে।।

চাউল দিলং ভাইলরে দিলং
রান্দি বারি খায়ও
আর হৃদয় পালংকের মাঝে
শুয়া নিদ্রা যায়রে
সোনার বরণ পাখিরে।।

উরাং উরাং কররে পাখি
উরিয়া যায়া পরে
আর কোনজনা দরদি হবে
পাখি ধরিয়া দিবে মোকে রে
সোনার বরণ পাখিরে।।

গোয়ালপাড়িয়া লোকগান

অ' মোর বন্ধু ধন রসিয়া দেখা দেও মোক
একবার আসিয়া

আসিবার চায়া আসিলেন না
মনের আগুন মোর নিবাইলেন না
অ'মোর বন্ধু............আসিয়া।।

আরে বরনী ধানের ভাজিলং খই
সোনার বন্ধু মোর আছিলেন কৈ
কি অ' মোর বন্ধু ধন রসিয়া
জলপান খায়া জাও বগলে বসিয়া
কি অ'মোর বন্ধু............আসিয়া।।

কেনেরে বন্ধু তোর মন বিরস মন
খায়া জান মোর বাটার পান
অ' মোর....জলপান....বসিয়া
কি অ'মোর.....আসিয়া।।

আই সো বন্ধু ধন জলপান খান
শোনো বন্ধু মোর দোতরার গান
কি অ'মোর বন্ধু.....আসিয়া।।

মাহুত বন্ধু রে

আজি নদী না জাইয়রে বৈদ
নদী না জাইয়রে বৈদ
নদীর ঘোলা রে ঘোলা পানী

আজি নদীর বাও দোলেরে বৈদ
বারিত ধন তোমরা গাওরে
বৈদ আমি নারী তুলিয়ারে দিব পানী

আজি এক লোটা তুলিয়ারে
বৈদ আরো লোটা মোর তুলিতেরে
বৈদ খসিয়া পরিল মোর গালার চন্দ মালা

আজি বাপ নাই মোর ভাবিবে রে
বৈদ মাও নাই মোর কান্দিবে রে
বৈদ ভাই নাই মোক গড়োয়ারে দিবে মালা

ঐ চম্পা নদী পারে পারে বৈদ
আজি হংসা পঙ্খী কান্দে রে
বৈদ হংশার গলায় গজরে মতি মালা

ঐ রাজ হংশার কান্দনেরে বৈদ
মন নারয় মোর ঘরতে রে
বৈদ মন মোর বাইরাংরে বাইরাং করে
আজি নদী না জাইয়রে

সোনার চান্দ চান্দ রে
চান্দ হারাইলাম নৈদাতে
দৈও মিঠা দুধ মিঠা
আরো মিঠা ননি
তার চেও অধিক মিঠারে
বাচ্চা মাও সেই জননী
সোনার চান্দ কি চান্দ রে চান্দ হারাইলাম নৈদাতে।।

নিমাইর তলে বইসোরে বাছা
নিমাইর ছেরো কুশী
কোনবা জনে হরিয়া নিলেরে বাছা
সোনা মুখের হাসি
সোনার চান্দ কি চান্দ রে চান্দ হারাইলাম নৈদাতে।।

নিমাইর তলে বইসোরে বাছা
নিমাইর ছেরো পাতা
কোনবা জনে হরিয়া নিলোরে
বাছা সোনা মুখের কথা
সোনার চান্দ কি চান্দ রে চান্দ হারাইলাম নৈদাতে।।

গীতা পরো ভাগবত পরো
পণ্ডিত নামটি ধরো
সংসারে বুজাইতে পারোরে
বাছা মাওকে কেনো ছারো
সোনার চান্দ কি চান্দ রে চান্দ হারাইলাম নৈদাতে

মাহুত বন্ধু রে

ছাড়িয়া না যাইস রে
আরে ও কালা বুকে শেলরে দিয়া
হাঁটিয়া গৈতে কমর ঢোলে
আহারে কাংকিনি গাছের গুরা।।

(আরে) চম্পা নদীর বগলে বগলে রে
আরে ও কালা মাহুতে চলায় হাতী
হাতীর পিঠিত চরিবার আসি
করিলং পিরিতি কালা
ছাড়িয়া নাজাইস রে
আরে ও.........গুরা।।

গৌরীপুরের বগলে বগলে রে
আরে অ' কালা
বানিয়ার বসতি
কানের সোনা গরে বার আসে
করিলং পিরিতি কালা
কালা ছাড়িয়া.......গুরা।।

চকবাজারের বগলে বগলে রে
আরে ও কালা গোরালের বসতি
দৈ দুধ খাবার আশে
করিলং পিরিতি কালা
ছাড়িয়া নাজাইস রে
আরে..........গুরা।।

অ'............................
লাল টিয়া লাল টিয়া রে তোর
ভাষা নলের আগালে
বিনা বাতাসে ভাষা ঢোলে রে
অ'....................................
পাটের মনে পাট বেচায় মুই কলের মালিক সাজেয়া
আরেকটা বুঢ়ার বেটায় ভাদর মাসির ওরনা
লাল টিয়া...........রে

অ'.........................
কালবিহানে রংপুর যাব
কিনিয়া আনবো ছায়মানা
ওহোরে জল ভরিতে দিলোনারে বিছিনা
লাল টিয়া.............রে

অ'.................................
ভাঙিল একটা মাটির কলস
দাম হৈলেক তা দুই আনা
ওহো রে দায়াল বিধি না মারিস তুই না
লাল টিয়া...........................রে
অ'...........................

পল রোবসনের সেই বিখ্যাত গান যা শিল্পী শুধু দোতারার সঙ্গে গেয়েছিলেন

So he builds up him a boat with a mix up crew
With the eyes of black and brown and blue
Thats the reason you and I have
One world and have one sky.
We are in the same boat brother
In the same boat brother.
If you tip one nose it will rock
The other (one)
(In the) same boat brother
O! Lord looks down
On a holy place a holy place
O! Lord with me
What a sea of Heace
A place to love the human race
So he builds up him a boat with a mixed up crew
With the eyes of black and brown and blue.
Thats the reason you and I have
One world and have one sky
We are in the same boat brother
In the same boat brother
If you tip one nose it will rock the other one
Same boat brother
We are in the same boat brother.
In the same boat brother.
O! Lord look down......human race
So he builds up a boat with a mixed up crew
With the eyes of black and brown and blue
Thats the reason you and I have one world and have one sky
We are in the same boat brother
In the same boat brother
If you tip one nose it will rock the other one
The same boat brother
O! Lord look down
On a holy place
A holy place
O! Lord with me
What a sea of peace
A place to love the human race

So he builds up a boat with a mixed up crew.

নানা চোখে প্রতিমা বড়ুয়া

প্রতিমা মরে নাই

ড. ভূপেন হাজারিকা

প্রতিমা জীবনে কিছু পায়নি— কে বলে, কার এত সাহস? প্রতিমা কি কিছু পেতে এসেছিল? রাজঘরানার মেয়ে-রাজকন্যা রে রাজকন্যা। চাইতে আসেনি, দিতেই এসেছিল।

দিয়েছে। চলে গেছে।

একটা জীবন যতটুকু দিতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে গেছে প্রতিমা। জীবনের পায়ে পায়ে গানের খই ছড়াতে ছড়াতে মৃত্যুর দিকে চলে গেছে.....রেখে গেছে বিশাল ভাণ্ডার। গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে। গার্হস্থ্য নিয়ে ভাবেনি, সৌখিনতা নিয়েও নয়। সাধারণ পোশাক-আশাক, অথচ কী অসাধারণ সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব।

বার্নাড শ, রবীন্দ্রনাথ, শেকসপিয়র, গোর্কি, টমাস আলভা এডিসনরা স্কুল, কলেজের চৌকাঠ না পেরিয়ে যেমন ইতিহাস তৈরি করে গেছেন, সেই একই ধারায় ইতিহাস তৈরি করে গেছে প্রতিমা—প্রতিমা বড়ুয়া।

মির্জা গালিব বলতেন, আমি হচ্ছি আমারই ভেঙে যাওয়ার আওয়াজ। প্রতিমা নিজেকে ভেঙেছে অবিরত আর তার সেই ভেঙে যাওয়া থেকে গড়ে উঠেছে গানের প্রতিমা, গানের প্রাণ। হৃদয়ের গভীরতা থেকে যা উঠে এসেছে কণ্ঠে। গ্রাম, শহর, মহানগরে ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়েছে।

লোকগানে প্রতিমা বড়ুয়ার অবদান গবেষণার বিষয় হবে না? প্রতিমার জন্য আমরা কেউই কিছু করতে পারিনি। করবও না! পুরনো ইতিহাস ফিরে এলে লজ্জা কি তুমি পাবে না?...ও বন্ধু!

মৃত্যুর আগ দিয়েও কয়েকবার দেখা হয়েছে। ধুবড়ির হাসপাতাল থেকে গুয়াহাটির নিউরোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হল। মুম্বাইয়ের বিখ্যাত চিকিৎসক ফারহাদ কাপাডিয়াকে আনা হয়েছিল। সঙ্গে আরো ৪-৫ জন। সেপ্টিসেমিয়া হয়েছিল। কোনো কাটাছেঁড়া থেকে ইনফেকশন। সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল।

তেজপুরে অনুষ্ঠান ছিল। গৌরীপুরে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তায়ই অসুস্থ। সব খবরই আসছিল খুব দ্রুত। গুয়াহাটিতে আসার পর ওঁকে দেখতে গেলাম। গাইতে বলল। এতদিন ধরে যার সঙ্গে গেয়েছি, যাকে দিয়ে গাইয়েছি কত, সে গাইতে বলছে। গলা

মেলাচ্ছিল প্রতিমা।

.........ওরে সত্য কইরা কননা মোর মাহুত বন্ধুরে....

প্রতিমার গলা বুজে এল। ছলছল দুচোখে কিছু কি জানতে চেয়েছিল প্রতিমা?

সত্যটা ওঁকে বলিনি। বলতে পারিনি। এই প্রথম ওঁকে এভাবে ঠকালাম। কারণ জেনে গিয়েছিলাম, প্রতিমা মৃত্যুর দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। কদিন আগেই কোথায় যেন পড়ছিলাম, প্রতিমা জানিয়েছে, ভূপেনদা বলেছেন, 'দি ডে ইউ ডাই, দি ফোক সঙ্গস অফ গোয়ালপাড়া ডাই উইথ ইউ।'

প্রতিমা মারা গেল ২৭ ডিসেম্বর।

শোকমিছিলে 'আমি এক যাযাবর....' হাঁটছি আর হাঁটছি।

শেষ হল কোনো যুবতীর শোকভরা কথা...

শেষ হল কি?

আমার চেয়ে অনেক বড় মাপের যাযাবর ছিল প্রতিমা। ওকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছি। এ প্রতিমার বিসর্জন হয়? কপালের মাঝখানে অত বড় লাল টিপ, ওইরকম আটপৌরে শাড়িতে কত দুর্ধর্ষ রোমান্টিক।

এই প্রতিমাকে কে ভাসায়, কার সাধ্যি? না, প্রতিমা মরে নাই।

নিশীথ রাত্রির প্রতিধ্বনি শুনি আমি প্রতিধ্বনি শুনি.....

বনবিহারীর স্মৃতিচারণ

বুদ্ধদেব গুহ

আসামের কথা দিয়েই যখন শুরু করেছিলাম তখন আরও কিছুদিন আসামেই থাকি। মূলত নামনি আসাম। আসামের ও মণিপুর ও নাগাল্যাণ্ডের অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে পরে লিখব।

ধুবড়ি শহর থেকে, যে শহরের নেতাধোপানি ঘাট থেকে রওয়ানা হয়ে বর্ষার দামাল ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে শালমাড়া হয়ে জিঞ্জিরাম নদীতে গেছিলাম। অল্পদিন আগে এবং 'যারা পরিযায়ী'র পুজো সংখ্যা বেরুনোর পরে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেলাম যে শালমাড়ার সেই জনপদটি আর এখন নেই। ব্রহ্মপুত্র তাকে গ্রাস করে নিয়েছে। বর্ষার ব্রহ্মপুত্রর রূপ দেখতে হলে মিকির হিলস এবং কার্বি-আংলঙ্গ-এর পাদদেশে কাজিরাঙ্গা থেকে শুরু করে দিগন্তলীন ব্রহ্মপুত্রকে দেখতে হয়। যারা পদ্মা বা মেঘনা দেখেননি তাঁদের ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা দেখেই দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়।

ধুবড়ি শহর থেকে একটি পথ চলে গেছে নামনি আসামের বিখ্যাত পরিবার বড়ুয়াদের গৌরীপুরে। গৌরীপুরের রাজবাড়ির নাম 'মাটিয়াবাগ প্যালেস'। প্যালেস বলতে আমরা যেমন বুঝি এই রাজপ্রাসাদ তেমন নয়, খুবই সাদামাটা। বড়ুয়া পরিবারের বড় কুমার ছিলেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। 'মুক্তি' ছায়াছবিতে যে প্রকাণ্ড হাতিটিকে আপনাদের মধ্যে যাঁরা বয়স্ক তাঁরা দেখেছেন, মাটিয়াবাগের প্রাসাদের উঠোনেই সেই বড় বাহাদুরের কবর আছে। 'অ্যানথ্রাক্স' রোগে তার মৃত্যু হয়েছিল। তাও বহু যুগ হয়ে গেল। গৌরীপুরের বড় রাজকুমারীকে আমি বার কয়েক দেখেছি রূপসী থেকে দমদম এবং দমদম থেকে রূপসী যাওয়ার প্লেনে। তাঁর ছেলে মুনীন্দ্র বড়ুয়াকে চিনতাম। তিনি আমার পৈত্রিক নিবাস কলকাতার রাজা বসন্ত রায় রোডের 'কণীনিকা'র কাছেই বাড়ি করেছিলেন ষাটের দশকে। সুনীল বড়ুয়া হাতি শিকার করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গে হাতির তাড়া খেয়ে রাতের বেলা পালাতে গিয়ে নেপালিদের আলু-খোঁড়া গর্তে পড়ে যান। মেরুদণ্ডে চোট লগে। অনেক বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। বেডসোর হয়ে গেছিল। তিনি পরিণত বয়সে পৌঁছবার আগেই শয্যাশায়ী অবস্থাতেই মারা যান।

বড় রাজকুমারীর নাম নীহার বড়ুয়া। বড় রাজকুমারীও প্রথম বাঘ মারেন আট ন' বছর বয়সে। তখনকার দিনের সব রাজকুমারীরাই যেমন মারতেন। বড় রাজকুমারীর চেহারা অতি সম্ভ্রান্ত ছিল, ছিপছিপে ছোটখাট মানুষটি—ব্যবহার ছিল চমৎকার—সকলের সঙ্গেই। যাঁরাই বিভিন্ন রাজপরিবারের মানুষদের সঙ্গে মিশেছেন তাঁরাই জানেন যে 'রাজকীয়' ব্যবহার কেমন হয়।

মেজ রাজকুমারী ছিলেন প্রতিমা বড়ুয়া—যিনি গোয়ালপাড়িয়া গানের জন্যে বিখ্যাত—মাহুতবন্ধুদের গান যিনি পূর্বভারতে জনপ্রিয় করেছিলেন। কয়েক বছর আগে যখন ধুবড়ি বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গেছিলাম তখন তিনি ধুবড়িতেই ছিলেন। তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন আমি যেন অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করি। গেছিলাম। মাটিয়াবাগ প্যালেসে। অনেক কথা হল। উনি বারবার অনুরোধ করলেন ওঁকে নিয়ে আমি যেন কিছু লিখি। তেমন করে লিখতে হলে অনেক সময় দু'জনে একত্রে ব্যয় করতে হয়, পোর্ট্রেট ফোটোগ্রাফিতেও যেমন হয়। সেই সময় আমার ছিল না, তাই তাঁকে নিয়ে কিছু লেখা সম্ভব হয়নি।

গৌরীপুরের ছোট কুমার ছিলেন প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া—যাঁকে 'লালজী' বলেই চিনতেন সকলে। অনেকে বলতেন 'বাবা', বিশেষ করে হাতির জগতের মানুষেরা। অন্যরা বলতেন 'রাজা'। আমার সঙ্গে ওঁর তো বিশেষ আলাপ ছিলই, আমার বাবার সঙ্গেও ছিল। তিনি যতদিন শিকার করতেন দুর্দান্ত শিকারি ছিলেন। রাইফেল, বন্দুক ও পিস্তলেও তাঁর হাত ছিল দেখার মতো। পরে অবশ্য শিকার একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওঁর একটি 'খেদা' শিকারের ছবি তুলেছিলেন বাবা এইট মিলিমিটারের মুভি ক্যামেরা দিয়ে। হাতি কী করে ধরা হয়, তাদের কী করে শিক্ষা দেওয়া হয় সেইসব ধরা ছিল সেই ফিল্মে। এখনও খুঁজলে আমার অনুজদের কাছে হয়ত পাওয়া যাবে। অনুজেরা পৈত্রিক নিবাসেই থাকেন।

লালজীর মতো এত বড় হাতি-বিশারদ ভারতে ত বটেই সারা পৃথিবীতেই কম ছিলেন। ভারতের এলিফ্যান্ট প্রোজেক্ট-এর ডিরেক্টর এস. এস. বিস্ত্ সাহেবও ওঁকে ভাল করে চিনতেন। তখন অবশ্য বিস্ত্ সাহেব বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিরেক্টর ছিলেন এবং পরে দার্জিলিং-এর কনসার্ভেটর হন।

লালজীরও খুব ইচ্ছে ছিল যে ওঁকে নিয়ে একটি বই লিখি। যে কারণে প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে বই লেখা সম্ভব হয়নি, সেই কারণেই লালজীকে নিয়েও লেখা সম্ভব হয়নি। এই বাবদে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন আমাকে। সেই চিঠিটি আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত আমার বই 'বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে' আছে। আসলে অনেক কথাই ঐ বইটির দু'টি খণ্ডে আছে যা 'বনবিহারীর স্মৃতিচারণে'-এ ফিরে ফিরে আসবে।

প্রতি বছর শোনপুরে যে নানা প্রাণীর বিখ্যাত মেলা বসে তাতে ভারতের সব জায়গা থেকে গবাদি পশু তো বটেই হাতি, উট ইত্যাদিও আসে। লালজী হাতির পায়ের নখ, শুঁড়, কান ইত্যাদি দেখে তাদের দোষ গুণ বলতে পারতেন। কোনও ক্রেতা হাতি কিনতেন না লালজীকে দিয়ে না দেখিয়ে। শোনপুরের মেলাতে একজনই 'বাবা' ছিলেন, তিনি লালজী।

যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে পেশার কাজে মাসের মধ্যে প্রায় পনেরো দিন

আমাকে বম্বে দিল্লি এবং অন্য নানা জায়গা করতে হত। তাই নিরচ্ছিন্ন সময় বের করা ভারি মুশকিল ছিল। তবু একবার শিলিগুড়িতে কাজে গিয়ে খুঁজে খুঁজে লালজীর মূর্তির ডেরায় গিয়ে হাজির হলাম গাড়ি নিয়ে। মূর্তি নদীর উপরে এখন বনবিভাগ যে বিলাসবহুল চমৎকার অতিথিশালাটি করেছেন তার অনেক বাঁদিকে এক বিট-অফিসারের কোয়ার্টারে থাকতেন তখন লালজী তাঁর নিজস্ব দু'টি হাতি নিয়ে বুনো হাতিদের তাড়াবার জন্যে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারই তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। একটি হাতি ছিল 'বাঁয়া গনেশ'। মানে, শুধু বাঁ দিকের দাঁতটি ছিল তার। এক দাঁতি হাতিকে বলে 'গনেশ'।

লালজী যে চিঠিটি লিখেছিলেন আমাকে সেটি নিচে তুলে দিলাম। ওঁকে নিয়ে লেখা 'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর' বইটির আমি সমালোচনাও করেছিলাম একটি বড় কাগজে।

১২/৮/৮২

মূর্তি, জলপাইগুড়ি

গুহসাহেব,

আপনি বনপ্রেমী ও শিকারি, জঙ্গলকে নানা রূপে দেখেছেন ও তার বিভিন্ন ঋতুতে রাত্রে দিনে অন্ধকার জোছনায় তার বিভিন্ন রূপ অনুভব করেছেন—যা আপনার বইগুলিতে ফুটে উঠেছে।

এই বই-ই আপনি লিখলে অন্যরূপ নিত ও আরও ভাল হতো। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে দশ বছর চেষ্টা করেও একজন লেখক পেলাম না। পাঁচুবাবু জলপাইগুড়ির ডি আই জি পুলিশ ছিলেন। তিনি এসে আমাকে গ্রেফতার করে যতটুকু সম্ভব টেপ করে নিয়ে গেছিলেন। ১৯৭৮-এ। আপনার আলোচনার দাম আছে সেজন্য আনন্দ পেলাম তবে এ বই আরও বিশদভাবে সুন্দর হতো আপনার মতো লেখকের হাতে।

লোকে বলে, আমি নিজে কেন লিখি না। তার উত্তর খুব সহজ (আমার কাছে)—আমি যদি লিখতেই পারতাম তবে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করার সময় পেতাম না। 'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর' পড়ে আপনি খুশি হয়েছেন জেনে আমি মনে করি আমার কাজ সার্থক হয়েছে। কারণ আমরা জংলী, জঙ্গল বন্যপ্রাণী বিষয়ে কিছু বুঝি ও বোঝেন।

নতুন বই কিছু লিখেছেন কি? যদি লিখে থাকেন তবে অনুগ্রহ করে পাঠাবেন। এখানে দেড় বছর আছি। আমি ৬ মাসের মধ্যেই আমার কোটার ১০টা হাতি ধরে এখন জংলী হাতি তাড়িয়ে মানুষের ক্ষেত রক্ষা করছি। কিছু পারিশ্রমিক পাচ্ছি তবে লাভ একটাই যে জঙ্গলে থাকার সুযোগ পাচ্ছি ও আমার আরাধ্য বনদেবী প্রকৃতিদেবীকে নানারূপে দেখছি, অনুভব করে আনন্দ পাচ্ছি।

বড় চিঠি লিখে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। এমনিতে চিঠি বড়ই

হল। কিছু মনে করবেন না। বই পড়ার অঢেল সময় সেজন্য বই-এর প্রার্থনা জানালাম। আপনার যে বইয়ে তামারহাট, গারোহিল, ইত্যাদির উল্লেখ আছে সেগুলি কি পেতে পারি?

ভালোই আছি। আপনার মঙ্গল ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য মা মহামায়ার কাছে প্রার্থনা জানাই।

চিঠির উত্তর পাবার আশা রাখি।

ইতি—প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া (লালজী)

লালজী যাই-ই বলুন না কেন পাঁচু গোপাল ভট্টাচার্যের লালজীকে নিয়ে লেখা 'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর' একটি চমৎকার বই। আমি লিখলে ওঁর বইয়ের চেয়ে ভাল আদৌ হত না। পারলে বইখানি পড়বেন আপনারা।

লালজীর কন্যা পার্বতী বড়ুয়াও এখন হাতি বিশেষজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে ওর বাবারই মতো ও অনেক সময়ে কাজ করে। অনেকেই হয়ত জানে না যে পার্বতী ভাল গানও গায়—গোয়ালপাড়িয়া গান ও হস্তী কন্যার গান। পার্বতী এখন উত্তরবঙ্গে নিজের বাড়ি করে আছে। শিলিগুড়ি থেকে মাদারিহাট যেতে পথের বাঁদিকে একটু ভিতরে ওর বাড়ি।

হস্তীর কন্যা প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডে

পবিত্রকুমার ডেকা

প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগের কথা। সময়টা ১৯৫৯ সালের শেষদিকে হবে। নওগাঁর জয়শ্রী সিনেমা হলে তখন একটা ছবি চলছিল। বাংলা ছবি। পোস্টার দেখে ছবিটা দেখার জন্য দুরন্ত এক আকর্ষণ বোধ করেছিলাম। কারণ ছবিটার পরিচালক ও সঙ্গীত-নির্দেশক ছিলেন ভূপেন হাজারিকা। ছবিটার নামও ছিল একেবারে অন্য ধরনের — মাহুত বন্ধু রে।

ছবিটা বেশিদিন চলেনি। আমি কিন্তু তার মধ্যেই দু'বার দেখেছিলাম। আমার কাছে ছবিটার মূল আকর্ষণ ছিল ছবির গানগুলি। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গান — লোকগান — বাংলার নয়, আবার ঠিক আসামেরও নয়। 'তোমরা গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে', 'আল্লাহ্ আল্লাহ্ বল রে ভাই হায় আল্লাহ্ রসুল', 'হস্তীর কন্যা হস্তীর কন্যা', ইত্যাদি। ভূপেন হাজারিকা নিজে তো গেয়েছিলেনই, কিন্তু মূল আকর্ষণ ছিল নাম না-জানা একজন গায়িকার কণ্ঠ। টাইটেলে দেখেছিলাম গায়িকার নাম—প্রতিমা বড়ুয়া।

পরে জানতে পেরেছিলাম যে তিনি গৌরীপুরের রাজপরিবারের মেয়ে। মন দিয়ে গোয়ালপাড়ার লোকগীতি শোনার শুরু আমার সেইদিন থেকে। বলতে গেলে, গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতির প্রচার ও প্রসারের আরম্ভও তারপর থেকেই। প্রতিমা বড়ুয়ার কণ্ঠে লোকগান আসাম, কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য জায়গার শ্রোতাদের কাছে এনে দেয় গোয়ালপাড়ার লোকসঙ্গীতের নতুন স্বাদ। আসামের একটি জেলার গান স্থান করে নেয় সারা দেশে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গোয়ালপাড়ার লোকগানের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বলতে গেলে শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া, পরে বিবাহসূত্রে প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডে, প্রায় একাই চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর একক প্রচেষ্টা। গোয়ালপাড়ার লোকগান চর্চার জন্যে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইচ্ছা অনেকদিন শিল্পীর ভাবনায় রয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি। সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েও বরাবর বিফল হয়েছেন।

হস্তীর কন্যা : গুয়াহাটি দূরদর্শনের পক্ষে দিগ্বিজয় মেধির প্রযোজনায় ও প্রবীণ হাজারিকার পরিচালনায় প্রতিমা বড়ুয়ার সঙ্গীতজীবনের ওপর একটা ছবি—হস্তীর কন্যা'র চিত্রনাট্য করতে গিয়ে এই বিশিষ্ট শিল্পীকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একেবারে কাছে বসে তাঁর গান শুনেছি। বাষট্টি বছরের এই মহান শিল্পীর কণ্ঠ আজও সমান মধুর। উচ্চারণ একেবারে স্পষ্ট। নিজের কণ্ঠের

ওপর শিল্পীর বিশ্বাস আজও অটুট। গানের সঙ্গে যন্ত্রের অতিব্যবহার তিনি পছন্দ করেন না। হাতে-ধরা চাবির গোছা দিয়েই তাল ঠোকেন। সঙ্গে থাকে তিনজন বাদ্যযন্ত্রী। বয়োবৃদ্ধ সীতানন্দ রায়, যুবক বিমলকুমার মালি আর অভিজিৎ সরকার। এদের সবার সারা বছরের খরচ শিল্পী নিজেই বহন করে থাকেন। যদিও তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। খুব কষ্টের মধ্যেই দিন কাটান। তবুও এই কষ্টকে তিনি কষ্ট বলে মনে করেন না। যখনই কোনখান থেকে গান গাইবার আহ্বান পান, তাঁর মুখে ফুটে ওঠে আনন্দের হাসি।

শিল্পীর নিজের মুখে তাঁর জীবনের কথা শুনে আর প্রবীণের এখান-ওখান থেকে যোগাড় করা তথ্যে চোখ বোলাতে-বোলাতে এবং ডঃ ধীরেন দাসের 'ও মোর হায় হস্তীর কন্যা রে' বইটি পড়ে আর সেই সঙ্গে গৌরীপুরের রাজবাড়ি নিজের চোখে দেখে আমি অবাক হয়ে ভাবি—ইনি কোন্ পরিবারের মেয়ে আর আজ শুধু গানের জন্য, শিল্পের স্বার্থে সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে তিনি কী দুরবস্থার জীবনই না কাটাচ্ছেন। এ এক আশ্চর্য উপলব্ধি।

প্রতিমার পরিবার : মোটামুটি অষ্টম শতাব্দী থেকে প্রতিমা বড়ুয়ার পারিবারিক ইতিহাস পাওয়া যায়। আদিপুরুষ ছিলেন মণ্ডদাস। সেই থেকে শিক্ষাদীক্ষা-রাজ্যশাসন ইত্যাদিতে বংশানুক্রমিক কয়েক পুরুষের গৌরবগাথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকে এই বংশের সমস্ত উত্তরাধিকারী 'রাজা' উপাধিতে সম্মানিত।

১৮৫৬ সালে রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রাঙামাটি থেকে তাঁর বাসস্থান গৌরীপুরে স্থানান্তরিত করেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন অপুত্রক। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথমা পত্নী ভবানীপ্রিয়া ঘড়িয়াল ডাঙার সম্ভ্রান্ত দশরথ বসু পরিবারের বুদ্ধিকান্ত বসুকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। নামকরণ হয় প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া।

১৯০১ সালে রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া শিক্ষাদীক্ষা-সঙ্গীত তথা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে নিজের জমিদারিতে তাঁকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার পত্নী ছিলেন শিক্ষিতা, ধর্মপ্রাণা, উদার মনের অধিকারী। নাম সরোজবালা। প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ও সরোজবালার পাঁচটি সন্তানের প্রথম জন ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের অগ্রদূতদের অন্যতম প্রমথেশ বড়ুয়া। আর দুই কন্যার নাম নীহারবালা ও নীলিমাবালা। আর-এক পুত্রের নাম প্রকৃতীশ বড়ুয়া।

চতুর্থ সন্তান প্রকৃতীশ বড়ুয়া ছিলেন একজন প্রখ্যাত হাতিশিকারি। সবার কাছে পরিচিত ছিলেন 'লালজী' নামে। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমথেশ বড়ুয়া জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ না-করে কলকাতার চলচ্চিত্রজগতে নিজেকে ব্যস্ত করে ফেললে স্বভাবতই তার দায়িত্ব গিয়ে পড়ে কুমার প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার ওপর।

হস্তীর কন্যা প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডে

প্রকৃতীশ বড়ুয়া ও তাঁর পত্নী মালতীলতা বড়ুয়ার প্রথমা কন্যাই স্বনামখ্যাতা লোকসঙ্গীত শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া। ১৯৩৪ সালের ১৩ অক্টোবর কলকাতার বালিগঞ্জের বাসভবনে প্রতিমা বড়ুয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরের দুই বোন — পূর্ণিমা ও প্রতিভা।

প্রতিমা বেড়ে উঠেছিলেন রাজপরিবেশে। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন কলকাতায়। পরবর্তীকালে গৌরীপুর মহিলা উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

ষাট বছরের সুদীর্ঘ জীবনের রয়েছে বহু ঘটনা, বহু কাহিনি। নিপুণ শিকারি প্রতিমা বড়ুয়া থেকে সঙ্গীতশিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া। ছয়ের দশকে বিবাহসূত্রে হন প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডে। শিল্পীর ঘটনাবহুল জীবনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এই প্রতিবেদনের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। সে জন্য তাঁর সঙ্গীত জীবন কীভাবে শুরু হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু কথা শিল্পীর নিজের কথাতেই তুলে ধরব।

সঙ্গীত জীবনের উৎস : বন থেকে জংলি হাতিদের ধরে এনে তাদের 'শিক্ষিত' করা হয়। ঐ শিক্ষার সময় মাহুতরা একরকম গান গেয়ে থাকে, যাকে বলে মাহুতের গান।

শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে মানুষের স্পর্শ দিয়ে মানুষ সম্পর্কে ঐসব জংলি হাতির ভয় কাটানোর চেষ্টা করা হয়। আর চেষ্টা করা হয় যাতে হাতিরা উপলব্ধি করতে পারে তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও দরদ।

আমার জীবনের থিম সঙ এখানে থেকেই গঠিত হয়েছিল। এ-ই ছিল আমার 'মিউজিকে'র 'ইন্সটিটিউশন'।

যখন মাহুতরা গান গাইত, আমার বাবা আমাকে সেখানে গিয়ে সে সব গান শুনে ভালো করে শিখে নিতে বলতেন। আমি মাহুতদের গাওয়া সে সব গান খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। মাহুতরা যদিও বিভিন্ন জায়গার মানুষ, গানগুলি কিন্তু ছিল সব গোয়ালপাড়ার লোকগান। বিহার থেকে আসা মাহুতও সেখানে ছিল। সকলেই এই গান গাইত।

হাতি ধরার জন্যে যেখানে তাঁবু খাটানো হত, সেখানে একদিকে থাকত মাহুতদের থাকার ঘর। অন্যদিকে আমার আর বাবার থাকার ব্যবস্থা। সন্ধ্যাবেলায় মাহুতরা দোতারা বাজিয়ে গান শুরু করত। আমি বাবাকে বলে তাদের কাছে গিয়ে বসে ঐ গান শুনতাম। ঐখান থেকেই আমার গান শেখার শুরু।'

'হস্তীর কন্যা' প্রতিমা বড়ুয়া এভাবেই তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু করেন।

প্রতিমা বড়ুয়াকে যেমন দেখেছি

পরিতোষ দত্ত

গোয়ালপাড়ার গৌরীপুর রাজবাড়ির আদি পুরুষ ছিলেন কোচমহারাজ নরনারায়ণ ও তস্যভ্রাতা চিলা রায়ের বান্ধব। নাম কবীন্দ্র পাত্র। সেই বংশের শেষ রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার পৌত্রী প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া। পিতা লালজী ওরফে প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া এক বিচিত্র মানুষ। এ বংশের বড় ছেলে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া সে আমলে বাংলা সিনেমার নয়নের মণি। পিতা প্রভাতচন্দ্রের সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল। তিনি সে আমলের 'ছোটলোকের' গানের সমাদর করতেন। প্রতিমা তাঁদের বাড়ির মাহুত, মইষালদের কাছে শুনে শুনে গাইতেন। জঙ্গলের মধ্যে শিখবার জন্য তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু পর্দায় বাঁধা হয়নি। অত্যন্ত সহজে বিনা আয়াসে তিনি গাইতেন। পাশে দোত্‌রা ঢোল, সারিন্দা, হাতে নিতেন ঘুঙুর। লালজীর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় কবে থেকে বা কবে সম্পর্ক বড়ভাই-ছোটভাইয়ে দাঁড়িয়েছিল আজ আর তা স্মরণে নেই। তিনি আমায় 'ভায়া' বলতেন। প্রতিমা সে কারণে দেখা হলেই প্রণাম করতেন। কলকাতায় এলে খোঁজ নিতেন, পিতার মতো তিনিও আমার বাড়িতে আসতেন, এমনকি গানও গেয়ে গেছেন—। প্রতিমার পিসি নীহার বড়ুয়াও ছিলেন ঐ অঞ্চলের নাচ-গানের সংরক্ষক প্রচারক। আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি গঠনের পর আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাই এবং প্রতিমাকে সংবর্ধনাও জানাই। গোয়ালপাড়া একসময় অবিভক্ত কোচরাজ্যে ছিল। এখানকার ভাওয়াইয়াকে প্রতিমারা 'গোয়ালপাড়িয়া' গান বললেও মূলত তা ঐ একি শৈলীর। তবে কথায় ফারসী শব্দ অনেক বেশি। প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে ক্রমশ মুসলিম প্রভাব বাড়ার ফলে দুই সংস্কৃতির আদানপ্রদানে এক নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। পুরাতন আমলে বিয়ের গান, সিঁদুর খেলার গান মুসলিম সমাজেও প্রচলিত ছিল। আর ছিল নদীর বাঁকে বাঁকে চর অঞ্চলে মোষের বাথান। গৌরীপুরের রাজবাড়িতে অরণ্যের মোষ ধরার নানান ফাঁদ দেখেছি। নীহারদি তার উপর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। ভাটিয়া খেদাও আন্দোলনের বিরুদ্ধে নীহারদিদের আন্দোলন আজও মনে ভাসে।

১৯৪৭ সনের পর প্রথম কামতাপুরী রাজ্য গঠনের যে উদ্যোগ কোচরাজ্যের হিতসাধনী দলের কিছু জোতদার নেন, গোয়ালপাড়ার সব জমিদার-জোতদার তাতে যুক্ত হলে, লালজী নিজেও যুক্ত হন। কেন আন্দোলন ছাড়লেন সে প্রশ্নের জবাবে সহাস্যে বলেন—'অংপুর, দিনাজপুর তামাম চলি গেইল পাকিস্তানে তো কামতাপুর আর কেমন করি হয়?'

লালজী ঐ কথ্য ভাষায় আমায় পত্রাদি দিতেন, মায় গান সংগ্রহ করেও পাঠাতেন। এহেন পিতার কন্যা, রাজা প্রভাতচন্দ্রের পৌত্রী প্রতিমা তাই অতি সহজে ঐ সংস্কৃতির ধারক-বাহক এবং সার্থক পরিবেশক হন। তাঁর দোতরার তার ছিল সুতোর। ঢোল সহকারে, সারিন্দা নিয়ে গান ধরতেন। উচ্চস্বরে নয় কারণ জঙ্গলের শিক্ষা তাঁকে সুরের প্রতিধ্বনি বিষয়ে সজাগ রেখেছিল।

পিতামহ প্রভাতচন্দ্র শিকারে যেতেন। লালজীও। প্রতিমা একসময় রাইফেল ধরেছিলেন। বেশ কয়েকটা বাঘ (চিতা) মারেন। প্রভাতচন্দ্রের শিকার কাহিনি সংবলিত বেশ কয়েকটি বাঁধানো খাতা পড়েছিলাম। প্রতিমার আর এক বোন তো হস্তিকন্যা হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। লালজী তাঁর প্রিয় হাতি প্রতাপ মারা গেলে গয়ায় পিণ্ডি দেন। হেসে বলতেন—পাইসা দিলে বামুন না পারে কাম নাই। আরে প্রতাপক্ হস্তি কাঁয় কয়।' একসময় বন্য হাতি ধরা ছিল লালজীর নেশা ও আংশিক পেশাও।

হস্তীর গান তৈরি হতো বন্য হস্তীকে বশ করার সময়। দোতরার ভাং ও সুর হাতিকে মোহিত করতো। আর সুরের হঠাৎ সিঁড়ি ভেঙে পড়া তেমনি ছিল নিতান্তই সহজ ও সরল। মোষ চড়াবার চলনের ছন্দ, হস্তীর চলনের ছন্দ তাঁর গানে অনায়াসে চলে আসতো। আমি প্রথম তাঁর গান শুনি অসমের কচুগাঁওয়ের এক জঙ্গলের মাঝে ধুনি জ্বালিয়ে হস্তী দলের সন্নিকটে। সে সুর যেন আজও মনকে দোলা দেয়। সনটা মনে নেই তবে তা ১৯৬৫-৭০-এর মধ্যে হবে।

গানের মধ্য দিয়ে, কথার ফাঁকে ফাঁকে যে সুর নেমে আসতো তা তো হৃদয় নিঙড়ানো। হাতি ধরার গানের সুরকে বলে বিরুয়া। লালজী বলেছিলেন—হাতিকে কিছু ছাড়ার শিক্ষায় 'বির বির'—ছাড়ো ছাড়ো শব্দ ব্যবহার থেকে বিরুয়া এসেছে। বিরুয়া যেন বিরহের পরিপূরক।

একটি গানে অন্য ধর্মের মাহুতকে বিবাহ করার কথা বলা হয়েছে। বি জে পি তা বোধহয় জানে না।

তুই মাহুতের গুণো শুনিয়া
আমরা দিলাম হাতি।
জাতি দিনু কুলো দিনু
রে মাহুত তোমার নাগিয়া
এলায় কেনে ছাড়িয়া যাচ্ছেন
নিদয়া হইয়া।

আর একটি গানে শুনতাম

তোমরা যাইবেন মইষ বাথানে
রে মইষাল মোর পোড়ে হিয়া
এই সোনার যৈবন কি

মাহুত বন্ধু রে

রাখিস কাপড়ে বান্ধিয়া
মইষাল-ও

আমার বাড়িতে বসে মাহুত দোত্‌রা বাজকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইলেন স্বয়ং রাজকন্যা প্রতিমা—

প্রাণ কুকিলা রে
একবার আসিয়া একবার দেখা দিয়া
তোরে বাদে মনটা মোর থাকেরে
কান্দিয়া

গঙ্গাধর। গদাধর নদীর পাড়, রায়মনা জঙ্গল, রায়ডাক নদীর পাড় সব এসব গানে বারংবার এসেছে। প্রতিমা এসব এলাকা তাঁর বাবার সাথে চষে বেড়িয়েছেন। ফলে তাঁর গানের সুরের সাথে স্থানীয় ভূগোল বাঁধা থাকতো। আর আমরা মোহিত হয়ে মইষাল, মাহুত, গাড়িয়ালের সাথে তা পরিক্রমা করতাম। মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গান শোনাতেন। নিয়ে যেতেন আর এক মোহনায়। পরতে পরতে বিস্ময়।

কেমন গাইতেন প্রতিমা? আমার শোনা শিল্পীদের মধ্যে অমন প্রাণজুড়ানো গলা এবং পরিবেশন শুনিনি। তবে একটু দুষ্টুও ছিলেন। আব্বাস-কন্যা ফিরদৌসি গাইলেন অতি পরিচিত একটি গান, প্রচলিত ৭ মাত্রায়। প্রতিমা সেই গানই দাদরা তালে গাইলেন। হেসে প্রশ্ন করলেন—কি, খারাপ হ'ল? গানটি ছিল 'ওকি ও বন্ধু কাজল ভোমরা।'

উত্তরবঙ্গে তাঁর স্থান ছিল অতি উচ্চে। জনসাধারণ উতলা হয়ে থাকতো কখন প্রতিমা গাইবেন। সে দলে মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া, যোগেশ বর্মন থেকে অতি সাধারণ কৃষককেও দেখেছি। প্রকৃতি ও পরিবেশ ছিল তাঁর শিক্ষক। মৃত্যুর মাত্র ২/৩ দিন পূর্বে ডঃ ভূপেন হাজারিকা তাঁকে দেখতে যান, গানও শোনান। কাগজে পড়েছি প্রতিমাও গলা মেশান। তোমরা গেইলে কি আসিবেন, ও মোর মাহুত বন্ধুরে—মূল গানটি হাজারিকা ও প্রতিমা একসাথে গান। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভাষায় বলতে হয় প্রতিমার সাথে ভূপেন গেয়েছিলেন। দুজনার পরিবেশনা এতো পৃথক যে অতি সহজেই ধরা যেত লুইতের তরঙ্গে পাহাড়ী নদী রায়ডাক তার নিজের স্থান সহজেই করে নিয়েছে।

আব্বাসউদ্দীন নেই। ও গলা তো আর হ'ল না। টেপু মিঞার গলাও আর পাইনি। প্রতিমার গলাও তেমনি। এ গলা তো সাধনায়, বিচিত্র পরিবেশে হয়েছে। যেমন এ বঙ্গে আছেন অমর পাল।

প্রতিমার মৃত্যু একটি অধ্যায়ের অবসান ঘটালো। গৌরীপুরের মাটিয়াবাগ বাড়িটি দেখবার শেষ আকর্ষণ চলে গেলেন। যেতাম লালজীর টানে, পরে কন্যা প্রতিমার খোঁজ নিতে।

আর কি দেখির বাদে যামো গঙ্গাধরের পাড়ে? ওহো মন মোর ঝুরিয়ারে পরে।

দেখা হলেই প্রথম কথা ঃ কিরে মন্ত্রী কেমন আছিস?

যোগেশ বর্মন

তোমার মইষের ঘণ্টা বাইজে
মন উড়াং বাইরং করে রে।...

যেভাবে উঠে এলে কবিতা গান হয় কিংবা গান কবিতা, ঠিক সেভাবেই প্রতিমা বড়ুয়ার কণ্ঠে উঠে এসেছে এইসব লোকগান। গোয়ালপাড়িয়া লোকসঙ্গীতে কিংবদন্তি হয়েছেন জীবিত থাকতেই। বহুবার রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় এসেছেন অতিথি শিল্পী হিসেবে। যে ঘরে জন্ম ওঁর আর যে কণ্ঠসম্পদ ছিল তাতে মুম্বই কেন লন্ডনেও যেতে পারতেন। শুধু যে গাইতেন তা তো নয়, গান কুড়োতেন, যেভাবে শরতে শিউলি কুড়োনো হয়, তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ ছিল গানের কথামালা সংগ্রহ। গোয়ালপাড়িয়াই নয় শুধু, লোকগান সে রাজবংশী কামরূপী যে ভাষাতেই হোক না, প্রতিমা বড়ুয়া তাঁকে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

প্রতিমাদি নিজে একটা ঘরানা। ওঁর জাতটা নিজেই চিনিয়েও দিয়ে গেছেন। ওঁর বাড়িতে কখনও যাওয়ার সুযোগ হয়নি। ওঁর কাছে শুনে শুনে খুব লোভ হত। যাব—ভাবতাম, একদিন ঠিক চলে যাব।

জীবনের এপারটা ভালোভাবেই দেখে গেছেন। ওপার বলে কিছু আছে এমন বিশ্বাস খুবই গভীর ছিল ওঁর। আমার মনে হয় সেরকমই কিছু একটা ঘটেছে। ওঁর কানে ঠিকই পৌঁছবে, 'দিনে রাইতে, ওরে মইষাল, কান্দি কান্দি মরি রে'।

দেখা হলেই প্রথম কথা ছিল, কি রে মন্ত্রী কেমন আছিস? কয়টা চাকরি বাকরি দিতে পারবি আমাদের ওদিককার ছেলেপুলেদের। প্রতিমাদির মৃত্যুতে গোয়ালপাড়িয়া গান বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব যেমন পড়ল ওঁর দুই মেয়ের ওপর, তেমনই আমাদের ভাটিবাড়ির সুলেখা রায় এবং চিলকির হাটের সঙ্গীতা রায় ওঁর উত্তরসূরী হবে, খুব আশা।

দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে

সুখবিলাস বর্মা

লোকসঙ্গীত জগতের একটি বৃহৎ নক্ষত্র খসে পড়ল। ভারতের মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পী যাঁরা লোকসঙ্গীত, লোকসঙ্গীতের উন্নতিকে এবং সেই সঙ্গে লোকসঙ্গীত শিল্পীর কল্যাণ ও অগ্রগতিকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নিয়েছিলেন—প্রতিমা বড়ুয়া ছিলেন তাঁদের অন্যতম। লোকসঙ্গীত দরদী প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী সেই প্রতিমা বড়ুয়া আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। এই শিল্পীর পরিচয় নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রাচীন কামরূপ অঞ্চলের ঐতিহ্যপূর্ণ লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া-চটকার প্রাণকেন্দ্র গোয়ালপাড়া, কোচবিহার ও রংপুর জেলা। গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুরের জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। কিন্তু তাঁর মেজাজে কখনো জমিদারিত্ব প্রকাশ পায়নি। পিতামহ প্রভাত বড়ুয়া ছিলেন জমিদার। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র প্রকৃতীশ বড়ুয়া (লালজী) ছিলেন দিলদরিয়া চরিত্রের মানুষ। প্রকৃতীশ ছিলেন সত্যিকারের অর্থেই প্রকৃতি প্রেমিক। সেই প্রকৃতিপ্রেমিক ব্যক্তির প্রথম কন্যা প্রতিমা বড়ুয়াও ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতি প্রেমিক। হস্তীবিশারদ প্রকৃতীশ বড়ুয়া জমিদারির চেয়ে হাতি ধরাকেই প্রধান পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন। ভূটানের জঙ্গলে, জলপাইগুড়ির জঙ্গলে তিনি দলবল নিয়ে হাতি ধরতে যেতেন। মাহুত, ফান্দি ও খেদার কাজে নিযুক্ত দলবলে থাকত বেশ কিছু লোকসঙ্গীত শিল্পী। তাদের কেউ বাজাত দোতোরা, কেউবা সারিন্দা, বাঁশি, ঢোল, আবার কেউ কণ্ঠশিল্পী। সারাদিনের হাতি ধরার কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা বসত গানের আসর। ভাওয়াইয়া গান-গাড়িয়াল, মইষাল, হাতি/মাহুত বন্ধুর গান-বিরহ বিধুরা নারীর মনের গান। সঙ্গে চলত সদ্য ধরা হাতির শিক্ষা। কিশোরী প্রতিমা এই হাতি ধরার ক্যাম্পে অনেকবার যোগ দিয়েছেন বাবার সঙ্গে। শুনেছেন সেইসব গান। গলা মিলিয়েছেন সবার সঙ্গে। এভাবেই ভাওয়াইয়া চটকা-উত্তরবঙ্গ-অসমের লোকসঙ্গীতে তাঁর তালিম শুরু গ্রামের খাঁটি সুরের। আর শুধু হাতি ধরার শিবিরেই নয়—জমিদার বাড়ির চারদিকে গরিব প্রজাদের মধ্যে অনেক গুণী শিল্পীর কাছ থেকেও তিনি নিরন্তর শুনেছেন এই গান। নিষ্ঠাভরে তাদের গাওয়া সুর আপন কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন। এইভাবেই তিনি আয়ত্ত করেছেন ভাওয়াইয়া-চটকার খাঁটি সুর। এছাড়া গ্রামের নানা পূজা পার্বণে শুনেছেন নানা অনুষ্ঠানমূলক গান—কাতি, ষাইটোল, সোনা রায়, গোরখনাথের গান—দোতোরা কুশান, ভাসান যাত্রা, পদ্মপুরাণ, পালা গান। জমিদার বাড়িতেও এইসব অনুষ্ঠানের কমতি ছিল না। সর্বোপরি ছিলেন তাঁর পিসিমা নীহার বড়ুয়া। নীহার বড়ুয়া যৌবনের প্রাক্কাল থেকেই লোকসঙ্গীত সংগ্রহে-ভাওয়াইয়া চটকা সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছিলেন।

এই পিসিমার কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন অনেক গান। পিসিমা নাচও করতেন খুব সুন্দর। উল্লিখিত এইসব সঙ্গীতের সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গোয়ালপাড়ার বিয়ের গান। এভাবে খাঁটি লোকসঙ্গীতের এক মনোরম সাংগীতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন তিনি। ধীরে ধীরে নিজেকে এই সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধকরূপে গড়ে তুলেছেন এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই সঙ্গীত সাধনায় মগ্ন হয়ে ছিলেন। গত একবছরে বেশি তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না—কিন্তু কোথাও সঙ্গীত পরিবেশনের প্রস্তাব এলে অসুস্থ শরীরেও প্রত্যাখ্যান করা তাঁর স্বভাবে ছিল না।

আব্বাসউদ্দিনের জন্মস্থান বলরামপুর গ্রামে। বলরামপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য দল সহ পৌঁছলেন। রাত তখন প্রায় ৮.৪৫ মিনিট। প্রতিমাদি এসেছেন শুনেই দেখা করতে গেলাম। দেখে মনে হল তিনি সুস্থ নেই। দিদির সঙ্গে দেখা হলে সাধারণত দূর থেকেই স্বাগত জানান। কিন্তু সেদিন তাঁর দিক থেকে কোনো প্রকার সাড়া না পেয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম—দিদি, মোক চেনা যায়? বললেন—কায়? পরিচয় দিতেই জড়িয়ে ধরলেন-সুখবিলাসবাবু! দেখেন তো মোর শরীলে চলে না-কিন্তুক ইমরা তো ছাড়েই না—কাজেই আসলোং। মোক বোল এলায় আসর দেওয়া নাইগবে। অর্থাৎ এখনই আমাকে মঞ্চে উঠতে দিতে হবে। বললাম—তোমাক এলায় দিলে কি করি চইলবে? প্রতিমা বড়ুয়া এলায় গান কইরলে উমার পরে কায় আসর জমেবার পারিবে? দুই একজনের পরে রহিমা কলিতা, আর তারপরেই তোমার গান-মুই না হয় পরে করিম্।

প্রতিমাদি রেগে উঠলেন, বললেন—রহিমা কি মোর চাইতে বড় গায়ক হইচে—মোর গান ঝাড়ি উয়ার গান শুইনবে মানসি? দিদিকে এভাবে রেগে যেতে দেখিনি কখনো। বুঝলাম শরীরটা ওঁর সত্যি সত্যিই ভালো নেই। ওঁর চোখ মুখেও সে কথা স্পষ্ট। ছেলেমানুষের মতো জেদ ধরলেন—হয় মোক এলায় গান করির দিবেন, না হইলে মুই গান করিম না। মুই আর বসি থাকিব না পাওং। বাধ্য হয়ে তাই করতে হল। ঘোষণা হল এরপরে আসছেন ভাওয়াইয়া চটকার বুলবুল হস্তীর কন্যা পদ্মশ্রী প্রতিমা বড়ুয়া। সঙ্গে সঙ্গে ২০/২৫ হাজার শ্রোতার তুমুল করতালি। কোনোপ্রকারে ধরে ধরে স্টেজে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলাম। যন্ত্রপাতির সুর ঠিক করে প্রতিমাদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন—'সুধি শ্রোতৃবৃন্দ, আমার শরীর আজ ভালো নেই আপনাদেরকে আজ আর বেশি গান শোনাতে পারব না।' শুরু করলেন গান—একটার পর একটা। প্রতিমাদির মধুমাখা কণ্ঠ আর গায়নভঙ্গিতে শ্রোতাগণ উদ্বেল। সেই রাত্রের পর আর প্রতিমাদির সঙ্গে দেখা হয়নি। গত ১২ ডিসেম্বর বক্সিরহাটে অনুষ্ঠানে গিয়ে জানতে পারি প্রতিমাদি অসুস্থ। সেখানেই কোচবিহারের সরোজ দেবনাথকে বললাম—একদিন গিয়ে দেখে আসুন—খবর দেবেন। দিদি কেমন আছেন। দেবনাথ বাবু খবর দিলেন—কিন্তু সব শেষ হয়ে যাবার পর। টেলিফোনে কান্না চেপে বললেন—স্যার, প্রতিমাদি আর আমাদের

মধ্যে নেই—সেকথা নিশ্চয়ই খবরের মাধ্যমে শুনেছেন। আমি শ্মশানে গিয়েছিলাম—দেখলাম এক অপূর্ব দৃশ্য। শ্মশানে হাজার হাজার মানুষ। তারই মধ্যে অসংখ্য শিল্পী দোতারা নিয়ে এসেছেন—তারা দোতারার ডাং-এ গানে গানে শ্রদ্ধা জানালেন প্রতিমাদিকে। শ্মশানে এ এক অভিনব দৃশ্য। মাটিয়াবাগের কাছে গঙ্গা তীরের পারের শ্মশানের কথা উঠতেই স্মৃতিতে ভেসে ওঠে মাটিয়াবাগে প্রতিমাদির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটার কথা।

সেটা ছিল ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসের এক দুপুর বেলা। ১৯৯০-এ আমরা কয়েকজন মিলে আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি গঠন করেছি। সমিতি ২৭ অক্টোবর কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে আব্বাসউদ্দীনের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে আসার দায়িত্ব দিয়েছে আমার ওপর। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য কোচবিহারের চন্দন পালকে সঙ্গে নিয়ে আমি ও চন্দন চক্রবর্তী প্রতিমাদির বাড়ি যাব বলে স্থির করলাম। সঙ্গে পেয়ে গেলাম প্রতিমাদির মামা, শচীন কর্তার ভাগ্নে রসিকরাজ কুমার নিধিনারায়ণকে। মাটিয়াবাগে পৌঁছেছি বেলা ১১টার দিকে। খবর পেয়েই এলেন তিনি। নিধিদা পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রতিমাদির প্রথম প্রতিক্রিয়া—মামা তুই কেমন মানসি? এই শুনদুয়ার সময়ে মানসিগুলাক আনেলু খবরাখবর না দিয়া, আর সাথত কিছু আনিসও নাই!

চন্দন চক্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—কিছু মনে করবেন না। আমরা দেশি মানুষ একসঙ্গে দেখা হলে দেশি ভাষাতে কথা বলতেই পছন্দ করি। দেশি ভাষা অর্থাৎ কামরূপী ভাষা বা রাজবংশী ভাষা। পণ্ডিতেরা উত্তরবঙ্গের এই ভাষার নাম কামরূপী, কামতাপুরী, কামতাবিহারী, রাজবংশী যাই দিন না কেন, এখানকার মানুষের কাছে এই ভাষার নাম দেশি ভাষা। এই দেশের মানুষ—রাজবংশী, খেন, ধোপা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান—সকলেরই মুখের ভাষা—তাই দেশি ভাষা।

প্রাথমিক পরিচয়াদির পর আমাদের আসার উদ্দেশ্য বললাম। আব্বাসউদ্দীনের কথা উঠতেই অনেক আলোচনা হল ভাওয়াইয়া গান নিয়ে। প্রতিমাদি গল্প করতে ভালবাসেন—তাই কোনো একটি প্রসঙ্গ উঠলেই প্রধানত তিনিই বলতে থাকেন। নিধিদা মাঝে মাঝে কথা জুগিয়ে দেন। নিধিদা—কুমার নিধিনারায়ণ কোচবিহার রাজার বংশধর। সঙ্গীতের পরিবার তাঁদের। তাঁর দাদা ছিলেন প্রখ্যাত বংশীবাদক। নিধিদা নিজেও বাঁশির শিল্পী। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতে তাঁর পারদর্শিতা ঈর্ষা করার মতো। সেই নিধিদাও আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর সঙ্গেও শেষ দেখা হয়েছিল গত বছর বলরামপুরের ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠানেই। তিনি কয়েকমাস আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ভাওয়াইয়ার আকাশের আর একটি তারা সেদিন খসে পড়েছিল।

প্রতিমাদির জমিয়ে গল্প করার পরিচয় পরেও পেয়েছি—শীতলখুচির ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠানে, বিধাননগরে। দূরদর্শন কলকাতার পয়লা বৈশাখের প্রোগাম রেকর্ড করা

হবে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের স্পেশাল কোচ-এ। সাজানো কোচ-সেখানেই স্টেজ। এই ট্রেনেই শিল্পীরা যাবে বোলপুর—শান্তিনিকেতন—যেতে যেতেই থেমে থেমে নানা জায়গায়-নানা ভঙ্গিতে শুটিং। সঙ্গে লাগানো প্রথম শ্রেণীর কামরায় শিল্পীদের শোওয়া, বসা, আড্ডা দেওয়ার ব্যবস্থা। ট্রেনে উঠেই দেখি প্রতিমাদি আছেন। আমাকে দেখে খুশি। দেখেই বললেন—তোমরাও যাইবেন? ভালে হইলেক। মন খুলি কথা কবার পামো। দেখা হলেই আমরা দেশি ভাষাতেই কথাবার্তা বলতাম। সেই ট্রেন যাত্রায় প্রতিমাদির পরিচয় পেয়েছিলাম নতুন করে। এক রসিয়ে, গল্প করার মহিলা। ট্রেনে ছিলেন প্রখ্যাত সুরকার গায়ক জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। আর ছিলেন পঙ্কজ সাহা। কলকাতা দুরদর্শনের অন্যতম এই কর্তাই ছিলেন অনুষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা। গল্পে গল্পে মশগুল হয়েছিলাম—গল্প বলার প্রধান ভূমিকা ছিল প্রতিমাদির।

লোকসঙ্গীত প্রেমিকদের কাছে প্রতিমাদি বেশি পরিচিত হস্তীর কন্যা নামে। 'আজি গেইলে কী আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে'—গেয়ে তিনি জনপ্রিয় শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন। হাতি ও মাহুত নিয়ে যত ভাওয়াইয়া চটকা রয়েছে তার সব কটিকে তিনিই জনপ্রিয় করে তুলেছেন—

হস্তীর কন্যা হস্তীর কন্যা বামনের নারী,
মাথায় নিয়া তাম কলসী ও সখি হস্তে সোনার ঝারি সখিও
ও মোর হায় হস্তীর কন্যারে,
খানেক দয়া নাই মাহুতোক নাগিয়া রে

অথবা

গদাধরের পারে পারে ও
ঐনা মাউতে চরায় হাতি
কী মায়া নাগাইলেন মাউতরে,
ও তোর হস্তে মোহন বাঁশি

ইত্যাদি আরো কত গান।

কিন্তু প্রতিমাদির কণ্ঠে শুধু হাতির গান নয়, ভাওয়াইয়া চটকা সব ধরনের গান তাঁর কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠত। মইষাল, গাড়িয়াল, হাতি, নদী—সব ধরনের গান। তিনি সাধারণত চিতান দরিয়া গাইতেন না—পছন্দ করতেন চলন্তি সুরের সোয়ারি, ক্ষীরোল অঙ্গের গান গাইতে। চলন্তি, সোয়ারি, ক্ষীরোল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার স্থান এখানে নেই—সে চেষ্টাও করছি না।

তবে এই সব গানের মধ্যে প্রতিমাদির কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এবং দেহতত্ত্ব/মনশিক্ষামূলক কিছু গানের আবেদনই আলাদা। যাঁরা তাঁর সামনে বসে শুনেছেন—ক্যানে হে রাধে তোর বিরস মন, হরি বলো মন রসনা মানব দেহাটার গৈরব কইরো না, দেহের কপাট খুলিয়া দেখিলে হয়, দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে রঙিনা

দালানের মাটি ইত্যাদি গান, তিনিই অনুধাবন করতে পারবেন আমার বক্তব্যের সত্যতা।

প্রতিমাদি জীবনে অনেক পেয়েছেন—সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমি-পুরস্কার, পদ্মশ্রী ইত্যাদি পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ ছিল শ্রোতাদের অকুণ্ঠ অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। একজন নিষ্ঠাবান শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি ছিলেন এক লোকপ্রিয় শিল্পী। সে পরিচয় পাওয়া গেছে শ্মশানে-যেদিন প্রাণপাখি উড়ে গিয়ে তার নশ্বর দেহটি শুধু পড়ে ছিল। তাঁর গানেই বলি—

দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে রঙিয়া দালানের মাটি গোঁসাইজি কোন রঙে।

এটি দেহতত্ত্বের গান। দিনে দিনে ক্ষয় হয় দেহ-এই হচ্ছে এ গানের সারাংশ।

হাড়ের ঘরখানি চামের ছাউনি বান্দে বান্দে তার জোড়া
তাহার উপরে ময়ুর ময়ুরী রঙে করে কতো খেলা।।
শিশুকাল যাইবে হাসিতে খেলিতে, যৌবন কাল যাইবে রঙে
বৃদ্ধ কাল যাইবে রোগে শোকে, গুরু ভজিব কোন কালে।।
দেহপাখি প্রাণপাখি একই পিঞ্জরে থাকে
দোনোজনে না হয় দেখাদেখি,
দেহপাখি এই রইবে প্রাণ পাখি উড়ি যাইবে
এই তো নিয়তির খেলা, গোঁসাইজি কোন রঙে।

প্রতিমা বড়ুয়া আজ পার্থিব জগতে নেই, আছেন ভাওয়াইয়া সুরের জগতে। যতদিন এ মাটিতে ভাওয়াইয়া সুর থাকবে, প্রতিমা বড়ুয়া থাকবেন প্রতি শিল্পীর সুর তরঙ্গে। প্রতিমা বড়ুয়াদের মৃত্যু নেই। ওঁরা বড়ুয়ারা অবিনশ্বর।

হস্তীর কন্যা

মনোজ রাউত

ঋত্বিক ঘটক আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। বাবাকে বলেছিলেন। বাবা বলেছিলেন, বিয়ে যাকে করতে চাইছ, তাকেই গিয়ে প্রস্তাবটা দাও। ঋত্বিকদা বোধহয় সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারেননি।

হস্তী লড়াই হস্তীরে চরাই হস্তীর পায়ে বেড়ি, কি ওরে-সত্য করিয়া কইলাম কন্যা গৌরীপুরে বাড়ি রে........ পদ্মশ্রী, সঙ্গীত নাটক আকাদেমির পুরস্কারও পেয়েছি। কত সংবর্ধনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নেমতন্ন। ডি লিট। আমি নাকি ডঃ প্রতিমা বড়ুয়া! আমার পরনের শাড়িখানা দেখ, পেট-ভাতেরই জোগাড় হয় না। ধুবড়ির অনেক নামকরা শিল্পী আছে একেকটা অনুষ্ঠানের জন্য ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা নেয়। আর প্রতিমা বড়ুয়া কত-৫ হাজার। যার আছে, সে যে অত টাকা নিয়া কি করিবে কায় জানে।

কচুর পাতের পানি যেমন রে
ও জীবন টলমল টলমল করে
ওই মতন মানুষের দেহা
কখন ঢলিয়া পড়ে জীবন রে —

সুখবিলাসটা সঙ্গে ছিল। সুখবিলাস মানে ভোগবিলাস না হয় রে, সুখবিলাস বর্মাটার কথা কইছি। সে ছিল শান্তিনিকেতনের পথে......অনেক কথাই হল, ও আমার সুখ দুঃখের খোঁজ-খবর রাখে। আসছি বলে কোথায় গেল সুখবিলাসটা?

আজি গেইলে কি আসিবেন
মোর মাহুত বন্ধুরে.........

সরকার ১৫০০ টাকা দেয়। মাস মাইনের মতো তো পাই না, কালেভদ্রে একসঙ্গে অনেক টাকা। তখন সবাই মিলে দারুণ ফূর্তি। এই আজকের মত এত এত রামের বোতল, কত মানুষ, ক্যামেরা, সিগারেট আড্ডা...কি ল্যাডলি, মাঝরাতে মদ্যপানের পর ঝিমুচ্ছি .... মুখে গাঁজলা উঠে গেছে, অতিরিক্ত মদ্যপান— তোমাদের ক্যামেরা আমার দিকে, লেন্সের ওপর থুথু ছুঁড়েছিলাম। তা সেই দৃশ্যটা অবশ্যই থাকবে, সেন্সর-টেন্সর গুলি মার তো। এটাই তো জীবন.....

অ জীবন রে জীবন ছাড়িয়া না যাইছ মোকে/তুই জীবন ছাড়িয়া গেইলে/আদর কইরবে কাহায় জীবন রে?

মাহুত বন্ধু রে

আমার বাবা প্রকৃতীশ বড়ুয়া। জংলিদের হাতিদের ডেরায় গান শিখেছি। গান কোনোদিন লিখে রাখতে হয়নি। শেখার সময় সেই যে মুখস্থ হয়ে গেছে, এক্কেবারে ফিক্সড ডিপোজিট। প্রকৃতীশ বড়ুয়া ছেলেপুলে মানুষ করার চেয়ে হাতি 'মানুষ' করাতেই বেশি আনন্দ পেতেন। বাবা বড় শিকারি ছিলেন। লালজী নামটা ওঁর প্রিয়, আমাদের। বেশিরভাগ গণ্যমাণ্যিরা লালজীই বলতেন। বাবার সঙ্গে ঘুরতাম। বনে জঙ্গলেই তো থাকতাম দিনরাত। ১৮-১৯ বছর বয়সে নিজ হাতে ৬টা চিতাবাঘ আর দুটো ডোরাকাটা বাঘকে গুলি করে মেরেছিলাম। অনেক হাতিও ধরেছি। জংলি হাতি।

বন থেকে জংলি হাতি ধরে আনা হত। তাদের 'মানুষ' করতেন বাবা আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ মাহুতবন্ধুরা। এই হাতিদের মানুষ করার সময় মাহুতরা এক ধরনের গান করতেন। জঙ্গলের নিঃঝুম পরিবেশে তো পাতা পড়ার শব্দও টের পাওয়া যায়, তাই মাহুতরা নিচু স্কেলেই গাইতেন। সেজন্য আমারও গান নিচু স্কেলেই।

হাতি ধরার তাঁবু পড়ত জঙ্গলে। একদিকে মাহুতদের ঘর। অন্যদিকে আমার আর বাবার থাকার বন্দোবস্ত। সন্ধ্যাবেলায় মাহুতরা দোতেরা-সারিন্দা বাজিয়ে গান করতেন। মাহুত বন্ধুদের পাশে বসে ওইসব গান শুনতাম। জংলি হাতিদের এই ডেরাগুলিই আমার সঙ্গীত আশ্রম।

সেটা ১৯৫৭। তখন শিলঙে থাকতাম। বাবা বিধায়ক ছিলেন। অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ তখন দেবকান্ত বড়ুয়া। প্রখ্যাত সাহিত্যিক নবকান্ত বড়ুয়ার দাদা। ওঁরা সবাই বিহুর আয়োজন করতেন শিলঙে। বিহু মানে তো বিশাল উৎসব। শিলঙে সেই বিহুর মঞ্চেই প্রথম গাই। 'মাহুত বন্ধু রে' নামে ছবি করেছিলেন ভূপেন হাজারিকা, তাতে 'তোমরা গেইলে কি আসিবেন মাহুত বন্ধু রে'-সহ বেশ কয়েকটা গোয়ালপাড়িয়া গান আছে আমার। ঋত্বিক ঘটকের 'বগলার বঙ্গদর্শন' ছবিটা পরে আর সম্পূর্ণ হয়নি, তা সেই ছবির জন্য ৭ কি ৮টা গান গেয়েছিলাম। কলকাতায় জন্ম। বালিগঞ্জে। জন্মের সন, তারিখ ১৯৩৪ সালের ১৩ অক্টোবর। গান মুখস্থ থাকে আর ওইরকম একটা বাপের বেটি আমি জন্মদিনটা ভুলে যাব। কলকাতার গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলেও কিছুদিন পড়েছি। কলকাতা আমাকে চিনতে অনেক দেরি করেছে। বাট আই অ্যাম এ গার্ল ফ্রম গৌরীপুর, নট এ গার্ল, এ উওম্যান।

স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নাই। তিনি গৌরীপুর কলেজে পড়ান। ইংরেজি ওঁর বিষয়। আমি অত পড়াশোনা করা লোক নই। তবে বাংলা, হিন্দি, গোয়ালপাড়িয়া, অসমীয়াটা মাতৃভাষার মতই বলতে পারি। এখন দেখছি ইংরেজিটা অনেকদূর এগিয়েছে।

ধুবড়ি জেলার গৌরীপুর মানেই সিনেমার প্রমথেশ বড়ুয়া, লালজীর হাতিশিকার। আমাদের একটা হাতির নাম ছিল প্রতাপ সিং। বাবার খুব প্রিয় ছিল ওই হাতিটা।

মাটিয়াবাগে টিলার ওপর রাজবাড়ি। এক সময় ৬০০ বর্গমাইলের মত এলাকা জুড়ে জমিদারি ছিল, ওই রাজত্ব-টাজত্ব। বছরে সে সময় নাকি ৯ লাখ টাকার মত রাজস্ব আদায় হত। এখন সেই পরিবারের 'রাজকন্যা' প্রতিমা বড়ুয়া-আর্টিস্ট। ভূপেন হাজারিকা বলে, প্রতিমা দি ডে ইউ ডাই, দি ফোক সঙ্গস অফ গোয়ালপাড়া উইল ডাই উইথ ইউ। ....আর্টিস্ট তো লতা মঙ্গেশকর, ভূপেন হাজারিকা...ওঁরা রত্ন। আমার তো শুধু জীবনের গান, গানের প্রতিমা।.....টাকা-পয়সা ভিটাবাড়ি/জীবন গেলে সব রইবে পড়ি.....অ জীবন রে....

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আমাদের পরিবারের একটা ইতিহাস নাকি পাওয়া গেছে। তাতে আছে আমাদের আদিপুরুষ ছিলেন মঙ্খদাস। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকে মঙ্খ-দাসদের উত্তরাধিকারীরা 'রাজা' উপাধিতে সম্মানিত হয়ে আসছেন।

রাঙামাটি পাহাড় থেকে আমাদের এই গৌরীপুরে আসা ঠাকুর্দার বাবা রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়ার আমলে। সেটা ১৮৫০ সালের ঘটনা। মনীশ ঘটক যদি মান্ধাতার বাবার আমল লিখতে পারেন তাহলে আমিও ঠাকুর্দার বাবা বলতেই পারি। রাজা প্রতাপচন্দ্রের ছেলেপুলে ছিল না। প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম বউ ভবানীপ্রিয়া ঘড়িয়াল ডাঙার সম্ভ্রান্ত দশরথ বসু পরিবারের ছেলে বুদ্ধিকান্ত বসুকে দত্তক নেন। আমাদের বাড়িতে এসে সেই বুদ্ধিকান্ত হয়ে যান রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া। প্রভাতচন্দ্রের বউ সরোজবালা উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন। প্রভাতচন্দ্র ছিলেন উচ্চমার্গের সঙ্গীতজ্ঞ। কার ছাত্র ছিল জানিস? সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিল। পরে সুযোগ্য উত্তরসূরি। ঠাকুর্দা প্রভাতচন্দ্রের সূত্রেই গান আমার রক্তে ঢুকে গেছে। আমার ঠাকুর্দা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার একটা বই ছিল 'সঙ্গীত সোপান'। সবাইকে পড়তে বলবি। ওটার একটা পুনর্মুদ্রণ দরকার। যারা গান করে, বাজায়, সবার কাজে লাগবে সে বই।

আমার স্বামী আমিষ খায় না। মদ্যপান করে না। ধূমপানও না। আমি উল্টোটা। আমিষ ছাড়া খাই না। এজন্য আমার স্বামী আমার কাছে 'আসামী' এরকম না একদম-ই। উত্তরপ্রদেশের লোক। ব্রাহ্মণ। জি এস পাণ্ডে। পাঁড়েজিও বলতে পারিস।

১৯৬৬ সালে গৌরীপুর কলেজে অনেক বিদ্বজনদের সঙ্গে এই পাণ্ডেজীও এসেছিলেন। পরিচয়। একটা সম্পর্ক হল। পরে মনে হল, না হলেই ভালো হত। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এসবে আমাদের হাত থাকে কি? থাক, কখনও পাণ্ডেজীর কথা লিখলে ওঁর সম্মানের দিকটা খেয়াল রাখিস, জেনে রাখ, স্টিল আই রেসপেক্ট হিম ভেরি মাচ।

গৌরীপুরিয়া গাভরু দেখিল হাতি ধরিবলৈ গৈ' এই গানটাতে ভূপেন হাজারিকা আমার 'ভালো করিয়া বাজান রে দোতারা, কমলা সুন্দরী নাচে'-সুর ব্যবহার করেছেন। তা এ নিয়ে অনেকে আমাকে বলাবলি করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, ভূপেন হাজারিকা

এক যুগোত্তীর্ণ শিল্পী। আমার সঙ্গীত জীবনে ওঁর প্রভাব অপরিসীম। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার কোলে বসে ভূপেন হাজারিকা গান শিখেছিলেন, সেই বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা 'মাহুত বন্ধু রে'-র শুটিঙের সময় আমাদের গৌরীপুরের বাড়িতে ছিলেন। এঁর সাইকেলে চড়েই 'ইন্দ্রমালতী কথা' ছবির গানের রিহার্সালে যেতেন ভূপেনদা।এই বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাই আমার অটোগ্রাফের খাতায় লিখেছিলেন, 'তোমার গানের নাই উপমা।'

বাবার কথা বলি আর একটু। প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ও সরোজবালার পাঁচ সন্তানের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম অগ্রপথিক প্রমথেশ বড়ুয়া। এরপর দুই মেয়ে। নীহারবালা ও নীলিমাবালা। আমার বাবা চতুর্থ সন্তান।

আমার বাবা প্রকৃতীশ এবং মা মালতী। মার আরো একটা নাম ছিল। লতা। আমার আর দুই বোন পার্বতী, প্রতিভা। পার্বতী এখনো জঙ্গলেই পড়ে থাকে। ওর হাতি আছে। বাবাকে যখন বলতাম, গানের সঙ্গে বাপ্পী লাহিড়ী, আর ডি বর্মন ওঁরা কত লোকজন মানে যন্ত্রী লাগায়। এর কোনো মানে আছে নাকি? বাবা বলতেন, তোর যেমন ইচ্ছে সেভাবে করবি। তুই যে প্রতিমা বড়ুয়া এটা মনে রাখবি। ব্যস, গ্রামেগঞ্জে মহিষচরার গান, হাতি-মাহুতদের গান, হালোয়ার গান, রুবলি-দারনির গান গেয়ে যেতে লাগলাম। আমার সঙ্গে তিনজন মাত্র যন্ত্রী। এদের মধ্যে বয়স্কজন হলেন সীতানন্দ রায়, যুবক বিমলকুমার মালি আর অভিজিৎ সরকার। এদের সবার সারা বছরের সব দায়-দায়িত্ব আমার। এরাই আমার পরিবার। ক্যাসেট না বের হলে নিজের জন্য দুঃখ হয় না। কবে গান ফুরিয়ে যাবে, মানে গোয়ালপাড়িয়া গান যার জন্য আমার ধ্যানমনপ্রাণ, এ অঞ্চলের যাবতীয় লোকগান সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ চাই রে, উদ্যোগ চাই।

আলিপুরদুয়ার থেকে একবার একটি ছেলে গিয়েছিল আমার কাছে। সেই কৃষ্ণ বলল, প্রতিমাদি একদিন আপনার নামে লোকগানের আকাদেমি হবে। সেদিন আমরা কুচবিহার রাজবাড়িতে করতে বলব সেটা। আপনার কি আপত্তি আছে? কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্যের এই প্রস্তাব শুনে হেসেছিলাম। বলেছিলাম, আমার দুই মেয়ে অলকা, অমৃতা রইল। ওঁরা যদি পারে গোয়ালপাড়িয়া গানের ধারা টিকাইয়া রাখবে। কত অনুরোধ করেছি, আমাকে একটা সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র গড়তে দিন। পাশে এগিয়ে আসুন। কত মন্ত্রী আমাদের গৌরীপুরের বাড়িতে এসেছেন, ওঁদেরও বলেছি। ঐতিহ্যরক্ষার আর্জিতে কান দিয়েছেন সবাই, কিন্তু একজনও কথা রাখেননি। কারা করবে আমার নামে ফেলোশিপ-টেলোশিপ। কেন?

শিলতোর্যার চরে অনুষ্ঠান হবে। আমার সঙ্গে ফিরদৌসি। যাব।

সিমলা, উত্তরবঙ্গের কত জায়গায়, কলকাতা, রাজস্থান, পাটনা, দিল্লি, গ্যাংটকে

অনুষ্ঠান করেছি। গানের কথা এবং সুর দুইই আমার বিচার্য। সুর না থাকলে গান হবে না। আর মদটা আমার খাওয়া লাগবেই, কারণ শরীরটা আমার গাড়ির মত তেল-মোবিল চাই-ই। সে রাম না হইলেও হবে, 'চাউলা' ও চলে। দাম বেশি না।

আজকের মন্ত্রী বা আমলাদের চেয়ে আগেকার রাজা জমিদার অনেক ভাল ছিলেন। তখন দয়া, মায়া, ক্ষমা এসবের অস্তিত্ব ছিল। সিকিউরিটি লাগত না। ভূপেন হাজারিকা আমার সঙ্গে গাইছে। কারা যেন রটিয়ে বেরাল, ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছিলেন, হতেই পারে না! উল্টো ঘটনা, প্রতিমার সঙ্গেই কণ্ঠ মিলিয়েছে ভূপেন। সেটাই জীবনের সেরা স্বীকৃতি, মর্যাদা, পুরস্কার।

নিজেকে নিয়ে এতসব কথা বলতে ভাল লাগে না। যেখানে গান গেয়েছি, ভিড় বেড়েই গেছে। কিন্তু জীবন তো ওই মোটরগাড়ির মতই দিনে দিনে ক্ষয় হয়। প্রকৃত অর্থে জীবনেরই জয় হয়। তাই বলি, 'তুই জীবন ছাড়িয়ে গেইলে আদর কইরবে কাহায়?'

এই প্রতিমা-দর্শন কখনও শেষ হয় না

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

একটা কাঁচা চারমিনার দাও দেখি ছাওয়া। ডোন্ট মাইন্ড! ইউ আর লাইক মাই সান। আই লাইক দ্যাট ফ্যাগ ফ্রম মাই আর্লি এজ।" প্রায় নিখুঁত উচ্চারণে এই কথাগুলো দিয়েই আলাপ শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগের প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডের সঙ্গে। চমকে গিয়েছিলাম। কথায়, ভাবে, ভঙ্গিতে যেন উত্তরাধুনিক এক মহিলা তথাকথিত অচলা সমাজকে তুড়ি মেরে নিজের লক্ষ্যে স্থির রয়েছেন। আর কথার ফাঁকে ফাঁকে মিশিয়ে দিচ্ছেন লোকজীবনের গাঢ় রঙ। কোনও অস্পষ্টতা নেই, নেই কোনও জড়তা। শুনেছি, যাঁরা বেশি কথা বলেন তাঁরা অসাড় কথাও বলেন। ব্যতিক্রম বোধহয় অনন্যা এই সঙ্গীতশিল্পী যিনি অনর্গল কথার চমৎকারিত্বে অবশ করে দিতে পারতেন যে কোনও শ্রোতার স্মৃতি, সত্তা ও বোধ। আজ তিনি প্রয়াত। কিন্তু তাঁর নানা সময়ের আলাপচারিতা আজও ধরা রয়েছে এই কলমচির কাছে। একটি তথ্যচিত্র তৈরি করতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কথা আর গান টেপ করার প্রয়োজন হয়েছিল। আজ তা যে কোনও আঁভাগার্দ নারী উদ্যোগের দিগদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

সেইসব ফাঙ্গাসআক্রান্ত টেপ শুনতে শুনতে স্মৃতির সড়ক বেয়ে নানা ঘটনার অভিঘাত উন্মোচিত হচ্ছে। মনে পড়ছে, কলকাতার এক স্বনামধন্য স্টুডিওতে রেকর্ডিং চলছে। তাঁর গ্রামীণ দলবল নিয়ে হাজির প্রতিমা বড়ুয়া। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শব্দগ্রাহক এবার রেকর্ডিং শুরু করবেন। তো, যথারীতি তিনি ব্যালান্সের প্রয়োজনে বললেন, 'দিদি একটু গলাটা ধরবেন। একটু ব্যালান্স করে নেব'। গাঁয়েগঞ্জে উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া প্রতিমা উত্তর দিয়েছিলেন,—'তোমাদের নিজেদেরই কোনও ব্যালান্স নেই আর আমাকে ব্যালান্স করতে যেও না। শুরু কর, শুরু কর। মাটির গানই সব ব্যালান্স করে দেবে। তোমাদের ইট-কাঠ-কংক্রিটে জলপাতাপাহাড় এঁকে দেবে।' এমন প্রাণান্তিক সহজাত উক্তিকে কী বলব! কবিতা? না, লোকজীবনকথা? এমন অসংখ্য ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। একবার গুয়াহাটির বিলাসবহুল এক হোটেলে আড্ডা চলছে। মাঝরাত তখন। হঠাৎ বলেন, 'চল ডিরেক্টর। তোমাকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' আমি তো অবাক, বললাম, 'এত রাত্রে যাবেন?' উনি তো নাছোড়, বললেন, 'দেখ, শিল্পী আর রাজনীতিকের কিবা দিন, কিবা রাত।' তো গেলাম তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তর কাছে। তাঁর সরকারি বাংলোর সামনে সশস্ত্র প্রহরায় মোতায়েন সিকিউরিটির লোকজন তো হতচকিত। একজন উচ্চপদস্থ এসে প্রতিমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন যে, সাহেব এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। কাকে কী বলা! উনি নিজেই

ফোন ঘুরিয়ে ধরলেন। প্রায় হন্তদন্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। আলাপপর্ব শেষ হতে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'বাইডো (অহমিয়া ভাষায় দিদি) আপনি এবার গৌরীপুর থেকে নির্বাচনে দাঁড়ান অ.গ.প-এর হয়ে। আমাদের পার্টিতে এরকম একটা প্রস্তাব আমরা নিয়েছি।' বিতর্কিত লোকশিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ আমার আপত্তি নেই। কিন্তু নির্বাচনী প্রতীক হবে দোতারা। আর সমস্ত লোকশিল্পীকে সরকারের তরফ থেকে মাস মাইনে দিয়ে রাখতে হবে। তাঁদের চলাফেরা ফ্রি করতে হবে। আর তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারের দায়িত্ব নেবে সরকার।' প্রফুল্লবাবু আমতা আমতা করে কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেশাতুর সেই রাতে কথা আর এগোয়নি।

যে তথ্যচিত্রটি প্রতিমা বড়ুয়ার উপর তৈরি করেছিলাম তার শেষাংশে প্রশ্ন রেখেছিলাম যে, মহিলাদের নেশা করা সম্পর্কে ওঁর কী বক্তব্য। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় 'অন ক্যামেরা' বলেছিলেন, 'কেন, আমাদের দিদিমা-ঠাকুমারা বিড়ি খেতেন না, হুঁকো খেতেন না? আর আমরা খেলেই দোষ? আর মদ তো অসমের কালচার, ট্রাইবাল কালচার। এতে কোনও দোষ আমি দেখি না। এটা সম্পূর্ণতই ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে।' লেখা বাহুল্য, এমত উক্তির কারণে পদ্মশ্রী প্রতিমা বড়ুয়ার উপর নির্মিত 'হস্তীর কন্যা' ছবিটি সেন্সরের ছাড়পত্র পায়নি। আজও অবাক লাগে তাঁর এই অগাধ সাহসের কথা মনে হলে।

জীবিত ও মৃত বহু ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ছবি করেছি। কিন্তু প্রতিমা বড়ুয়া ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে, একজন বিরল ব্যতিক্রম। ছিলেন গৌরীপুর রাজবাড়ির রাজকন্যা আর গাইতেন চাষাভূষো, মাঝি আর মাহুতের গান। তাঁকে কোনওদিন খাতা খুলে গান গাইতে দেখিনি। রাতের পর রাত গান গেয়েছেন একটা গান দু'বার না গেয়ে। তাঁকে লোকগানই যদিও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, তথাপি তাঁর গলায় আমরা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছি তারা জানি এ সুরসাধনায়ও তিনি ছিলেন অনন্য প্রতিমা। প্রখ্যাত সেতারবাদক দীপক চৌধুরি আমায় বলেছিলেন, 'কোনও স্কেল কিংবা অক্টেভ দিয়ে ওঁনার কণ্ঠকে, গায়কীকে পরিমাপ করা যায় না।'

তাঁর জীবনে বৈপরীত্য যেন দ্বন্দ্বমূলক এক দিনযাপনের উপাখ্যানকেই বিস্তার দিয়েছে। ছোটবেলা থেকেই বাবা লালাজীর সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরেছেন। সাত-সাতটা বাঘ শিকার করেছেন। তাঁর মধ্যে আবার দু'দুটো লেপার্ড। সম্পূর্ণ সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু উদ্যমী মেয়েদের উপদেশ দিয়েছেন, 'নিজের পছন্দ মতো বিবাহ করতেই পার। কিন্তু যদি একবারও এই প্রশ্নটা মাথায় আসে যে 'বিয়ে করাটা উচিত' কিনা— তবে বলব, বন্ধুত্ব কর। সঙ্গ কর। বিবাহবন্ধনের অযাচিত সমস্যা নিজের জীবনে ডেকে এনো না। আমাদের সম্পর্কগুলোর মধ্যে প্রেমপ্রীতি থাকে, ভাবভালবাসাও থাকে। কিন্তু অভাব হল বন্ধুত্বের। যা কিনা নর ও নারীর সম্পর্ককে বিস্তার দিতে পারে, আরও আরও ঘনিষ্ঠ করতে পারে।'

দুই কন্যা সন্তানের জননী প্রতিমা বিয়ে করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক জি, এস, পাণ্ডেকে। থাকতেন গৌরীপুরের রাজাদের 'সামার গেস্ট হাউস' মাটিয়াবাগে। গাছগাছালিতে ভরা একটা বাড়ি আর তিন দিকে নেকলেসের মতো পেঁচিয়ে থাকা গদাধর নদী। নদী থেকে জল তোলা, রান্না করা, বাসন মাজা থেকে ঘরসংসারের প্রতিটি কাজ নিখুঁত ভাবে সারতেন। তাঁর আতিথেয়তার কথা আজও ভুলেও ভোলা যায় না। সারাদিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য ভক্ত আর তাঁর গানের দলের সহযোগীদের আনাগোনা। কাজ করতেন। কথা বলতেন আর তারই মাঝে সুরতালের বৈচিত্রে ঝালিয়ে নিতেন নতুন নতুন গান। বলতেন, 'রেওয়াজ করার দরকার নেই। গান গাইলেই রেওয়াজ হয়। শুধু মন প্রাণ দিয়ে তার ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেকে অর্পণ করতে হয়। তা যেমন রান্না করতে করতে করা যায় তেমনই ঘর ঝাঁট দিতে দিতেও করা যায়।'

কলকাতার লোকসঙ্গীত শিল্পীদের প্রতি তাঁর নজর ছিল খানিকটা তির্যক। তাঁর সাবধান বাণী ছিল, 'কলকাতায় বাউল খুঁজলে হবে না। গ্রামে যেতে হবে। মেলাখেলায় ঘুরতে হবে। আখড়ায় আখড়ায় বসতে হবে। কিন্তু মুশকিল হল আজকে সবাই গায়ক-গায়িকা হতে চায়। অথচ আমরা ছিলাম সাধনায়। প্রকৃতি আর পরিবেশকে ব্যাখ্যা করতে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের ভাবটিকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতেই ছিল সেই সাধনা। তাতে কী পেলাম আর কে কী বলল তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা ছিল না, আজও নেই।'

জ্যাঠামশাই প্রমথেশ বড়ুয়া হওয়ার সূত্রে ছোটবেলা থেকেই নানা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল প্রতিমা বড়ুয়ার। ভূপেন হাজারিকা ছিলেন তাঁর দাদার বন্ধু। তাঁরই চেষ্টায় রাজবাড়ির দেওয়ালের বাইরে প্রতিমা প্রথম গান করেন মাহুত বন্ধুতে। ঋত্বিক ঘটক তাঁর 'বগলার বঙ্গদর্শন' ছবিতে আট আটটি গান গাইয়েছিলেন প্রতিমা বড়ুয়াকে দিয়ে। ছবিটি শেষ না হওয়ায় আফশোসের অন্ত ছিল না তাঁর। তাঁর কথায় ঘুরে ফিরে আসতেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, রাজ কাপুর, দেবানন্দ, ওয়াহিদা রহমান কিংবা মিঠুন চক্রবর্তী। এই সমস্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার ছোট্ট ছোট্ট গল্পে ভরিয়ে দিতেন যে কোনও আড্ডা। সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির পুরস্কার পাওয়ার পর এই বিতর্কিত শিল্পী আমায় বলেছিলেন, 'গান আমি ভাল গাই ঠিকই। কিন্তু ভাল কথা বলার উপর যদি কোনও রাষ্ট্রপতির পুরস্কার থাকতো, তাও দেখতে আমাকেই দেওয়া হত।'

'গদাধরের পারে পারে....' আর তাঁর গান শোনা যাবে না। জমাটি আড্ডায় আর তিনি সবাইকে চমকে দিয়ে বলে উঠবেন না, 'আমি কিন্তু রামবিলাসী।' কিন্তু তাঁর অগণিত ভক্তশিষ্যরা তাঁর বলে যাওয়া কথা, উপদেশ, সুরতাল-ছন্দের বহুমাত্রিকতাকে কতদূর বয়ে নিয়ে যায় সেটাই দেখার। হয়তো ঘুরে ফিরে তাঁর মৃত্যুচেতনাসম্বলিত সেই কথাই আমাদের সেই মহান জীবনের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত করবে— ও জীবন রে, ও জীবন ছাড়িয়া না যাস মোকে, তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে আদর করবে কায় জীবন রে...।

লোকগানের দেশ ও একজন রাজকুমারী

সুবীর সরকার

থমথমে সন্ধেবেলা। জাতীয় সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে সহসা দিক বদলে ঢুকে পড়তে হল একটা সরু রাস্তায়। দুপাশে নিম, সেগুনের শান্ত অস্তিত্ব। আচমকা পথরোধ করে দাঁড়ালো একটা উঁচু টিলা। আনুমানিক ২৭-৩০ ফুট। সবুজ চাদরে মোড়া। আর পুরানো সব গাছে ভরা। টিলার চারপাশে অজস্র জোনাকীর অবাধ বিচরণ, রাত্রির নিজস্ব কিছু শব্দ। এবং টিলাশীর্ষে একটা সুউচ্চ, অনবদ্য স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরানো প্রাসাদ, রাজবাড়ীর মতো। শতবর্ষ আক্রান্ত, হেলে পড়া কার্নিস। টিলার নিচে পরিত্যক্ত গ্যারেজ। আর তাতে লেখা 'প্রতাপ সিং'। এইসব পর্যবেক্ষণ শেষ হতে না হতেই কানে ভেসে আসে নারীকণ্ঠের গান। অপূর্ব সুরেলা, মাদকতাময়। বোঝা গেল এটা লোকগান—'ও জীবন রে/জীবন ছাড়িয়া না যাইস মোকে/তুই জীবন রে'। শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকবাদ্য। দোতারার ঝমঝমে আওয়াজ। বোঝা গেল রাজবাড়ি থেকে গান ভেসে আসছে। আর কোনও রাজকুমারী যেন গান গাইছেন। মাননীয় পাঠক, উপরের লাইনগুলি পড়ে এই ২০০২ সালে আপনাদের অলৌকিক এক রূপকথা মনে হতে পারে। কিন্তু আদতে সবকটি দৃশ্যবর্ণনাই চূড়ান্ত সঠিক, বাস্তব। যে টিলার কথা বলা হল সেটা হল গৌরীপুরের মাটিয়াবাগ টিলা। সুউচ্চ বাড়িটি গৌরীপুরের ছোট রাজবাড়ি। রাজা প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়ার (লালজী) প্রাসাদ। প্রতাপ সিং ছিল লালজীর অতি প্রিয় হাতি। আর যে রাজকুমারী গান গাইছিলেন তিনি লোকসংগীতের সম্রাজ্ঞী প্রতিমা বড়ুয়া। গৌরীপুর। অসমের প্রান্তিক শহর। একদা এটা ছিল ছোট্ট দেশীয় রাজ্য। অনবদ্য, শান্ত, সুন্দর শহর। অসংখ্য কাঠের বাড়ি ইতস্তত ছড়ানো। স্বপ্নময়। গৌরীপুর মানেই হাতিশিকার, প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি, একশত বলির দুর্গাপূজা, গদাধর নদী, লোককথা, রাণী সরোজবালা আর গোয়ালপাড়িয়া লোকসংগীত—এ সকল অনুষঙ্গ অনায়াসে চলে আসে। ১৮৬০-এর দশকে প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া গৌরীপুরকে কেন্দ্র করে ছোট্ট এক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। শহরের কেন্দ্রে নির্মাণ করেন সুদৃশ্য এক রাজবাড়ি। এর পর রাজা হন প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া। তিনি ছিলেন সুশাসক। প্রজাবৎসল, তুখোড় শিকারী এবং সাহিত্য অনুরাগী একজন কৃতবিদ্য পুরুষ। ১৯৪২ সালে তিনি গৌরীপুরে আয়োজন করেছিলেন এক বর্ণাঢ্য বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। সেই সময় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গল ও হাতির জন্যে বিখ্যাত। রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া হাতির ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন এই সূত্রে। পরবর্তীতে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গৌরীপুরের শেষ জমিদার

লালজী এই হাতিশিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি ও পারদর্শীতা অর্জন করেন। বড়ুয়াদের এই রাজত্ব মোটামুটি বড়ই ছিল। উত্তর-পূর্বে বগরীবাড়ি থেকে পশ্চিমে বক্সিরহাট ও দক্ষিণে মানকার চর—এই জমিদারীর সীমা। বড়ুয়ারা ছিলেন নামকরা শিকারী। বড়ুয়াদের বহু বিচিত্র শিকার কাহিনির রুদ্ধশ্বাস সব কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে। গৌরীপুরের বড়কুমার পরবর্তীকালের বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়াও ছিলেন শিকারে দক্ষ। ১২ বৎসর বয়সে পিতা প্রভাতচন্দ্রের সাথে শিকারে গিয়ে তিনি বাঘ মেরেছিলেন। কুচবিহার রাজ পরিবারের সঙ্গে গৌরীপুরের গভীর সখ্য ছিল। কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আহ্বানে বহুবার রাজা প্রভাতচন্দ্র শিকার অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রভাতচন্দ্রের পুত্রদ্বয় প্রমথেশ বড়ুয়া ও প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া (লালজী) কুচবিহারের শেষ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ-এর সাথে যৌথ শিকারে সঙ্গী হয়েছিলেন বেশ কয়েকবার।

সমগ্র ভারতের শিকার অভিযানের ইতিহাসে গৌরীপুর রাজপরিবারের স্বাতন্ত্র্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পিতা প্রভাতচন্দ্র যখন মারা যান (১৯৪৫) তখন বড় রাজকুমার চলচ্চিত্রে পুরোপুরি নিয়োজিত। গৌরীপুরের সাথে তাঁর যোগাযোগও বেশ ক্ষীণ। ইতিমধ্যে তিনি গৌরীপুরের মাটিয়াবাগ প্রাসাদে এবং সংলগ্ন বনভূমিতে শুটিং করেছেন তাঁর বিখ্যাত ছবি মুক্তি-র (১৯৩৭)। এই ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে প্রমথেশ বড়ুয়ার পোষা হাতি 'জংবাহাদুর' এবং গোয়ালপাড়িয়া লোকসঙ্গীত—'আজি নদী না যাইও বৈদ/নদীর ঘোলা রে ঘোলা পানী'। প্রকৃতীশচন্দ্র বা লালজী ছিলেন রূপকথার নায়কের মতো এক বহুবর্ণ পুরুষ। বাল্যকাল থেকেই পিতার তত্ত্বাবধানে তাঁর শিকার শিক্ষার সূচনা ও বিকাশ। গোটা এশিয়ায় তাঁর মতো হাতি ধরতে আর কেউ পারতেন না। লালজী হাতি ধরতেন কিন্তু মারতেননা। নিজের সবচেয়ে প্রিয় হাতি 'প্রতাপ সিং'কে নিয়ে বিপজ্জনক 'খেদা' পদ্ধতিতে তিনি দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে সারা জীবন হাতি ধরে বেরিয়েছেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত প্রায় ২৩২টি হাতি শিকার করেছিলেন লালজী।

লালজীর এক মেয়ে পার্বতী বড়ুয়াও হাতি শিকারের কাজে পারদর্শী। মাহুত ফান্দিদের সাথে নিয়ে পার্বতী বড়ুয়া বছরের পর বছর একদা শাসন করেছিলেন জঙ্গলপাহাড়। উত্তরবাংলার ডুয়ার্সে হাসিমারার কাছে তাঁর সুন্দর কাঠের তৈরী খামার বাড়ি। বন বিভাগের ডাক এলেই পার্বতী ছোটেন 'গুন্ডা' হাতি তাড়াতে। নিজেরও দুটি হাতি আছে—কাঞ্চনমালা ও লক্ষ্মীমালা নামে। সম্প্রতি অবশ্য তিনি একটি হাতি বন বিভাগকে বিক্রি করে দিয়েছেন।

গৌরীপুর মানে শুধু শিকার, হাতি বা রাজা প্রভাতচন্দ্রের একশ বলির দুর্গাপুজো নয়। গৌরীপুরকে বলা হয় লোকগান ও লোককথার মায়াময় দেশ। গৌরীপুরকে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধ হয়েছে গোয়ালপাড়া জেলার লোকসঙ্গীত বা গোয়ালপাড়িয়া গান। আগে গৌরীপুর ছিল অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে। বর্তমানে ধুবড়ী জেলার অন্তর্গত।

গৌরীপুরের নদী, মাঠ, মানুষ, ইতিকথা আর ঘরবাড়ির সঙ্গে তীব্রভাবে মিশে আছে গোয়ালপাড়িয়া গানের মিষ্টি অথচ মন খারাপ করে দেওয়া লোকসুর। সাথে মর্মস্পর্শী সব সাধারণ অথচ গভীর লোকবাদ্য—দোতারা ঢোল বাঁশী সারিন্দা ইত্যাদি। গৌরীপুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে সরু ফিতের মতো গদাধর নদী। আর সেই নদীর ওপাশ থেকে হু হু বাতাসের মতো ছুটে আসে গান—'তোর মাহুত চরায় হাতি/গদাধরের পারে পারে রে/উঁচা করি বান্ধেন মাচা রে/আমরা জল ভরিতে দেখি/কি মায়া না গাইলেন মাহুত রে....'

গোয়ালপাড়িয়া লোকসঙ্গীত রাজবংশী উপভাষায় লেখা। গোয়ালপাড়ার গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ মূলত এই ভাষাতেই কথা বলেন। স্বভাবতই গোয়ালপাড়িয়া গানের সাথে আমাদের উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়া গানের প্রচুর মিল। তাই গোয়ালপারীয়া গান উত্তরবাংলার কুচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার মানুষের কাছেও অতি প্রিয়—'ও কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে/ কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া যাও/কয়া যাও রে...।'

তবে গোয়ালপাড়িয়া গানের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে 'হাতির মাহুত' আর 'মৈষাল' কেন্দ্রীক গান। গোয়ালপাড়া অঞ্চল ছিল ঘন অরণ্য আর হস্তী অধ্যুষিত। অরণ্যের ভিতর ছিল মহিষ চরাবার মিলনস্থল 'বাথান'। তাই স্বাভাবিক ভাবে মাহুত আর মৈষালের প্রাধান্য দেখা যায়—'মইষের পিঠে চড়িয়ারে মৈষাল/ছেঁড়ে কাশিয়ার ফুল/আষাঢ় শ্রাবণ মাসে নদী হুলস্থুল রে..../বা, 'অ মোর হায় হস্তীর কন্যারে/খানিক দয়া নাই খানিক মায়া নাই/মাহুতর লাগি রে....'। গোয়ালপাড়িয়া গানগুলি বেশীরভাগই লোকমুখে গীত হয়ে আসছিল। ১৯৫০ এর দশকে রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার কন্যা (প্রমথেশ ও লালজীর বোন) রাজকুমারী নীহারবালা বড়ুয়া সমগ্র গোয়ালপাড়ায় ঘুরে অতি যত্নে গোয়ালপাড়ার গান ও লোককথাগুলি সংগ্রহ করে 'বই' প্রকাশ করেন। গৌরীপুরে তাঁর বাড়িতে তিনি গড়ে তুলেছেন একটি চমৎকার সংগ্রহশালা। গোয়ালপাড়িয়া গানের প্রচুর গুণী দক্ষ গায়ক-গায়িকা আছেন। তাঁরা সজীব রেখেছেন এই গানের ধারা। তবে পাশ্চাত্য সুর যন্ত্র ক্রমেই কু-প্রভাবের, ছায়া ফেলেছে এই গানের ওপর। আর যিনি না থাকলে গোয়ালপাড়িয়া গান কোন দিনই আঞ্চলিক ক্ষেত্রসীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও মর্যাদা অর্জন করতে পারত না, অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকতো—তিনি হলেন গৌরীপুরের শেষ জমিদার প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া তথা লালজীর অতি আদরের কন্যা শ্রীমতি প্রতিমা বড়ুয়া। গৌরীপুরের রাজকুমারী।

১৯৩৪-এ কলকাতায় প্রতিমা বড়ুয়ার জন্ম। বাল্য থেকেই পারিবারিক ধারা অনুসারে শিকারের নেশা, গানের নেশা তাঁর রক্তে। পিতা লালজীর সাথে ঘুরে বেড়াতেন হাতি ধরবার ক্যাম্পে (ধূরা)। সেই থেকে হাতির সাথে, মাহুত আর ফান্দিদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে প্রতিমা বড়ুয়া বাঘ শিকার করেছিলেন। আর এই বর্ণময় জীবন ভরে উঠতে থাকে নদীর পারে লোককথার দেশে এবং লোকগানের সুর তুলে তুলে—'অ মোর গৌরীপুরীয়া মাহুত কান্দেরে/সখী ঘরবাড়ি ছাড়িয়া...'।

প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকা একসময় প্রায়ই আসতেন গৌরীপুরে। মাটিয়াবাগ প্রাসাদে উঠতেন। প্রতিমার সাথে সখ্য গড়ে উঠতে সময় লাগলো না। নতুন জোয়ার এলো গানের। ভূপেন হাজারিকা প্রতিমার অনবদ্য সুর, কণ্ঠকে কাজে লাগালেন এইচ.এম.ভি. থেকে। বিস্ফোরণ ঘটলো যেন। শ্রোতার হৃদয়ে জায়গা পেলেন প্রতিমা বড়ুয়া। আমরা পেলাম সেই অপূর্ব গান—'আরে গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে...'। ব্যস্, আর পিছন ফিরে তাকাতে হল না প্রতিমা বড়ুয়াকে। সম্মান, যশ ভালবাসা—সবই এল একে একে। সেই সাথে জাতীয় স্তরে পরিচিতি পেল গোয়ালপাড়িয়া লোকসংগীত। আর সেই সাথে প্রতিমা বড়ুয়ার মাথায় উঠে এলো গোয়ালপাড়িয়া গানের সম্রাজ্ঞীর মুকুট। অথচ এতসব তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারলো না। সাধারণ মানুষের মত সহজ সরল জীবনযাপন ছিল তাঁর। মাটিয়াবাগের জীর্ণ স্মৃতিভারাক্রান্ত বাড়িতে প্রমথেশ বড়ুয়া মহাবিদ্যালয়-এর অধ্যক্ষ স্বামী ডঃ গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডের সাথে তাঁর বসবাস ছিল। গুনগুন করে গান চলতো সারাদিন। বিমল মালির ঢোল, সীতানন্দ-র সারিন্দা, পরমেশ্বর-অভিজিতের দোতারা সহযোগে গোয়ালপাড়িয়া গানের ডালি নিয়ে আসর থেকে আসরে ছুটে বেড়াতেন ক্লান্তিহীন এই রাজকুমারী।

প্রতিমার দুই মেয়ে। অমৃতা ও অলকা। অলকা এখন বেশ ভালো গোয়ালপাড়িয়া গান গাইছে। বড় জামাই অভিজিত সরকার দোতারা বাজাতেন প্রতিমার সাথেই। বহু সম্মান, পুরস্কার পেয়েছেন সারা জীবন। ১৯৯১ সালে প্রতিমা বড়ুয়াকে দেওয়া হয়েছে 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছে 'ডি. লিট.'। গৌরীপুর লোককথার স্বপ্নদেশ। লালজীর স্মৃতিমাখা শহর। সময় বয়ে যায় নিজ খেয়ালে। আর গদাধরের দু'পাশে হলুদ সর্ষেক্ষেতের ওপর দিয়ে এখনো ঝমঝম বেজে চলে রাজকুমারীর যাদুকণ্ঠের গান—'ও মোর বন্ধুধন রসিয়া/দেখা দেও মোকে একবার আসিয়া'।

ভাসাইলাম পরানপ্রতিমারে

প্রতুল মুখোপাধ্যায়

জীবনশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। প্রতিমা বড়ুয়ার প্রয়াণের পর তিনি তাঁর স্মৃতিতে একটি সঙ্গীত রচনা করেন। 'ভ্রমরা' ও 'ভারতীয় যাদুঘর' আয়োজিত স্মরণ সভায় তিনি সেই সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। একদিন তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি গানটি গেয়ে শোনান। আমার অনুরোধে প্রতুলদা গানটি লিখে দিয়েছেন। গৌরীপুরের মানুষেরাও এই গান প্রতুলদার কণ্ঠে রেকর্ড করে নিয়ে গিয়েছেন। পাঠক বুঝতেই পারবেন, কয়েকটি লাইনে কেমন 'সম্পূর্ণ প্রতিমা' আমাদের চোখে ধরা দিয়েছেন। প্রতুলদার গায়কীকে শুনতে পেলে তার আর কোনো তুলনাই হয়না।

ভাসাইলাম পরানপ্রতিমারে।
(হায়) চোখের জলে ভাসাইলাম পরানপ্রতিমারে।
প্রকৃতির কন্যা প্রতিমা, তারে কে বলে রাজবালা?
ওরে নিঃস্বজনের সঙ্গে মাতি গানে
আঁধিয়ার করিতেন আলা(রে)।

কান্দে মাহুত বান্ধিয়াল মৈষাল কান্দিছেন বন্ধুরা,
ওরে কান্দে ঢোল কান্দে বাঁশি কান্দে
সারিন্দা দোতরা।

কথা: প্রতুল মুখোপাধ্যায়
সুর: 'মাহুত বন্ধু রে' গানের
সুরের আদলে।

ডায়েরির পাতা থেকে

গৌরীপুর গিয়ে শিল্পীর স্বামী অধ্যাপক গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডের (জি. এস.) সঙ্গে দেখা করতে যাই। কেউ কেউ বললেন, গিয়ে দেখুন, কিছু না বলে ফিরিয়ে দিতে পারেন। ভিন্ন কথাও বললেন কেউ কেউ। সুদূর কলকাতা থেকে এসেছেন, নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। আমি ভেবেছি, আমার হারানোর কি-ই বা আছে! দেখাই যাক্ না। একটাই কথা বলতে পারি। অপ্রত্যাশিত সহায়তা করেছেন। আমার অনুভূতি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায় যখন তিনি বললেন, 'একটা ট্রাঙ্ক রয়েছে প্রতিমার ঘরে, আজও খুলে দেখিনি। আপনার সামনে খুলব প্রথম।' আবিষ্কারের রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা আমাকে জড়িয়ে ধরে। এমন কিছু ছোটখাট জিনিস পাওয়া গেল যা ছেলেমেয়েরা ছোটোবেলায় সংগ্রহ করে খেলনার সংসার তৈরি করে। পাওয়া গেল গ্রেটা গার্বোর ছবি। দেবানন্দ-এর ছবি। জি. এস. বললেন, প্রতিমা এঁদের দুজনের অভিনয় ভালোবাসতেন। কলেজে পড়েছেন যখন, সেসময়কার একটা খাতা পাওয়া গেল। ভেতরে তেমন কিছু লেখা নেই। কিছু আপন মনের খেয়াল। তার একটা দুটো নমুনা আমরা এই বইয়ে রেখেছি। সবশেষে পাওয়া যায় একটা ডায়েরি। ডায়েরির সকল পাতা যে ভর্তি এমনটা নয়। জি. এস. বললেন, 'চাইলে আপনি ডায়েরিটা কাজে লাগাতে পারেন'। আমি মূল নথিপত্র একটাও নিয়ে আসতে রাজি হইনি। ডায়েরি উল্টে একটা জায়গা পড়ে আমার মন স্নিগ্ধতায় ভরে উঠল। আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে সেই অংশটুকু পাঠকের দরবারে পেশ করলাম।

রাত ১২-৫
২৭ শে জুন, ১৯৭১

সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিলো, মহানগরীর ব্যস্ত জীবনে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, প্রশস্থ পথে জল জমেছে, পুরোনো নোংরাগুলো নতূন করে ভেসে উঠেছে চারিদিকে। যারা প্রতিদিনের জীবিকার জন্য ভোর না হ'তেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে তারা হয়তো ঠিকই বেরিয়েছিলো, যারা অফিসের বাবু হিসেবে শহুরে জীবন গড়ে তুলেছে তারাও আজ ট্রামে, বাসে উঠে যেতে কষ্ট পেয়েছে, স্কুল কলেজের অনেক ছেলেমেয়েরাই হয়তো আজ একটা অজুহাত পেয়েছে ফাঁকি দেয়ার, আর যারা গৃহস্থ ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে, তাদের কাজ ঠিকই চলে যাচ্ছে। শিশুরা সারাদিন ধরে ঘরের ভেতরেই খেলার মাঠ বানিয়ে নিয়েছে। তবুও নীরব হয়ে থাকেনি ব্যস্ত মহানগরী কোলকাতা।

ডায়েরির পাতা থেকে

খোলা জানালার দিকে চেয়ে, চেয়ে, অনেক কথা মনে পড়ছিলো, মনে পড়ছিলো এমনই অনেক আকাশ ছাওয়া বর্ষার কথা, মনে পড়ছিলো শংকরের কথা। এমন করেই বর্ষা নেবেছে দক্ষিণ ভারতের আকাশে? হায়দ্রাবাদে? সারাটা দিন ধরে শুধু বারবার কত কথা, কত প্রশ্ন মনটাকে এলোমেলো করে দিয়ে গেছে। ব্যালা, বারোটার পর আমার ভাড়াটে গুজরাটী ভদ্রলোকের চাকরটা এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে, শংকরের চিঠি।

গত বছর থেকে শুরু হয়েছে এক নূতন প্রতিক্ষা, চাতকের মত চেয়ে থাকি, কবে আমার পিয়াসা মিটবে? চিঠি কবে আসবে। শংকর গত দুবছর ধরে হায়দ্রাবাদের সেন্ট্রাল ইন্স্টিটিউট্ অফ ইংশিলের পড়ুয়াজীবন শুরু করেছে, আর আমি? শুধুমাত্র দূর থেকেই শুভোকামনা জানিয়ে যাওয়ার অধিকার নিয়ে বসে আছি আর দিন গুনছি ওর ফলাফলের। এ যেন আমারি পরীক্ষা, এ যেন আমারি ভবিষ্যতের গৌরব।

শংকর যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন হয়তো আমার জীবনে প্রতিক্ষার রাত শেষ হবে। কত রাত কেটে গেছে, দেখতে, দেখতে অমৃতার বয়স হয়েছে একবছর পাঁচমাস,— হয়তো জন্মের পর পুরো দুমাস ধরেও বাবাকে পায়নি অমৃতা। আধো আধো ভাষায় শুধু বাব্বা, বাব্বা, বলেই ডেকে বেড়ায়, খুঁজে বেড়ায় বাবাকে। জানেনা কবে বাবা আসবে, অভাবটুকুকে হয়তো প্রাণভরে অনুভব করে, শুধু বোঝাতে পারেনা ভাষা দিয়ে। আমি, বোঝাতে গিয়ে ভাষাহারা হয়ে যাই, ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টিপথ। (বানান অপরিবর্তিত)

শিল্পীর অপ্রকাশিত রচনা

গৌরীপুরে জি. এস. যখন আমাকে ট্রাঙ্ক খুলে শিল্পীর নানা সংগ্রহ (সংগ্রহই বটে, সাংসারিক মানুষজন ফিরেও তাকাবেন না) দেখাচ্ছিলেন তখন আমরা শিল্পীর লেখা একটা ছোট রচনা পেয়ে যাই। রচনাটি তাঁর নিজের হাতে লেখা। রচনার শিরোনাম, 'তোমরা গেইলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে'। রচনাকার হিসেবে নীচে নাম রয়েছে 'শ্রীমতী প্রতিমা পাণ্ডে (বড়ুয়া)'। অহমিয়া ভাষায় লেখা রচনাটি আমরা বাংলায় অনুবাদ করেছি। রচনার বিষয় নতুন নয়। শিল্পী সারা জীবন ধরে যে কথা বলে গিয়েছেন, যে কাজ করে গিয়েছেন, তারই প্রকাশ এই রচনায়।

তোমরা গেলে কী আসিবেন মোর মাহুত বন্ধু রে

শ্রীমতি প্রতিমা পাণ্ডে (বড়ুয়া)

গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতি যুগ যুগ ধরে গোয়ালপাড়ার জনজীবন তথা অসম জনজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা নিরাশার গভীর পরিচয় বহন করে চলেছে। অখ্যাত অজ্ঞাত গীতিকারদের রচনা, সহজ সরল সুর ও গায়নভঙ্গী অনেক সময়েই সমালোচকদের নজরে পড়ে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই গানে জীবনের যে গভীর স্পর্শ রচনা করেন, জীবন জিজ্ঞাসার নানা জটিল প্রশ্ন তুলে ধরেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতির ক্ষেত্র বিস্তৃত ও উন্মুক্ত—এই উন্মুক্ত সোনার প্রান্তরে অবহেলায় পরে থাকা মণিমুক্তো কুড়িয়ে নেওয়ার সুদক্ষ কারিগরেরও বড় অভাব। শুধুমাত্রা সংগ্রহ, প্রচার ও প্রসারের অভাবে বহু মূল্যবান লোকগীতি হারিয়ে গিয়েছে ও আজও যাচ্ছে। আমি নিজে সারা জীবন ধরে প্রচুর পরিশ্রম করে হারিয়ে যাওয়া কিছু গান উদ্ধার করেছি। আগ্রহী মানুষ ও শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিয়েছি। আমার আন্তরিক প্রত্যাশা, নতুন প্রজন্মের শিল্পী ও মানুষজনেরা গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতির আরও উৎকর্ষ সাধন করবেন। লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করে অহমিয়া লোকসংস্কৃতির ভান্ডার পূর্ণ করে তুলবেন।

হাতি শিক্ষার গীত :

হস্তীর কন্যা, হস্তীর কন্যা বামুনের নারী
মাথায় নিয়া তামকলসী, ও, সখি হাতে সোনার ঝারি
ও মোর হায় হস্তীর কন্যারে
খানিক দয়া নাই মাহুতক লাগিয়ারে॥

অসমের ঘন শ্যামল বনানী শুধু রঙবেরঙের নানা ফুলেই শোভিত নয়, তার গভীরে রয়েছে নানা ধরনের হিংস্র জন্তু জানোয়ার। হাতিধরা অসমের এক বহু পুরনো প্রথা। প্রতিবছর সরকারের উদ্যোগেই হাতি ধরার 'মহল' খোলা হয়। আজ এই প্রথা নিষেধ হয়েছে। তবু বহুকালের অভ্যাসের ফলে কেউ কেউ এখনও গোপনে 'মহল' বানায় ও ধরা পড়ে অর্থদন্ড দেয়। অসমের সীমান্ত যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে শুরু হয়েছে ভূটান পর্বত। গাড়ো পাহাড়, নাগা পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের অরণ্যে হাতির অভাব নেই। 'মহলদার' লোকজন ভূটানের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়ে তাদের কাজ হাসিল করে চলেছে।

গোয়ালপাড়া জেলার মানচিত্রের দিকে তাকালে আমরা কচুগাঁও, হল্টুগাঁও, গরুভাষা, দেউশিরি, উল্টাপানী, রায়মানা, বাম্বা, পাটগাঁও এমন বহু নাম দেখতে পাই। এই সব এলাকায় কোচ, রাজবংশী, সাঁওতাল, বরো, রাভা, ওরাওঁ ও নেপালি আদিবাসী মানুষেরা থাকে। সরু সরু পাহাড়ের গা দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর দুইপাশে এঁরা আনন্দে গান করে। নাচে। অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের মধ্যে এভাবে এঁরা বেঁচে থাকতে চায়। সহজ সরল এদের মন। 'মহলদার' লোকজনেরা এদের গাঁয়ের সীমানায় ছাউনি পাতে। কখনও জেনালির পাড়ে। কখনও জাকাতির পাড়ে। ভূটানের গভীর অরণ্যের অন্তরালে চম্পা, মানাহ, আই, বেকী, গৌষাং, সরলভাঙ্গা—এই নদনদীগুলো সৃষ্টি হয়েছে। জেনালি ও জাকাতি এদেরই শাখা প্রশাখা।

অসম আর ভূটানের অরণ্যে মহলদারেরা ছমাসের জন্য ছাউনি পাতে। বছরের পর বছর মাহুত, ফান্দি ও মহলদারের জীবন জীবিকা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জীবিকার সন্ধানেই ঘর দুয়ার বাবা মা পুত্র কন্যা ও প্রিয় গাঁয়ের মানুষজনকে ছেড়ে সবাই গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেয়।

মহলদারের ছাউনিতে মাহুত ও ফান্দিরা যেমন থাকে, ব্যবসায়ীরাও থাকে। বিহারের লোকজন থাকে। হিন্দু মুসলমান একসাথে থাকে। এরা জাতিভেদ মানে না। অরণ্যের নিবিড় গভীরতায় মানুষেরা সব মিলে যায়। একই জীবিকায় এসে এরা সব এক হয়ে যায়। ফান্দিরা হাতি ধরে। মাহুত হাতিদের পোষ মানায়। মহলাদার তারপর সেই হাতিদের বেচে। ব্যবসায়ীরা দেখে শুনে হাতি কিনে নিয়ে যায়। এই হল ছ'মাসের ব্যাপার।

সন্ধে হলে অরণ্য জুড়ে গভীর নিস্তব্ধতা। মহলাদারদের সাময়িক আস্তানায় আলো জ্বলে। আগুন জ্বলে। শীতের আগুন। সকল গাছের পাতা নিস্তব্ধ। তখন হাতি শিক্ষার কাজ শুরু হয়। মাহুতেরা হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে হাতির কন্যাকে ঘিরে ধরে। অরণ্যের আদিম কন্যাকে জোর করে বাঁধে। তারপর শুরু হয় গায়ে হাত বুলোনো। সবাই মিলে একসুরে গান ধরে—

'আল্লা, আল্লা বলরে ভাই
হায় আল্লা রসুল।

কোন মহালের হাতিরে ভাই
হায় আল্লা রসুল।
ভূটান মহলের হাতিরে ভাই
হায় আল্লা রসুল।
কোন ফান্দির ধরারে ভাই
হায় আল্লা রসুল।
বড় ফান্দির ধরারে ভাই
হায় আল্লা রসুল।।

রাতের নীরবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ধ্বনিত হয় মাহুতদের এই গান। হিন্দু মুসলমান এক সুরে একসঙ্গে 'আল্লা রসুল' গান করে। ছাউনির পরিবেশটাই বদলে যায়। একসময় মিষ্টি ও কোমল সুরে মাহুতেরাই গেয়ে ওঠে কোনো অখ্যাত গীতিকারের পুরনো গাঁথা। আলো আরও জোরে জ্বলে উঠে। হস্তীর কন্যা ডেকে উঠে। মাহুত তখন গান ধরে—

হস্তীর কন্যা হস্তীর কন্যা
বামুনের নারী
মাথায় নিয়া তামকলসীও
সখি হাতে সোনার ঝারি।।
ও মোর হায় হস্তীর কন্যারে
খানিক দয়া নাই—
মাহুতক লাগিয়ারে।।

পুরনো লোকগাঁথার বিচারে 'বামুনের নারী'—'তোমারা জানো দয়া নাই এই মাহুতলৈ?' ঘর সংসার ছেড়ে এরা বনবাসে দিন কাটায়। ঘরে প্রতিদিন হাহাকার, উপোসী স্ত্রীর দেহ মন সবই দুঃখভারে জর্জরিত। মাহুতের যখন এই কথা মনে পড়ে তখন সে গেয়ে উঠে,

পাত্তীরা করিয়ারে কন্যা
বাড়েনা দিলেন পাও
মাথার উপর কাল জেঠিও
সখি করে পঞ্চবাও, সখিও
ও মোর দান্তাল হাতির মাহুত রে
যে দিন মাহুত ছাড়িয়া যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে।

লোককথায় রয়েছে, বামুনের কন্যা যখন যাত্রা করেছে তখনই একটা টিকটিকি পাঁচবার পরপর ডেকে উঠেছিল। এ অমঙ্গলের সংকেত। অভিশাপের ফলে ব্রাহ্মণকন্যা

তখন হস্তীকন্যায় পরিণত হয়েছে। বনের কন্যা কেঁদেই চলে। মাহুতের দল তখন গান করে—

বালু টি টি পংখীরে কান্দে বালুতে পড়িয়া
আর, গৌরীপুরীয়া মাহুত কান্দে ও
সখি ঘরবাড়ি ছাড়িয়া, সখিও
ও মোর 'গণেশ' হাতির মাহুত রে
যেদিন মাহুত শিকার যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে।।

*যে বিষয়ে শিল্পী রচনাটি লিখেছেন তার সম্পর্কে বিস্তারীত জানতে চাইলে আগ্রহী পাঠক নীহারবালা বড়ুয়ার লেখা 'হস্তী কইন্যার কাহিনী ও মাহুতের গান ও জীবনী' ('প্রান্তবাসীর ঝুলি'তে সংকলিত) রচনাটি পড়ে নেবেন।

১৯৯৩ সালে আব্বাসউদ্দিন স্মরণ সমিতি প্রদত্ত সম্বর্ধনা
প্রতিমা বড়ুয়া (পাণ্ডে)

অসমের গোয়ালপাড়া (অধুনা ধুবড়ি) জেলার গৌরীপুর রাজবাড়ীর মেয়ে প্রতিমা বড়ুয়া (পাণ্ডে)। তাঁর পরিবারের গুণিজনের অভাব নেই। পিতা বিখ্যাত শিকারী প্রয়াত প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া (লালজী) স্বনামে প্রতিষ্ঠিত। জ্যেষ্ঠতাত প্রয়াত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না। তবে এখানে বলা দরকার প্রমথেশচন্দ্র বিশাল তিস্তা-তোর্ষা থেকে লুইত পর্যন্ত অঞ্চলের গানের প্রথম প্রয়োগকর্তা চলচ্চিত্রে, তাঁর বিখ্যাত 'মুক্তি' ছবিতে। প্রতিমার দুই পিসি নাচে-গানে, শিল্পে-অঙ্কনে স্বনামখ্যাতা। পিতামহ রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন এক সমঝদার সংগীতজ্ঞ ও খ্যাতনামা শিকারী।

অল্প বয়স থেকেই প্রতিমার আকর্ষণ জঙ্গল। শিকারী পিতার সঙ্গে বনে-জঙ্গলে, গ্রামে-প্রান্তরে তিনি বেড়িয়েছিলেন এবং গ্রামের শিল্পী, হাতির মাহুত, ফান্দীদের কাছে গান শুনে নিজের আনন্দে গান গেয়েছেন। পরিণত বয়সে এই গ্রাম-প্রকৃতির সুরকে নিয়েই তাঁর ঘরসংসার। গ্রামের ব্যথা আনন্দেভরা সুর তুলে ধরার কঠিন সাধনার পুরস্কার তাঁর জীবনে এসেছে বহুবার। সম্প্রতি পেলেন ভারত সরকারের পদ্মশ্রী খেতাব।

আজ প্রতিমা স্ব প্রতিভায় এক বিশেষ ধারার ধারক-বাহক।

আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতির প্রথম অনুষ্ঠানেই তিনি সাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন। পদ্মশ্রী প্রাপ্তির পর এসেছেন আবার। এ যেন ''আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে, আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।''

জীবনপঞ্জি

জন্ম : ১৩ অক্টোবর, বালিগঞ্জ, কলকাতা

বাবা : প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া (লালজী)

মা : মালতীলতা বড়ুয়া

প্রাথমিক শিক্ষা : গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, কলকাতা

মাধ্যমিক শিক্ষা : গৌরীপুর বালিকা বিদ্যালয়, গৌরীপুর, অসম

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ : ১৯৫৩

কলেজ (অসমাপ্ত) : সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ

লোকগানের প্রেরণা যাঁদের কাছে পেয়েছেন : ভরতবালা রায়, শরৎবালা রায়, সোনাইবালা রায়

লোকগানের প্রথম শিক্ষক : ভবেন রায়

চটকাগানের শিক্ষক : বয়ানউদ্দিন

ছাত্রীজীবনে গৃহশিক্ষক : ভুবনচন্দ্র বড়ুয়া, নিখিলচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি শিক্ষা : মনোরমা বাইদেউর

প্রথম লোকগান পরিবেশনা : ১৯৪৯, নিউ এম্পেয়ার থিয়েটার, কলকাতা

১৯৫৬ : ভূপেন সুরে 'এ্যারাবাটোর সুর' ছবিতে লোকগান পরিবেশন

১৯৫৭ : 'মাহুত বন্ধুরে' চলচ্চিত্রে গান গেয়ে অসংখ্য মানুষের হৃদয় জয় করেন

১৯৫৮ : 'গোয়ালপাড়িয়া গীত' কথার প্রচলন তাঁর গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়

১৯৬০ : আকাশবাণীতে অডিশন দিয়ে উত্তীর্ণ হন

১৯৬২ : আকাশবাণী গুয়াহাটি কেন্দ্রের সঞ্চালক পুরুষোত্তম দাসের সহায়তায় 'একবার হরি বলো মন রসনা' গানটি তাঁর প্রথম রেকর্ড হিসাবে প্রকাশিত হয়

শিল্পীর রেকর্ডভুক্ত গানের সংখ্যা : ৩২০ (১৯৬২—১৯৮৮)

বিবাহ : ১৯৬৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর গৌরীপুর প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক গঙ্গাশঙ্কর পাণ্ডের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন

১৯৭৫ : আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠান। তাঁর গান দিল্লি, সিমলা, শিলিগুড়ি, তেজপুর, শিলচর, কার্সিয়াং, গ্যাংটক, ডিব্রুগড়, ইম্ফল ও আগরতলা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচার হয়েছে। পরে মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, তামিলনাডুর আকাশবাণী কেন্দ্র থেকেও পরিবেশিত হয়েছে

১৯৭৭ : 'অসম সাহিত্য সভা' কর্তৃক 'অসম শিল্পী দিবস সম্মান' অর্জন

১৯৮৭ : কমলরাণা শর্মা তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন যা গুয়াহাটি দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়। দূরদর্শনে নিয়মিত গোয়ালপাড়িয়া গীত পরিবেশন

১৯৮৮ : 'ভারত সংগীত নাটক একাডেমি' সম্মান অর্জন

১৯৮৮ : সংগীত নাটক পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে ড. বীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ যা গুয়াহাটি দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়

১৯৯১ : 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ

১৯৯৩ : 'আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি' কর্তৃক বিশেষ সম্বর্ধনা

সন্তান : দুই কন্যা। অমৃতা পাণ্ডে। অলকা পাণ্ডে। দুজনেই বিবাহিতা

দীর্ঘকালের সহশিল্পী : বসন্ত মালী (ঢোল), বলহরি রায় (বাঁশি)

শিল্পীর দোতারা বাদক : সুধীর রায়, রঞ্জিত রায়, কতুমুদ্দিন, আজগর আলি

চলচ্চিত্রে কণ্ঠদান : এ্যারাবাটোর সুর, মাহুত বন্ধুরে, পলাশের রঙ, গজমুক্তা, বগলার বঙ্গদর্শন (অসমাপ্ত) ‌৷ Dances of Assam along the Brahmaputra

সম্মাননা তালিকা : অসম শিল্পী দিবস সম্মান, জয়মতী সম্মান, বিষ্ণু রাভা সম্মান, অসম নাট্য সমিতি সম্মান, ভারত সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. ডিগ্রি অর্জন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মাননা, আব্বাসউদ্দীন পুরস্কার, ধুবড়ি চলচ্চিত্র উৎসবে সম্বর্ধনা (১৯৯৫), বিপিন চক্রবর্তী স্মৃতি সম্মান (২০০০) ইত্যাদি

প্রয়াণ : ২৭ ডিসেম্বর, ২০০২, গুয়াহাটি, অসম।

সহায়ক বইপত্র

প্রান্তবাসীর ঝুলি : গোয়ালপাড়ার লোকজীবন ও গান—নীহার বড়ুয়া (সম্পাদনা : চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়), স্ত্রী, কলকাতা ৭০০০২৬

লোকসংগীতের প্রাসঙ্গিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ—খালেদ চৌধুরী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আমি এক যাযাবর—ভূপেন হাজারিকা (অনুলিখন : হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়), প্রজাপতি, কলকাতা-৯

লোকসঙ্গীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম—হেমাঙ্গ বিশ্বাস, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০০৭৩

ইতিহাসের বীক্ষণে কোচবিহার ও গোয়ালপাড়ার লোকসংগীত (আধুনিক পর্ব)—ড. জলি বাগ্‌চী (গুপ্ত), রক্তকরবী, কলকাতা-৭০০০০৯

আব্বাসউদ্দীন স্মরণে : স্মারক পুস্তিকা ১৯৯৩—আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি, কলকাতা

জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালা আৰু তেওঁৰ জনপ্ৰিয় গীত—এম. আব্দুল মজিদ খান, গণেশ প্ৰকাশন, গুড়াহাটী-২০

বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু তেওঁৰ জনপ্ৰিয় গীত—এম. আব্দুল মজিদ খান, গণেশ প্ৰকাশন। গুৱাহাটী-২০

ও মোৰ হায় হস্তীৰ কন্যা ৰে—ড. ধীৰেন দাস, শ্ৰীৰমনী মোহন ডেকা, গৌৰীপুৰ, ধুবুৰী (অসম)

গানৰ প্ৰতিমা প্ৰাণৰ প্ৰতিমা—সুৰীতি শৰ্মা ব্ৰহ্মচৌধুৰী, নন্দিনী

বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে (প্রথম খন্ড)—বুদ্ধদেব গুহ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯

হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর (রাজকুমার প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়ার হাতি সম্পর্কে আজীবন অভিজ্ঞতার সংক্ষেপিত আলেখ্য)—পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯

চিত্রবীক্ষণ (ঋত্বিক সংখ্যা), মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা : সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার মুখপত্র, নবম বর্ষ, চতুর্থ—পঞ্চম সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৬—সম্পাদক অনিল সেন

প্রতাপচন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গৌরীপুর : শতবার্ষিকী স্মৃতিগ্রন্থ (১৮৯৯-১৯৯৯), সম্পাদক—শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, গৌরীপুর, ধুবরি, অসম

কণাদ নাট্যপত্র (প্রতিমা বড়ুয়া বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৩)— সম্পাদনা : শিবাদিত্য দাশগুপ্ত, নাট্য আনন, কলকাতা-৭০০১৪

কারুকথা (বইমেলা ২০০৩)—সম্পাদক : সুদর্শন সেনশর্মা, কলকাতা-৯৫

সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান (দ্বিতীয় খন্ড)—সম্পাদক : অঞ্জলি বসু, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০০৯